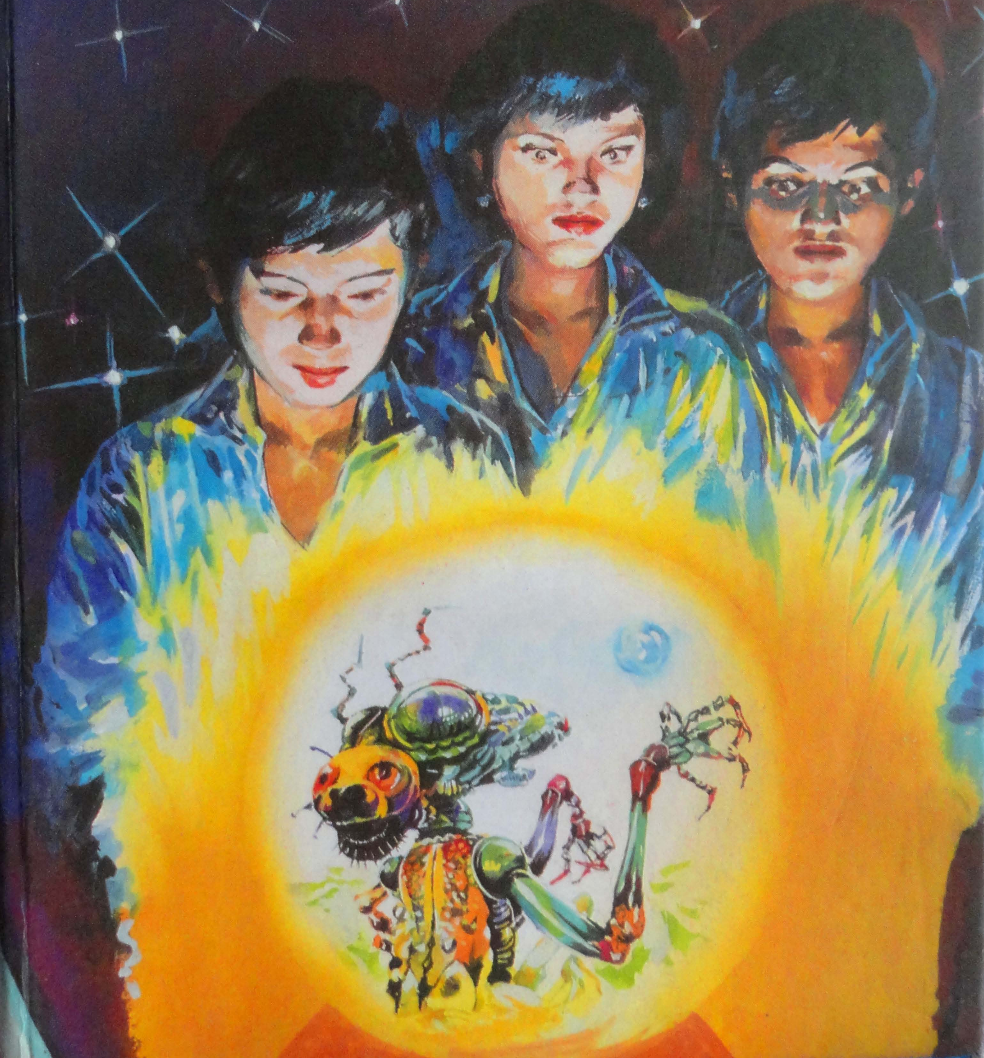
সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান

সম্পাদনা ■ অনীশ দেব



সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান ● সম্পাদনা অনীশ দেব

অল্পবিজ্ঞান

গল্পবিজ্ঞান

কল্পবিজ্ঞান...

অল্পবিজ্ঞান আর গল্পবিজ্ঞানের মিশেল দিয়ে তৈরি কল্পবিজ্ঞান। সহজ কথায় এ-ভাবেই বোধহয় ব্যাখ্যা করা যায় কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীকে। বিজ্ঞানকে কেন্দ্রবিন্দু করে গড়ে ওঠা আকর্ষণীয় এক কল্পকাহিনী ১৮১৮ সালে কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। উপন্যাসটির নাম 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন : অর, দ্য মডার্ন প্রমিথিউস'। লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট শেলি—প্রখ্যাত ইংরেজ কবি পি. বি. শেলির স্ত্রী। টিন-এজার হিসেবে উপন্যাসটি লেখার কাজ শুরু করেছিলেন মেরি শেলি, আর সেটি বই হয়ে বেরোয় তিনি একুশ পেরনোর আগেই। উপন্যাসটির কিশোর-সংস্করণ 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' নামে সুপরিচিত। আজ, একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছেও এই উপন্যাসটির জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি। এইভাবেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে একটি নতুন শাখা জন্ম নিয়েছিল ১৮১৮ সালে। আর বাংলা সাহিত্যে এ-জাতীয় গল্পের প্রচলন ১৮৯৬ সালে—স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কলমে। পরে বহু নামী-দামি লেখক নিয়মিত চর্চায় এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বড়দের উপযুক্ত কল্পবিজ্ঞান যেমন লেখা হয়েছে, তেমনই রচিত হয়েছে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী কল্পবিজ্ঞান। তবে বাংলা সাহিত্যে শেষ ধরনের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীই লেখা হয়েছে বেশি। কল্পবিজ্ঞানের গল্প মানেই শুধু নীরস বিজ্ঞানের একঘেয়েমি নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে কৌতূহল-জাগিয়ে-তোলা আকর্ষণীয় নতুন স্বাদের কাহিনী—যা পাঠককে ভাবাবে নতুন দিনের কথা, নতুন জীবনের কথা। অত্যন্ত

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ-পত্রে দেখুন

ISBN 81-7215-607-3

পরিশ্রম, যত্ন ও সতর্কতায় বাছাই করা এই কিশোর সঙ্কলনের বত্রিশটি গল্প সে-কথাই প্রমাণ করবে বারবার। তাই সঙ্কলনের সম্পাদক অনীশ দেব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বইয়ের নামকরণ করেছেন 'সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান' আর অনায়াসে এই বইকে আখ্যা দিয়েছেন তাঁর 'স্বপ্নের বই'।

অনীশ দেব নিজে যে শুধু কল্পবিজ্ঞানের লেখক তা নয়, পাঠক হিসেবেও পৃথিবীর নানা ধরনের কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় তাঁর। পেশার দিক থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক হওয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সহজাত। সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুনির্বাচিত এই কল্পবিজ্ঞান সঙ্কলন কিশোর-কিশোরীদের হাতে তুলে দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এই সঙ্কলনের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি গল্প তোমাদের জন্য। গত পাঁচ বছর ধরে নানান কিশোর কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী পড়ে-পড়ে আমি আমার পছন্দের সেরা বত্রিশটি গল্প বেছে নিয়েছি।...'

এই সঙ্কলনের বত্রিশটি গল্প যেন আগামী দিনের অজানা রঙিন দুনিয়ার এক-একটি দরজা। প্রমাণিত কিংবা অপ্রমাণিত সম্ভাব্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এর বেশিরভাগ গল্প। এই রঙিন জগতে পাঠকের মুখোমুখি হাজির হয়েছেন অবিস্মরণীয় ঘনাদা এবং প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞানী প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। এ ছাড়া আছেন মেঘ-চোর এক বিপজ্জনক বিজ্ঞানী আর প্রখর প্রতিরক্ষমতার অধিকারী কাদের মিয়া।

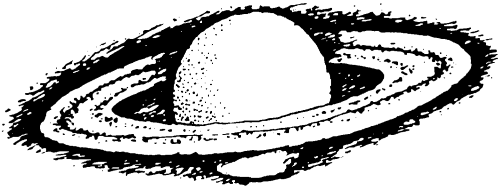
এই সঙ্কলনে আরও আছে টাইম মেশিনের গল্প, বিচিত্র রোবটের কাহিনী, মায়া সভ্যতার গোপন রহস্য, কুয়াশায় ঢাকা অজানা রহস্যময় জগৎ, ভয়ঙ্কর মারণ-পোকা, সংবেদনশীল গাছ, হঠাৎই-বুদ্ধি-বেড়ে যাওয়া এক আশ্চর্য বালকের কথা, আরও কত কী।

১৯৯১ সালে প্রকাশিত অনীশ দেব সম্পাদিত 'সেরা কল্পবিজ্ঞান' গ্রন্থের পরিপূরক অবশ্যপাঠ্য এই সঙ্কলন গ্রন্থটি যথার্থই সার্থকনামা।

প্রচ্ছদ ◻ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান

সম্পাদনা □ অনীশ দেব



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭
পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০০৯

অলংকরণ সত্যজিৎ রায়, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশীষ দেব, অনুপ রায়,
সুব্রত চৌধুরী, কৃষ্ণেন্দু চাকী ও বিমল দাস

ISBN 81-7215-607-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

১২৫.০০

কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে



সময়টা ছিল ১৮১৬ সাল।

তোমাদের চেয়ে বয়েসে মাত্র ছ'-সাত বছরের বড় ছিল তখন মেয়েটি। বয়েস উনিশ পেরোনোর আগেই বিশ্বসাহিত্যের প্রথম কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী বা সায়েন্স ফিকশন লিখতে শুরু করে দিয়েছিল সে। লেখার কাজ যখন শেষ হল তখন তার বয়েস কুড়ি পেরোয়নি। আর লেখাটি বই হয়ে বেরোয় ১৮১৮ সালে। বইটির নাম 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন : অর, দ্য মডার্ন প্রমিথিউস'—যাকে তোমরা 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' নামে চেনো।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হইচই পড়ে গিয়েছিল সাহিত্যরসিক মহলে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সম্মান ও প্রশংসায় ভেসে গেলেন লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট শেলি—প্রখ্যাত ইংরেজ কবি পি. বি. শেলির স্ত্রী।

মেরি শেলি শুরু করার পর কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী লিখে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন জুল ভের্ন ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স। তারপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও লেখালেখির মাধ্যমে বিদেশে কল্পবিজ্ঞান বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতই এগোতে থাকে, কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীও ততই নানা রঙে নানা ঢঙে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এইভাবে আধুনিক সময় পর্যন্ত আমরা পেয়েছি বহু উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান লেখক : আর্থার সি. ক্লার্ক, রে ব্র্যাডবেরি, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, রবার্ট হাইনলাইন, ব্রায়ান অ্যালডিস, গ্রেগরি বেনফোর্ড, ল্যারি নিভেন, ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্ট, ফিলিপ কে. ডিক, জে. জি. ব্যালার্ড প্রমুখ।

বিদেশি কল্পবিজ্ঞানকে সাবালক করে তোলার কাজে অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন জন উড ক্যাম্পবেল। মাত্র সাতাশ বছর বয়েসে 'অ্যাস্টাউনডিং স্টোরিজ' পত্রিকাটির দায়িত্ব নিয়ে ১৯৩৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর পরিচালনায় পাশ্চাত্য কল্পবিজ্ঞান সাবালক হয়ে দুরন্ত গতি পেয়ে আজকের আধুনিকতার শিখরে পৌঁছে গেছে।

বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞানের সূচনা ১৮৯৬ সালে—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কলমে। তাঁর লেখা একমাত্র কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীটির নাম হল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। পরে গল্পটি পরিমার্জিত করে 'পলাতক তুফান' নামে তাঁর 'অব্যক্ত'

গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন জগদীশচন্দ্র। এই গল্পে বিজ্ঞানের 'সারফেস টেনশান' বা 'পৃষ্ঠটান' তত্ত্বের প্রয়োগ রয়েছে।

জগদীশচন্দ্রের পর বাংলা কল্পবিজ্ঞান এগিয়েছে অত্যন্ত ধীরে। আজকের কম্পিউটারের যুগে পৌঁছেও বাংলা কল্পবিজ্ঞান পাশ্চাত্যের মতো বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কিন্তু, সন্দেহ নেই, বিজ্ঞানমনস্ক কিংবা বিজ্ঞান-সচেতন পাঠকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সে-কথা মনে রেখেই এই সঙ্কলন।

সঙ্কলনের গল্পগুলো বিষয় বৈচিত্র্যে বহুমুখী। বাংলা মৌলিক কল্পবিজ্ঞান (শুধুমাত্র সঙ্কলনের 'ক্যাপ্টেন' গল্পটি ছাড়া) যে নিতান্তই ফেলনা নয়, আশা করি তার প্রমাণ এতে পাওয়া যাবে। সঙ্কলনের গল্প নির্বাচনে লেখকরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। সেইজন্যেই এই মনের মতো সঙ্কলন তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারছি।

এই সঙ্কলনের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি গল্প তোমাদের জন্য। গত পাঁচ বছর ধরে নানান কিশোর কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী পড়ে-পড়ে আমি আমার পছন্দের সেরা বত্রিশটি গল্প বেছে নিয়েছি। আর এমন একটা কিশোর কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী সঙ্কলনের স্বপ্ন দেখেছি যা তোমাদের মন ভরিয়ে দিতে পারবে। যে-বইটা এতদিন ধরে আমার 'স্বপ্নের বই' ছিল সেটা এখন তোমাদের হাতে। তোমরা খুশি হলে জেনো আমারও মন ভরে উঠবে।

অনীশ দেব

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০ ০০৯

"Science fiction is no more pseudo-science than fiction is pseudo-truth."

—John Wood Campbell

in *Concerning Science Fiction* (1946)

"কল্পবিজ্ঞান যদি অপবিজ্ঞান হয়, সাধারণ গল্প-উপন্যাস তাহলে অপসত্য।"

— জন উড ক্যাম্পবেল

কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে (১৯৪৬)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

এই বই রূপায়ণে অনেকের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। প্রথমেই নাম করব দুই বালক-বালিকার (যারা এখন কিশোর-কিশোরী), সায়ক দেব ও মোনালিসা দেব। এই সঙ্কলনের গল্প নির্বাচনের জন্য যখন শুধুই কল্পবিজ্ঞানের গল্প পড়ে চলেছি, তখন ওরা দুজন নানা গল্প পড়ে ওদের অভিমত জানিয়েছে। এর ফলে কিশোর-কিশোরীদের মনের জানলা দিয়ে খানিকটা উঁকি দিতে পেরেছি। শিল্পী বন্ধু সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় দে ও দেবাশীষ দেব অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। ওঁদের আন্তরিকতা ভোলার নয়। প্রুফ সংশোধন ও প্রযোজনায় অনলস দক্ষতা দেখিয়েছেন স্নেহভাজন বিমলকুমার পাল। আর প্রকাশকের তরফ থেকে প্রতি মুহূর্তে পেয়েছি সহযোগিতা এবং উৎসাহ। এঁদের সকলের সাহায্য ছাড়া আমার এই 'স্বপ্নের বই' কখনও বাস্তবের বই হয়ে উঠত না।

সূচিপত্র



ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র



'হয়তো!' হ্যাঁ, বাক্যটা ঘনাদার মুখ থেকেই উচ্চারিত হল। কিন্তু কেমন যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ওই শব্দটুকু মুখ দিয়ে বার করেই গুম হয়ে গেলেন ঘনাদা।

কী হয়তো? কেন হয়তো? এমন অনেক প্রশ্নই তখন মনের মধ্যে তো বটেই, জিহ্বাগ্রেও যে এসেছিল, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু ঘনাদার মুখ-চোখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে তা উচ্চারণ করতে আর সাহস করিনি।

ঘনাদার মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝব, এত বড় ধুরন্ধর আমরা কেউ নই। তবু মনে হচ্ছিল একটা কী বিষয়ে তিনি যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনস্থির করতে পারছিলেন না।

তাঁর মনে যে অস্থিরতাটা, সেটা এক হিসেবে 'না' আর 'হ্যাঁ'-এর দ্বন্দ্বও হতে পারে।

'হয়তো' বলে তিনি যে একটা সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছিলেন, সেটা আমাদের কাছে শেষপর্যন্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবেন কি না, এই নিয়েই তাঁর মনে বেশ প্রবল দ্বিধা ছিল বলে মনে হয়।

শেষপর্যন্ত এ-দ্বিধার মীমাংসায় 'না'-এর ওপরে 'হ্যাঁ'-ই যে জয়ী হল, এ আমাদের ভাগ্য।

'হ্যাঁ।' মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ঘনাদা তাঁর 'হয়তো'কে বিস্তারিত করে বললেন, 'হয়তো সে ঠিক খবরই পাঠিয়েছিল। কিন্তু...'

'কিন্তু'র পর যে-দীর্ঘ নীরবতা, সেটা প্রায় যন্ত্রণায় পৌঁছে দিয়ে ঘনাদা তাঁর বক্তব্যটা পেশ করলেন। বললেন, 'কিন্তু "কানুড়ি" থেকে "ফাং"-এ অনুবাদ করাতেই হয়তো ভুল হয়েছে। আর, তারপর "হাউসা"য় তার "কান"গুলো "ধান" হয়ে সব এমন বরবাদ করে দিয়েছে যে, আমি সোজার বদলে উলটো খবরই পেয়েছি।'

মুখটা তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব করুণ করে ঘনাদা চুপ করলেন।

কিন্তু আমরা যে তখন একেবারে অকূল পাথারে ! ঘনাদার প্রথম 'হয়তো'র পরেই যেটুকু ফাঁপরে পড়েছিলাম, 'ফাং' 'হাউসা' 'কানুড়ি'র জালে জড়িয়ে তা যে একেবারে গোলকধাঁধার ফাঁদ হয়ে উঠল ।

কী বলছেন ঘনাদা ? মানে বলতে চাইছেন কী ?

সোজাসুজি সে-কথা যে জিজ্ঞেস করব, তার উপায় নেই। কারণ অমন বেয়াদপিতে উত্তর যা মিলবে, তাতে নখ কাটাতে গিয়ে আঙুল কাটিয়ে ফেলার ঝক্কি নেওয়া হবে ।

তার চেয়ে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করাই ভাল। নিজের পাকানো জট ঘনাদা সময়মতো নিজেই কি আর খুলবেন না ?

সেই ধৈর্য ধরেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবুঝ গৌরটার জন্য তা থাকা আর হল কই ?

'কী হাং-ফাং করছেন ?' ঘনাদাকে সে একটু গরম গলাতেই জিজ্ঞেস করে বসল, 'হিং টিং ছটের মতো মন্তর-টন্তর নাকি ?'

'না, মন্তর-টন্তর নয় ?' ঘনাদার গলার ঝাঁঝটুকু আর লুকনো নেই এবার, 'কিন্তু ওগুলো কী, বোঝাতে গেলে একটু ভূগোলের পরীক্ষা আগে নিতে হবে।'

'ভূগোলের পরীক্ষা ?' সভয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'কী পরীক্ষা ঘনাদা ?'

'না, এমন কিছু পরীক্ষা নয়,' ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'শুধু ক'টা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব। যেমন, কোন দেশে একসঙ্গে আবলুস, সেগুন, মেহগনির সঙ্গে প্রচুর তাল-তমাল যেমন পাওয়া যায়, তেমনই প্রচুর পাওয়া যায় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, বক্সাইট থেকে হিরে আর সোনা ?'

একটু থেমে আমাদের মুখের ভাবটা লক্ষ করে ঘনাদা এবার বললেন, 'এসব যদি একটু কঠিন প্রশ্ন মনে হয়, তা হলে একটামাত্র অতি সোজা প্রশ্ন করছি। যার উত্তর জানলে দেশটার নাম বলতে আর কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। প্রশ্নটা হল এই, কোন দেশে এই শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৯ আর ১৯২২-এ দু-বার এক আগ্নেয়গিরি থেকে দারুণ অগ্ন্যুদ্‌গার হয়েছে ?'

কী জবাব দেব এসব প্রশ্নের ?

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কোনওরকমে লুকোবার চেষ্টা করে মাথা চুলকোবার অভিনয়ই করছিলাম, তার মধ্যে 'শুনুন ঘনাদা', বলে গৌর হঠাৎ মুখ খোলায় সত্যিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ঘনাদা এমনিতেই খুব ভাল মেজাজে আছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর বেয়াড়া কিছু বলে গৌর যদি তাঁকে গরম করে দেয়, তা হলে অন্তত আজকের দিনের মতো আমাদের বাহাত্তর নম্বরের মজলিস একেবারে মাটি।

কিন্তু ভয় যা করছিলাম, তার উলটোটাই হল।

জাতে পাগল হলেও গৌর যে তালে ঠিক, তা বোঝা গেল তার পরের



...ব্রুল চিৎকার করে বললে, "তোকে মারলে কোন আইনে কে আমাকে এখানে ধরবে? তোকে এই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে লাশটা শুধু ওই একটা বিষাক্ত-গ্যাসের পাতাল-গুহায় ফেলে দেব।"

কথায়।

বেয়াড়া কিছুর বদলে, গরম হওয়ার বদলে ঘনাদা তাতে গলে একেবারে জল।

কী এমন বললে গৌর, যাতে খোঁচানো সাপও ফণা তুলতে ভুলে যায়? কী সে মন্তর?

না, হাত কচলানো খোশামুদি গোছের কিছু নয়। বরং তাতে 'ফোঁস' করার ঝাঁঝই একটু আছে বলা যায়। কিন্তু কাজ হল ওই ফোঁসানির সুরেই।

মিষ্টি সুরে-টুরে নয়, গৌর ঘনাদার ওপর অভিমানেই নালিশ জানিয়ে বললে, 'অত ভূগোলের পরীক্ষা যদি দিতে হয়, তা হলে পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির পিছনেই তো ছুটলে পারি! তার বদলে এই বাহাত্তর নম্বরে আপনার মুখ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকব কেন? মোড়ের দোকানে এক চেঙারি হিঙের কচুরির অর্ডার দিয়ে এসেছি। বনোয়ারি তা নিয়ে নীচের গেটের মুখেই বোধহয় পৌঁছে গেছে। রামভুজের সেগুলো প্লেটে-প্লেটে সাজিয়ে পাঠাতে যা দেরি। কিন্তু এখন আর কী হবে তাতে, সব ঘাস লাগবে মুখে, হ্যাঁ, ঘাস।'

গৌর চুপ করল এমন একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে, আমাদেরই দু-চোখের পাতাগুলো কেমন যেন একটু ভিজে-ভিজে হয়েছে মনে হল।

ঘনাদারও তা-ই হল কি না জানি না। কিন্তু তাঁর গলায় এবার যে সুরটা শোনা গেল, সেটা স্পষ্টই সান্ত্বনার।

'আহা! হিঙের কচুরি ঘাস হতে যাবে কেন?' তিনি আশ্বাস দিলেন, 'এই আমাদের মোড়ের জহর হালুইকরের হিঙের কচুরি তো? ও আজ বিকেলে আনিয়ে কাল সকালে মুখে দিলেও মুচমুচে থাকে। তবে...'

ঘনাদার হিঙের কচুরির কৌলীন্য-বিচার আর হল না। বিরাট ট্রে-র ওপর কচুরি-সাজানো প্লেট নিয়ে বনোয়ারি তখন আড্ডা-ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ঢোকার আগেই তার ট্রে-র ওপরকার প্লেটে সাজানো কচুরির গন্ধেই অবশ্য আড্ডা-ঘর মাত হয়ে গেছে।

বনোয়ারি তাঁর হাতেই প্রথম যে-প্লেটটা তুলে দিল, তার ডবল সাইজের কচুরির তাক যে প্লেটের ওপর প্যাগোডার মতো, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

সেদিকে চেয়ে অন্তরের খুশিটা অকপট উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেই ঘনাদা বললেন, 'হিঙের কচুরি কী হে, এ তো রাধা-চুরি! মানে রাধাবল্লভী আর কচুরির দ্বন্দ্ব-সমাস। তা বড় বেশি দিলে যে! এত কি আর এ-বয়সে শেষ করতে পারব?'

'খুব পারবেন, খুব পারবেন,' সবাই আমরা জোর গলায় আশ্বাস দিলাম, 'বয়স আপনার আর কী, চল্লিশই তো পার হয়নি।'

'চল্লিশ...! বলো কী হে!' ঘনাদা বিষম খাওয়াটা কোনওরকমে সামলে

বললেন, 'আমার চল্লিশ...'

'মানে ?' চটপট বাধা দিয়ে বললাম, 'চল্লিশে পৌঁছে ঠেকে গেছে আর কি ! পার হতে তো পারছে না ! তাই বলছি...'

তাই আর কিছু বলতে হল না। যে-কারণেই হোক, ঘনাদা একটু বেশিরকম খুশি হয়ে তাঁর প্লেটের রাধা-চুরি প্যাগোডার ওপর চুড়ো হিসেবে আরও দুটো শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সিগারেটটায় ক'টা সুখটান দিয়ে যেন ধাতস্থ হয়ে, প্রায় মেজাজের অসীম প্রসন্নতার পরিচয় দিয়ে নিজে থেকেই গোড়ায় ধরা প্রসঙ্গটা স্মরণ করে বললেন, 'হ্যাঁ, ভূগোল শেখায় তোমাদের আপত্তি জানাচ্ছিলে, না ? কিন্তু ভূগোলের প্রশ্ন কেন তুলেছিলাম জানো ? তুলেছিলাম, যা বলতে যাচ্ছি, ভূগোল কিছুটা না-জানা থাকলে তার রহস্যটাই ঠিক বোঝানো যাবে না। ভূগোলের ক'টা সোজা প্রশ্ন মাত্র তোমাদের করেছি। প্রশ্ন আর-দুটো বেশি করলে হয়তো উত্তরটার আভাস তোমরাও পেতে। এই যেমন যে-ক'টা প্রশ্ন করেছি তার ওপর যদি জানতে চাইতাম, কোন দেশে, কোথায় গোরিলাও যেমন, সিংহও তেমনই পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা চটপট উত্তর দিতে—আফ্রিকা। কিন্তু আফ্রিকা তো একটা বিরাট মহাদেশ। শুধু আফ্রিকা বললেই তো হবে না, আফ্রিকার কোথায়, বোঝানো যাবে না। সুতরাং শুধু আফ্রিকা বললেই হবে না, আফ্রিকার কোথায়, সেটা সঠিক জানা চাই।

'সঠিক জায়গাটা এখনও হয়তো ধরতে পারোনি বলেই বলে দিচ্ছি জায়গাটা। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা অঞ্চল, যার বর্ণনা দেওয়া খুবই শক্ত। গাছপালা আর ধাতু-সম্পদের কথা আগে আমার প্রশ্নে যা বলেছি, তাতেই বোঝা যাবে যে, জায়গাটার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। দেড়শো থেকে দু'শো ফুট উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল যেমন আছে, তেমনই আছে শুধু কাঁটাঝোপের বিস্তীর্ণ আধা-মরু অঞ্চল। একদিকে গোরিলা শিম্পাঞ্জিদের যেমন দেখা মেলে, তেমনই দেখা যায় উটপাখির পাল।

'আর বেশি বর্ণনা দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। তাই জায়গাটার নামটা বলেই ফেলি। নাম হল "ক্যামেরুন"। বর্ণনা আগে যেটুকু দিয়েছি, তার ওপরে বলতে পারি যে, যেমন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেমনই ইতিহাসের চমক দেওয়া কিছু ঘটনার বিশেষত্বে আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডটির একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

'ক্যামেরুনের উত্তর-পশ্চিমে পোর্তুগিজরা প্রায় চারশো বছর আগে সমুদ্র-কূলে যেখানে নামে, সেখানকার একটি নদীকে তারা "চিংড়ির নদী" নাম দিয়েছিল। ১৯১৯-এর এক শীতের মরসুমে একদিন সেখানে এক বুনো চেহারার সাহেবকে নিয়ে এই কাহিনী শুরু করতে হয়। সাহেবের চেহারাটা বুনো হলেও পোশাক-আশাক চালচলন সব একেবারে বাদশাহি মেজাজের। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের একটা বোঝা, আর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল

বাদে মানুষটার সবকিছুই ভদ্র, ফিটফাট আর মানানসই। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল আর মাথায় জট-পাকানো চুলের ঝোপ। সেটা তাঁর মুখের কোনও কাটা ঘায়ের দাগ-টাগ ঢাকা দেওয়ার ফিকির হতে পারে।

'মানুষটা চিংড়ি নদীর ধারে একটা গঞ্জের পাশে একটা মস্ত বাহারি তাঁবু পেতে সেখানে ডেরা বেঁধেছেন। এর মধ্যে ওখানকার কাফরি গাঁয়ের সর্দারকে নিজের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে খানাপিনায় আপ্যায়িতও করেছেন বারকয়েক।

'তাঁর মতলবও কিছু লুকোবার নেই। এখানে এসে ডেরা বাঁধবার পরেই তিনি এ-তল্লাটের যে-দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো দৈত্যাকার বাণ্টুকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন, তারাই সাহেবের পরিচয় দিয়ে শতমুখে তাঁর প্রশংসা করে তাঁর এ-মুলুকে আসার উদ্দেশ্য সকলকে জানিয়েছে।

'তাদের কাছে জানা গিয়েছে, সাহেবের নিজের দেশ হল বিলেত। নাম তাঁর ডাঃ লক। অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে সেখানকার অজানা সব রহস্য খুঁজে বার করে তার যতটা সম্ভব খবরাখবর বার করাই তাঁর কাজ। এ-কাজে ডাঃ লক দুনিয়ার অনেক জায়গায় বহু বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ও মুখের বুনো চেহারার আসল কারণ এমনই এক দারুণ আচমকা বিপদে পড়া। সে-বিপদে তাঁর মুখের ও মাথার চামড়া অনেকখানি পুড়ে সাদা হয়ে যায়। কোনওরকমে শেষপর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও বীভৎস চেহারার লজ্জায় তিনি আর পোড়া মুখ কাউকে না দেখাবার জন্যে মুখ ও মাথায় অমন জঙ্গল বানিয়ে রেখেছেন।

'এখন এই চিংড়ি নদীর মোহানায় তাঁর আস্তানা পাতবার কারণ কিন্তু তাঁর সেই অজানা দেশের রহস্য জানবার নেশা। এই ক্যামেরুনের ভেতরে এক জায়গায় যে এক দারুণ আগ্নেয়গিরি আছে, তা সবাই জানে। মাঝে-মাঝে বহু বছর অন্তর সেই আগ্নেয়গিরি খেপে উঠে আগুন উগরে তুলে ছড়ালেও তার সঠিক হদিস সভ্য জগতের কেউ এখনও জানে না। ডাঃ লক সেই রহস্য সন্ধানের অভিযানে যাওয়ার জন্যে পথের দিশারি হওয়ার মতো একজন ও-অঞ্চলের সাথী চান। তাঁর দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো পাহারাদারকে তিনি সেই খোঁজেই লাগিয়ে রেখেছেন। এই যমজ দানবদের পাহারাদারের কাজে নেওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে। ডাঃ লকের কে একজন নাকি পরম শত্রু তাঁর সুনামের হিংসায় বহুকাল থেকে তাঁর পিছনে লুকিয়ে লেগে থেকে হয় তাঁর আবিষ্কারের গৌরব চুরি করে নিজের বলে প্রচার করতে, নয় সেটা সম্ভব না হলে তাঁর বড়রকমের কোনও ক্ষতি করবার চেষ্টা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়ার জন্যেই ডাঃ লক এবার একজন নয়, গোধা আর লোধা নামে দুই যমজ ঘটোৎকচ ভাইকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

'গোধা আর লোধা শুধু শরীরের ক্ষমতাতেই দুর্দান্ত দানব নয়, তারা কাজের লোকও বটে।

'লকসাহেব চিংড়ি নদীর ধারে দিনপাঁচেক তাঁবু ফেলবার পরেই তারা

একজনকে জোগাড় করে আনে গঞ্জের এক বাজার থেকে।

'তাকে দেখে ডাঃ লক হেসেই খুন।

' "আরে এ কাকে এনেছিস ?" হাসতে-হাসতে ডাঃ লক জিজ্ঞেস করেন গোধা-লোধাদের, "এ চিমসে শুঁটকোটা তো তোদের চিংড়ি নদীর সত্যিকারের একটা কুচোচিংড়ি।"

'ডাঃ লকের কথায় লজ্জা পেলেও লোধা-গোধা একটু কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, "আজ্ঞে, আপনি মিছে ঠাট্টা করছেন কেন ? ও চিমসে চিংড়ি হলে আমাদের লোকসানটা কী ? ওকে তো আর কুস্তি লড়তে হবে না। শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাবে।"

'লোধা-গোধার যুক্তিটা যে ঠিক, ডাঃ লককে এবার তা স্বীকার করতে হয়। তিনি তাই হাসি থামিয়ে একটু ভাবনার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, "কিন্তু ওকে যা ঠাট্টা-অপমান করলাম, এর জন্যে ও আর আমার কাজ করতে চাইবে কি ?"

' "খুব চাইবে, খুব চাইবে," আশ্বাস দিয়ে বলে লোধা-গোধা, "দেখতে পাচ্ছেন না, কেমন অবাক হয়ে হাঁ করে তাঁবুর সব জিনিসপত্র দেখছে। ও আমাদের কথা কিছু বুঝেছে কি যে, ঠাট্টা-অপমানে রাগ করবে ?"

' "কিছু বোঝেনি মানে ?" ডাঃ লক বেশ ভয় পেয়েই জানতে চান, "ও কি বদ্ধ কালা-টালা নাকি ? তা হলে..."

' "না, না, কালা হবে কেন ?" লোধা-গোধা এবার বুঝিয়ে দেয় ডাঃ লককে, "আমরা তো বান্টুতে কথা বলেছি, ও তার কী বুঝবে ?"

' "বুঝবে না কীরকম ?" ডাঃ লককে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, "ও কি বাণ্টু জানে না ?"

' "একবর্ণও না," লোধা-গোধা জানায়, "বাণ্টু কেন, ওর নিজের ভাষা কানুড়ি ছাড়া হাউসা, ফুলানি, ফাং কিছুই জানে না।"

' "ঠিক, ঠিক," ডাঃ লক খুশি মুখে এবার বলেন, "নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না, এমন লোকই আমাদের সবচেয়ে দরকার। আজই ওকে কাজে নাও।"

'তাই নেওয়া হল সেইদিনই। কাজে নেওয়ার সময় নামটা নিয়ে শুধু একটু গোল বেধেছিল।

'খাতায় লেখার জন্যে তো বটেই, তাকে ডাকবার জন্যেও একটা নাম তো দরকার। কিন্তু নিজের কোনও নামই সে বলতে পারে না। সে যেখানে থাকে সেখানে গোনাগুনতি ক'টা তার মতো জংলীর মধ্যে ডাকাডাকির কোনও দরকার নাকি হয় না। হলেও তারা "এই" "ওই" বলে ডেকেই তাদের কাজ সারে।

'কিন্তু সেখানকার নিয়ম এখানে চলে না। নাম তো একটা দরকার। শেষকালে জংলীটা নিজেই বললে, এই কার্মার্দে, মানে চিংড়ি নদীর মোহানাতেই, যখন সে প্রথম কাজ পেয়েছে তখন তার নাম চিংড়িই রাখা

হোক।

'ডাঃ লক খুশি হয়ে বলেছেন, "ঠিক, ঠিক। ওর যা চিমসে কুচোচিংড়ির মতো চেহারা, তাতে ওই নামই ওর ভাল।" মানুষটা জংলী হলেও তার মাথাটা একেবারে নিরেট নয় দেখেও তিনি খুশি হয়েছেন।

'চিংড়িটাকে প্রথমে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া একটু শক্ত হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি নিরেট না হলেও লোকটা একেবারে জংলী। সাহেবসুবো তো দূরের কথা, সাধারণ একটু ভাল অবস্থার গৃহস্থ বাণ্টু কি হাউসাদের ঘরদোরের খবরও জানে না।

'ডাঃ লকের তাঁবুতে বেশি কিছু দামী ও বিদেশি আসবাব না থাকলেও, তাঁর কাজের জন্যে যা দরকার সেরকম কিছু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ছিল। তাঁর তাঁবু ঝাড়পোঁছ করবার সময় ডাঃ লক সেগুলো সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার হওয়ার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন তাঁর খাস পাহারাদার লোধা আর গোধাকে। তাই দিতে গিয়ে প্রায় কেলেঙ্কারি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

'জরিপ-টরিপের জন্যে দরকারি যন্ত্রপাতি ছাড়া ডাঃ লক তাঁর কাজের সুবিধের জন্যে একটা টেপরেকর্ডার তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি যে-ধরনের অভিযানে এসেছেন, তার প্রাত্যহিক বিবরণ রাখা একান্ত দরকার। একালে সে-বিবরণ হাতে লেখার তো কথাই আসে না। টাইপ করার জন্যে সঙ্গে টাইপরাইটার রাখাও একটা বাড়তি বেয়াড়া বোঝা বওয়া। ডাঃ লক তাই একটা ছোট টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর অভিযানের প্রতিদিনের বিবরণ তিনি মুখে বলে টেপ-এ ধরে রাখতেন।

'সেই যন্ত্রটা নিয়েই গণ্ডগোল বেধেছিল প্রথমে। পরে সাফসুফ করার সময় ও-যন্ত্রে হাত না দিতে বলার জন্যে রেকর্ডারটা একটু চালিয়ে দেখতে যেতেই হাউমাউ করে চিৎকার করে পড়ি কি মরি অবস্থায় চিংড়ি তো তাঁবুর বাইরে দে ছুট। সে তখন এই ভুতুড়ে তাঁবুর কাজ ছেড়ে দিতে চায়। লোধা-গোধাকে তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তাঁবুতে ফেরাতে হয়েছে।

'এরপর আর বিশেষ গোলমাল-টোলমাল হয়নি। যে-কাজের জন্যে তাকে নেওয়া, সে-কাজে চিংড়ি বাহাদুরিই দেখিয়েছে দিন-কয়েকের মধ্যে। ক্যামেরুনের এই অঞ্চল প্রায় অজানা জঙ্গল-পাহাড়, আবার আধা-মরুর দেশ। বুনো মোষ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ থেকে হিংস্র জংলী আদিবাসীদের এড়িয়ে সেখানে প্রতি পদে প্রাণ হাতে নিয়ে টহল দিতে হয়। এ-কাজে চিংড়ি কিন্তু দারুণ বাহাদুর। ডাঃ লক ক্যামেরুনের ভেতরের দিকে চাউ হ্রদের কাছে এক আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি অঞ্চলেই যেতে চান। প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু সেই আগ্নেয়গিরি নয়, তার কাছাকাছি "নিশ" নামে এক হ্রদই তাঁর লক্ষ্য।

'পদে-পদে যেখানে বিপদ, সেই সম্পূর্ণ অজানা, অতি দুর্গম দেশে চিংড়ি কিন্তু কোন অদ্ভুত ক্ষমতায় সবচেয়ে নিরাপদে আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছচ্ছে বোঝা গেল।

'এদিক দিয়ে পুরোপুরি খুশি হওয়ার কারণ থাকলেও, ডাঃ লক তখন কিন্তু দারুণ ভয় আর দুর্ভাবনায় পড়েছেন। তাঁর যে-দুশমনের ভয়ে লোধা-গোধার মতো দুই যমজ ঘটোৎকচকে তিনি পাহারায় নিয়েছেন, তার হাত থেকে তিনি যে রেহাই পাননি, তা তিনি এই অভিযানে চিংড়ি নদীর মোহানা থেকে রওনা হওয়ার ক'দিন পরেই টের পেলেন।

'সে-দুশমন যে তাঁর সঙ্গেই আছে তার প্রথম প্রমাণ যা পাওয়া গেল, তা খানিকটা যেন ঠাট্টার মতো ব্যাপার। অভিযানের বিবরণ টেপরেকর্ডারে তুলে রাখলেও পথের হদিস ধরে রাখবার জন্যে ডাঃ লক খুব সংক্ষেপে একটা মানচিত্রের খসড়া লিখে আর এঁকে রাখতেন। সেই খসড়া ম্যাপের ওপর একদিন হঠাৎ কিছু হিজিবিজি কাটা দেখা গেল।

'সেই হিজিবিজি কাটাকুটিতে ভাবনার খুব বেশি কিছু ছিল না। চিংড়িই হয়তো তাঁবুর ঝাড়পোঁছ করবার সময় অসাবধানে বা জংলি খেয়ালে তাতে অমন দাগ কেটে থাকতে পারে, কিন্তু সেই হিজিবিজির পাশে স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা, সেটাই তো অবিশ্বাস্য একটা রহস্য।

'হিজিবিজির আশেপাশে গোটা-গোটা হরফে স্প্যানিশে লেখা, "ট কোয়ে তাল আমিগো?"

'ডাঃ লক স্প্যানিশ না জানলেও ও-ক'টা কথার মানে জানেন। ও-কথাগুলোর মানে হল, "কেমন আছ বন্ধু?"

'এই অজানা বিদেশে এক গোপন অভিযানে এতদূর আসবার পরে তাঁর দুই যমজ দানব আর এক জংলী নফরের পাহারা দেওয়া তাঁবুতে ঢুকে এ-কাজ কার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

'সম্পূর্ণ ভৌতিক ছাড়া ব্যাপারটার তো আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না।

'অত্যন্ত অস্থির হলেও ব্যাপারটা নিয়ে হইচই না করে ডাঃ লক রহস্যটা বুঝবার জন্যে কিছুদিন নিঃশব্দে সজাগ থাকবেন বলে ঠিক করলেন।

'কিন্তু তার ফল যা হল, তাতেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম।'

গল্প বলতে-বলতে চুপ করে গেলেন ঘনাদা। কী হল? কেন আর তিনি মুখ খুলছেন না? কেন যে খুলছেন না, শেষপর্যন্ত শিশিরই সেটা বুঝতে পেরে এগিয়ে দিল তার সিগারেটের টিন। ঘনাদা তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প।

'যেমন তাঁর নিয়ম, তেমনই সেদিন সকালের খাওয়াদাওয়ার পর ডাঃ লক তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে তাঁর অভিযানের আগের দিনের বিবরণ রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করছিলেন।

'কিন্তু যন্ত্রটা দেখেই তো তাঁর চক্ষু স্থির।

'তাঁর আগে কেউ যে সেটা ব্যবহার করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে রয়েছে।

'সেটা নিয়ে যে নাড়াচাড়া করা হয়েছে তা লুকোবার কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। যেখানে যন্ত্রটা থাকে, তার বদলে টেবিলের অন্য একধারে অগোছালো কাগজপত্রের মধ্যে এমনভাবে সেটা ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে ওখানে যে অন্য কারও হাত পড়েছে তা বুঝতে কোনও কষ্ট না হয়।

'এরপর যন্ত্রটা চালাতে যা শোনা গেল, তাতে ভাবনায়, আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হওয়ার জোগাড়। স্পষ্ট জার্মান ভাষায় সেখান থেকে তখন শোনা যাচ্ছে, "আমি তোমার সঙ্গে আছি, ডাঃ লক। আর লক, তোমার আসল নাম যে ব্রুল, তা আমার জানা!"

'টেপরেকর্ডারের কথা ওইটুকুতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু যেটুকু ওখানে আছে তাই শুনেই ডাঃ লক তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন বলা চলে। প্রথমত, নিজের ঠিকমতো হুঁশ আছে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। সত্যিই, নেহাত স্বপ্নে ছাড়া এরকম ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব? মনের সংশয় কাটাবার জন্যে টেপরেকর্ডারটা একবারের জায়গায় ডাঃ লক বারবার, অন্তত দশবার, চালিয়ে দেখলেন।

'না, তাঁর মনের ভুল নয়। সত্যিই কে একজন স্পষ্ট চলিত জার্মান ভাষায় ওই ক'টা কথা সেখানে রেকর্ড করিয়ে রেখেছে।

'কিন্তু কার দ্বারা, কেমন করে তা সম্ভব? এ-কাজ যে করেছে, তার তো এই অভিযানের সঙ্গেই থাকা দরকার। যে-দুর্গম অজানা সব অঞ্চলের ভেতর দিয়ে চিংড়ি তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কারও অজান্তে তাঁর দলের রাস্তা ধরেই লুকিয়ে সঙ্গে চলা প্রায় অসম্ভব।

'আর তা-ও যদি সম্ভব হয়, তা হলেও তাঁবুর ভেতর কখন কীভাবে ঢুকে সে এ-কাজ করবে? তাঁবুর মধ্যে তিনি নিজে অধিকাংশ সময় থাকেনই। আর তাছাড়া লোধা-গোধা দুজনেই সারাক্ষণ থাকে কড়া পাহারায়। চিংড়ির কথা ধরবারই নয়। তবু তাকেও বাদ না দিয়ে ডাঃ লক লোধা-গোধার সঙ্গে তাকে ডেকে অত্যন্ত কড়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

'লোধা-গোধা দুজনেই তো ডাঃ লকের জেরা শুনে একেবারে হতভম্ব। এই সফরে তাদের সঙ্গে লুকিয়ে আসা কেমন করে সম্ভব?

'আর যদিও লুকিয়ে-চুরিয়ে কেউ তাদের কাছাকাছি আসতে পেরে থাকে, এ-তাঁবুর ভেতরে ঢুকে সাহেবের যন্ত্র ছোঁয়ার সময়-সুযোগ সে পাবে কী করে?

'লোধা-গোধার কাছে এর চেয়ে এ-রহস্যের হদিস পাওয়ার মতো উত্তর লক আশা করেননি। তবু তাদের তিনি হয়রান করে মেরেছেন। সম্ভব-অসম্ভব হাজার রকম প্রশ্ন করে শেষপর্যন্ত হতাশ হয়েই বিদায় দিতে হয়েছে তাদের।

'লোধা-গোধার পর এ-ব্যাপারে হদিস পেতে জংলী চিংড়িকে ডাকার কোনও মানে হয় না।

'তবু কোনওদিকে ত্রুটি রাখবেন না বলে লক লোধা-গোধাকে দিয়ে তাকেও ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে চিংড়ির ভাষা কানুড়িতে তাকে জেরার ব্যবস্থা

করেছেন। সে-জেরায় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে চিংড়ির কথা শুনে কিন্তু তিনি থ'। লকের হুকুমে লোধা-গোধা চিংড়িকে কানুড়িতে জিজ্ঞেস করেছিল, সে এ-তাঁবুতে কাজ করবার সময় আর কাউকে কখনও দেখেছে কি না।

'চিংড়ি তাতে যা উত্তর দিয়েছে তা শুনে একেবারে থ' হয়ে লোধা-গোধা সেটা অনুবাদ করে লক-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতেই গেছে ভুলে।

'লক তাদের হতভম্ব ভাব দেখে ধমক দিয়ে ওঠার পর তারা থতমত খেয়ে চিংড়ি যা বলেছে তা জানিয়েছে।

'চিংড়ি যা জানিয়েছে, তাতে তাদের হতভম্ব হওয়ারই কথা অবশ্য। চিংড়ি বলেছে, সে নাকি তাঁবুতে রোজই আর-একজনকে দ্যাখে।

' "রোজই আর-একজনকে দ্যাখে ? কখন ?" লক লোধা-গোধাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়েছেন।

' "কখন আবার ?" চিংড়ি জানিয়েছে, যতক্ষণ সে এ-তাঁবুতে থাকে, সারাক্ষণই।

' "সারাক্ষণই ?" লোধা-গোধার মারফত কথাটা শুনে কী মনে করবেন ভেবে না পেয়ে লক রাগে দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, "কোথায় ? এ-তাঁবুর কোথায়, কোনখানে ?"

'লোধা-গোধার কাছে প্রশ্নটা শুনে নির্বিকারভাবে চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে, তাতে হাসবেন না জ্বলে উঠবেন ডাঃ লক তা ঠিক করতে পারেননি।

'চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা তাঁবুর এক ধারে লকের চুল আঁচড়ানো, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম রাখার জন্যে টেবিলের ওপর ঝোলানো একটা আয়না।

'জংলীটাকে তখনকার মতো হাসতে-হাসতে তাঁবু থেকে দূর করে দিলেও ব্যাপারটা নিয়ে লকের দুর্ভাবনা ক্রমশ চরমে উঠেছে।

'চিংড়ির দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে তখন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছেন।

'কাঁটাঝোপের আধা-মরু পাথুরে ডাঙা পার হয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে ছোটখাটো হ্রদ আর শুকনো গভীর খাদ তাঁদের পথে পড়েছে। দূরে একটা আকাশ-ছোঁয়া যে-পাহাড়ের চূড়া তাঁদের চোখে পড়েছে, সেটা ক্যামেরুনের আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কিছু নয় বলে বুঝেছেন লক।

'কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু হয়েছে, যাতে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখাই শক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপার যা ঘটেছে তা লকের টেপরেকর্ডারিটা সম্পর্কেই।

'প্রথম সেখানে অজানা ভুতুড়ে কণ্ঠ শোনার পর বেশ কিছুদিন আর কিছু হয়নি। ক্যামেরুনের আগ্নেয়গিরি দেখার পরই একদিন সকালে টেপরেকর্ডারে আবার সেই ভুতুড়ে গলা হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, "শোনো, শোনো ব্লুল," টেপরেকর্ডার থেকে পরিষ্কার জার্মান ভাষায় শোনা গেছে, "যেখানে তুমি চেয়েছিলে সেখানে তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ বললেই হয়। আর একদিন কি

একবেলা গেলেই নিয়ল হ্রদের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে যাবে। কিন্তু নিয়ল হ্রদ কি ক্যামেরুনের আগ্নেয়গিরি তো সত্যিই তোমার লক্ষ্য নয়। তোমার আসল লক্ষ্য, এই অঞ্চলের অসংখ্য সব অজানা গুহা-গহ্বর। এমন অদ্ভুত সন্ধানে কেন তুমি এসেছ, তা যে আমি জানি, তা বুঝতে পেরেছ কি ? না পেরে থাকলে দুনিয়ার সবাই যা জানে সেই পুরনো ইতিহাস তোমায় একটু স্মরণ করিয়ে দেব। একটা দিন শুধু ধৈর্য ধরো।"

'টেপরেকর্ডার ওইখানেই চুপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধৈর্য ধরবেন কী, রাগে, ভয়ে, দুর্ভাবনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন ডাঃ লক। টেপরেকর্ডারের কথায় যাঁর আসল নাম লক নয়, ব্রুল।

'ভেতরে-ভেতরে খেপে গেলেও ব্রুল এবার চেঁচামেচি করে লোধা-গোধা কি চিংড়িকে ডাকাডাকি করেননি। তার বদলে, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা দিয়ে টেপরেকর্ডারের সঙ্গে এমন ক'টা বৈদ্যুতিক তার লাগানো কলের ফাঁদ পেতে রেখেছেন যে, রেকর্ডারে কেউ হাত দিলেই একটা হঠাৎ ঝিলিক দেওয়া আলোয় গুপ্ত একটা ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাবে।

'ছবি ঠিকই উঠল। তবে তা ব্রুলের নিজেরই ছবি। রেকর্ডারের সঙ্গে ক্যামেরার গুপ্ত সংযোগের কৌশলটা করে রেখে ব্রুল সেদিন কাছাকাছি অঞ্চলের একটু ভাসা-ভাসা জরিপের কাজ করেছেন, সেখানকার গুহা-গহ্বর, ছোটখাটো পাহাড়-টিবি-হ্রদ ছকে রাখবার জন্যে। এ-কাজে লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুর পাহারা ঠিকই রেখেছে, আর তাঁকে তাঁর দরকার মতো সাহায্য করেছে।

'সন্ধেবেলায় ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরে প্রথমেই টেপরেকর্ডারের দিকে গিয়ে তাঁর ক্যামেরার ফাঁদ কীরকম কাজ করেছে দেখার ইচ্ছে হলেও তিনি নিজের ওপর রাশ টেনে রেখেছেন।

'তারপর লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুতে তাদের কাজ সেরে চলে যাওয়ার পর অতি সাবধানে রেকর্ডারের কাছে গিয়ে সেটা চালাবার সুইচ টিপতেই আচমকা সেই অদ্ভুত ব্যাপার।

'তাঁর নিজের পাতা ক্যামেরার ফাঁদে আলোর ঝিলিকে তাঁর নিজেরই ফ্ল্যাশ ছবি উঠে গেছে। আর সেইসঙ্গে চালু হওয়া টেপরেকর্ডারের অজানা ভুতুড়ে গলায় শোনা গেছে, "বড় দুঃখিত ব্রুল, তোমার পাতা ফাঁদে তোমাকেই কাবু হতে হল। কিন্তু এখন বাজে কাজে আর কথায় নষ্ট করবার সময় নেই। আসল কথা যা তোমায় বলতে চাই, তার জন্যে দুনিয়ার সকলের যা জানা নেই, সেই পুরনো ইতিহাসটা আগে তোমায় নতুন করে একটু শুনিয়ে দিতে হবে। আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই অঞ্চলটা জার্মানদের অধিকারে ছিল। 'এখনকার জার্মানি নয়, আগেকার জার্মানি। প্রথম মহাযুদ্ধ হওয়ার পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অধীন জার্মান সাম্রাজ্যের অনেক কিছুর মধ্যে এইসব জায়গার অধিকারও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের হাতে চলে গেছে।

' "পৃথিবীর নানা দেশ জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজরাই ছিল ইওরোপের আর-সব দেশের চেয়ে এগিয়ে। তখনও উড়োজাহাজের দিন শুরু হয়নি। পৃথিবীর সমুদ্রে-সমুদ্রে যার যত বেশি রণতরীর প্রাধান্য, তার সাম্রাজ্যও তত বিরাট। সেদিক দিয়ে ইংল্যান্ডের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যেত না বলে ছিল ইংরেজদের গর্ব।

' "ইংরেজদের পরে এ-বিষয়ে দ্বিতীয় বৃহৎ বিশ্বসাম্রাজ্য ছিল ফরাসিদের। এই দুই জাতের পরে এদিকে দৃষ্টি দেয় বলে জার্মানির সাম্রাজ্য ছিল অনেক ছোট। কিন্তু পৃথিবীর যেটুকু জায়গা তারা অধিকার করেছিল, নানা দিকে তার উন্নতি বিধানের চেয়ে সেগুলি থেকে যতখানি সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তারা ছিল বুঝি সব দেশের চেয়ে অগ্রসর। এই অঞ্চলটাতেও তারা অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু বড় কাজ শুরু করেছিল। মহাযুদ্ধে হারের দুঃখ যেমন, তেমনই এইসব অধিকার হারাবার অপমান আর জ্বালা জার্মানদের অনেকেই ভুলতে পারেনি। আগের জার্মান সাম্রাজ্য লোপ পেলেও আবার নতুন করে পৃথিবী জয় করবার স্বপ্ন শুধু নয়, সে-স্বপ্ন সফল করার সাধ্য-সাধনের জন্যে যারা গোপনে-গোপনে তৈরি হচ্ছে, তাদের নেতার নাম অ্যাডল্‌ফ হিটলার। হিটলার এখনও একটা জঙ্গী দলের সর্দার মাত্র। দেশপ্রেমের নামে পৃথিবীর আর সব দেশকে পায়ের তলায় চেপে শুধু হিংসা-ঘৃণা-স্বার্থপরতাই যেখানে মানুষের ধর্ম, বিশ্বের সঙ্গে শুধু প্রভু আর ক্রীতদাসের সম্বন্ধে বাঁধা এমন এক দানবীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই গড়ে তুলতে চাইছে সে।

' "এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইওরোপের অন্য দেশের তুলনায় জার্মানি যে বিজ্ঞানে কিছুটা বেশি অগ্রসর, তার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকাশযান হিসেবে তার জেপেলিন তৈরি, সুদূর জার্মানি থেকে প্যারিসে গোলাবর্ষণ ইত্যাদির মতো ব্যাপারেই কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেলেও সেই বিজ্ঞান-উদ্ভাবন দিয়েই হিটলারের দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে তা জিতবার স্বপ্ন দেখছে।

'"প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধে-নামা ইওরোপের সব দেশই পয়জন-গ্যাস অর্থাৎ বিষ-বাষ্প ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। নানারকম বিষ-বাষ্প উৎপাদন করে তা জমা করে একটু-একটু ব্যবহারের পর বিষ-বাষ্প যে আর ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণ, ঢিলের বদলে পাটকেল খাওয়ার ভয়। তখন যারা বিষ-বাষ্প তৈরি করেছিল, সেসব দেশই তারপর সেসব গ্যাস সাবধানে নানা জায়গায় জমা করে লুকিয়ে রাখে।

' "প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষপর্যন্ত কাজে না লাগালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যে ব্যবহার হবে না, সে-কথা কে বলতে পারে। হিটলারের জার্মানি তাই অস্ত্র হিসেবে বিষ-বাষ্প জমা করে রাখতে চায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে তার হাত-পা অনেক দিক দিয়ে বাঁধা। পয়জন-গ্যাস বানাতে গেলে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরা পড়বারই কথা। পড়লে সব মতলব ভেস্তে

যাবে। এ-সঙ্কট কাটাবার উপায় বার করবার জন্যেই 'ডাঃ লক' নাম নিয়ে তোমার মতো গুপ্ত নাৎসি-র আসরে নামা।জার্মানিতে বিষ-বাষ্প খোলাখুলি, এমনকী লুকিয়েও, তৈরি করতে গেলে বিপদ আছে। তা থাক, বিষ-বাষ্প উৎপাদনের বদলে কোনও অজানা জায়গায় মজুত গ্যাস জোগাড় করবার ব্যবস্থা করলে তো সেভাবে ধরা পড়বার ভয় নেই ।

' "কোথায় কোন অজানা জায়গায় সেরকম মজুত লুকনো গ্যাসের সঞ্চয় আছে ? কোথায় আছে, তা আর কেউ না জানুক, জানে 'ব্রুল' নামে এক জার্মানি ভবঘুরে আধা-বিজ্ঞানী। দুর্গম অজানা সব দেশে টহল দিয়ে নানারকম অদ্ভুত খবর সংগ্রহই যার নেশা।

' "সেই ব্রুল, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির হার হওয়ার পর যুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অপরাধে মিত্রশক্তির গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে যে নানা জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।

' "জার্মানিতে হিটলারের অধীনে নতুন নাৎসি দল গড়ে ওঠে, আবার জার্মানির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হওয়ার পর। আগের যুদ্ধের মজুত করা পয়জন-গ্যাস কাজে লাগতে পারে ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে ব্রুলের মনে পড়ে আগেকার এক আবিষ্কারের কথা। সে নতুন করে তা খুঁজে বার করবার কথা ভাবে।

' "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে তার ভবঘুরে টহলদারির সময় সে ক্যামেরুনের আগ্নেয়গিরির চারধারে ছোট-ছোট হ্রদ অঞ্চলে অনেক-অনেক গুপ্ত হ্রদের গহ্বর দেখেছিল, যার ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে বিষ-বাষ্প বেরিয়ে আশপাশের জংলীদের বসতিতে মড়ক লাগাত। সে তখনই বুঝেছিল যে, এইসব গুপ্ত হ্রদের গহ্বরের তলায় এমন প্রচুর বিষ-বাষ্পের সঞ্চয় আছে, যা বাইরে ছাড়া পেলে সারা দেশে মড়ক বাধিয়ে দিতে পারে। জার্মানির হারের পর সেখানকার অনেক পুরনো পাপী নাম ভাঁড়িয়ে যথাসম্ভব চেহারা পালটে ভিন দেশে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। সে-চেষ্টায় সফল তারা সবাই হয়নি। আসল পাপীরা অধিকাংশই ধরা পড়ে, তাদের উচিত-শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। শুধু পাকা শয়তানদের তালিকা দেওয়া খাতায় তোমার নাম ছিল না বলে নয়, জার্মানির ভাগ্যের আকাশ যে অন্ধকার হয়ে আসছে, তা একটু আগে থাকতে বুঝে ইওরোপ ছেড়ে এই আফ্রিকায় এসে লুকোবার জন্যেও তুমি এ-যাত্রায় বেঁচে গেছ।

' "এই জংলা প্রবাসে কখনও খেয়ালি ভবঘুরে, কখনও টহলদার খ্রিস্টান সাধু সেজে তুমি ক্যামেরুন-আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নিয়ল হ্রদের আশেপাশে গুপ্ত সব বিষ-বাষ্পের যেমন সন্ধান পেয়েছ, তেমনই জার্মানিতে কে এক অ্যাডল্‌ফ হিটলারের অধীনে জার্মানিকে আবার বিশ্বজয়ী করে তুলবার জন্যে এক নাৎসি দলের অভ্যুত্থানের কথাও শুনেছ।

' "এরপর লুকিয়ে বারকয়েক ইওরোপ গিয়ে হিটলারের চেলা-চামুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করে তুমি তোমার আবিষ্কার করা পয়জন-গ্যাসের সঞ্চয়ের কথা

জানিয়ে তার সঠিক-হদিস-জরিপ-করে-দেওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে রাখবার জন্যে আবার এই ক্যামেরুনে রিও দে কার্মার্দে, মানে, চিংড়ি নদীর মোহানায় এসে নিয়ল হ্রদের অঞ্চলে যাওয়ার সবচেয়ে সোজা আর নিরাপদ রাস্তা দেখাতে এই এক জংলী চিংড়িকে কাজে লাগিয়েছ।" '

ঘনাদা যে ফের মুখ বন্ধ করেছেন, তার কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, ইতিমধ্যে আর-এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, শিশিরের টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে, তিনি আবার গল্পের খেই ধরলেন।

'দাঁতে দাঁত চেপে টেপরেকর্ডারের কথা শুনতে-শুনতে ব্রুল হঠাৎ চমকে উঠে টের পায়, যে-কথাগুলো সে শুনেছে, সেগুলো টেপরেকর্ডার থেকে নয়, তাঁবুর মধ্যে এইমাত্র ঢোকা সেই জংলী চিংড়িটার মুখ দিয়েই বার হচ্ছে।

'জংলীটা কয়েক সেকেন্ড আগে যেরকম বেপরোয়াভাবে তাঁবুর ভেতর এসে টেপরেকর্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই কথা বলতে শুরু করেছিল তাতে হতভম্ব হয়ে বিহ্বল হয়ে ব্রুল তো তখন প্রায় তোতলা।

' "তু-তু-তু, মানে আপ-আপ-আপ, মানে আপনি," বলে আড়ষ্ট জিভটায় সাড় ফেরাবার চেষ্টায় তার মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছে।

' "থাক, থাক, !" বলে বেশ একটু ঠাণ্ডা গলায় তাকে থামিয়ে চিংড়ি বললে, "আমার মতো জংলীর মুখে সামান্য একটু জার্মান শুনে 'তুই' থেকে অমন 'আপনি'তে উঠতে হবে না। তার বদলে শির-ছেঁড়া সন্ন্যাস-রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোনো।"

'কিন্তু ব্রুল তখন রাগে অপমানে একেবারে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। "তুই, তুই," বলে মুখ দিয়ে যেন লাভা ওগরাতে-ওগরাতে তাঁবুর ভেতর হঠাৎ যমজ ঘটোৎকচের এক ভাই গোধাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললে, "কী করিস তোরা ? কী জন্যে এত টাকা দিয়ে তোদের পাহারায় রেখেছি ? কী বলে ওই চিংড়িটার মতো শয়তানকে আমাদের কাজে নিয়েছিস ? আমি তোদের সকলকে গুলি করে মারব। হ্যাঁ, গুলি করে...। তার আগে এই চিমসে চিংড়ি চামচিকেটাকে তাঁবু থেকে বার করে নিয়ে...বার করে নিয়ে, হ্যাঁ, ওই নিয়ল হ্রদের ধারে একটা বিষাক্ত-গ্যাসের গহ্বরে, হ্যাঁ, ওই গহ্বরে ফেলে দিয়ে আয়।"

'ব্রুলসাহেবের এ-মূর্তি গোধা কখনও দ্যাখেনি। সে একটু থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "গর্তে ফেলে দেব ? ওই বিষাক্ত-গ্যাসের গহ্বরে ?"

' "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই ফেলবি," ব্রুল গর্জন করে উঠল, "ছোটখাটো নয়, সবচেয়ে গভীর যে গহ্বর, সেইটাতে। কী করেছে এই চিমসে চিংড়িটা তা জানিস ? জানিস ওকে... ?"

'কিন্তু সেসব কথা শোনার জন্যে গোধা আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। চিংড়িকে দু-হাতে শূন্যে তুলে ধরে সে তখন তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

'তারপর কতক্ষণ বা আর, পাঁচ, বড়জোর সাত মিনিট, কী করবে ঠিক করতে না পেরে ব্রুল তখন তার তাঁবুর ভেতর খাঁচায় ভরা বাঘের মতো এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে।

' "সেলাম সাহেব!" তার অস্থির পায়চারির মধ্যে ডাকটা শুনে ব্রুল চমকে ফিরে তাকিয়ে অবাক।

'তাকে তাঁবুর দরজার পরদা সরিয়ে ডাকছে লোধা কি গোধা নয়, ডাকছে চিমসে চিংড়িটা।

' "অ্যাঁ, তুই!" ব্রুলের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ একটু ভয় মেশানো, "গোধা কোথায় গেল?"

' "কোথাও যায়নি," চিংড়ি যেন আশ্বাস দিয়ে বোঝাল, "তবে একটু ভাল ব্যান্ডেজ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আপাতত একটু টিংচার আয়োডিন।"

' "টিংচার আয়োডিন?" ব্রুল যেন রাগে-দুঃখে চিৎকার করে উঠল, "এমন অবস্থা হয়েছে যে, টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা দরকার? লোধা, লোধা, লোধা কোথায়?"

' "না না, তার তেমন কিছু হয়নি," চিংড়ি আশ্বাস দিলে, "সে-ই তো দাদা গোধাকে বয়ে আনছে। তেমন জখম হলে কি পারত?"

' "জখম হয়েও সে-ই দাদাকে বয়ে নিয়ে আসছে?" ব্রুলের গলায় যেন রাগ-দুঃখ মেশানো আর্তনাদ ঠেলে উঠছে, "এখন আমি কী করব বলতে পারো কেউ?"

' "আমি পারি," চিংড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বললে। তাতে ব্রুল আবার জ্বলে উঠল। হঠাৎ একটা ড্রয়ার থেকে তার রিভলভারটা বার করে চিংড়ির দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরে সে গর্জন করে বললে, "তোকে আমি গুলি করে মারব। যা তোর নাম, সে-ই চিংড়ি কি ইঁদুরের মতো।"

'রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েও চিংড়ি কি নির্বিকার? "না," রীতিমত যেন ভয় পেয়ে সে বললে, "থামো, থামো ব্রুল, হুট করে এমন যা-তা করে ফেলো না। ও রিভলভারে আমাকে মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ? আমায় গুলি করে মারা মানে তোমার কী ভয়ানক বিপদ?"

' "তোকে মারলে আমার বিপদ?" ব্রুল জ্বলে উঠে বললে, "তোর মতো একটা ছুঁচোকে মারলে..."

' "থামো, থামো," চিংড়ি যেন কাতর মিনতি করে বললে, "নেহাত যদি মারতেই চাও তো আমার পরিচয়টা তার আগে একবার ঠিক করে জেনে যাও। আমায় একবার বলছ ইঁদুর, তারপরে আবার চিংড়ি, তারপর আবার বললে ছুঁচো। আমি তোমার চোখে ঠিক কোনটা সেইটা মরার আগে-আগে জেনে যেতে চাই। সেইসঙ্গে এটুকু শুধু নিবেদন করতে চাই যে, চিংড়ি, ইঁদুর কি ছুঁচোকে কেউ গুলি করে মারে না। তাদের..."

' "তুই...তুই..." রাগে প্রায় তোতলা হয়ে ব্রুল গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলে, "হ্যাঁ, আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস ? এত বড় তোর সাহস ? ভাবছিস তোকে আমি গুলি করে মারতে পারি না ? তোর মতো একটা ছুঁচো, একটা চামচিকে..."

' "থামো, থামো," চিংড়ি এবার ঠাণ্ডা গলায় ব্রুলকে যেন শান্ত করতে চাইলে, "ছুঁচো, চামচিকে, ইঁদুর, চিংড়ি—যা-ই আমি হই না কেন, আমায় গুলি করে নিশ্চয়ই তুমি মারতে পারো, কিন্তু মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ ?"

' "কী ভেবে দেখব ?" ব্রুল চিৎকার করে বললে, "তোকে মারলে কোন আইনে কে আমাকে এখানে ধরবে ? তোকে এই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে লাশটা শুধু ওই একটা বিষাক্ত-গ্যাসের পাতাল-গুহায় ফেলে দেব ।"

' "হ্যাঁ, তা দিতে পারো," চিংড়ি যেন তা স্বীকার করে নিয়ে বললে, "কিন্তু তারপর ?"

' "তারপর মানে ?" ব্রুল দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "তারপর আবার কী ?"

' "তারপরই যত গণ্ডগোল," যেন দুঃখের সঙ্গে জানালে চিংড়ি ।

' "তারপরে গণ্ডগোল ? তোর মতো একটা...তোর মতো একটা..."

'ব্রুলকে তার তোতলামির মধ্যে থামিয়ে দিয়ে চিংড়ি বললে, "হ্যাঁ, আমার মতো ছুঁচো, ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি যা-ই বলো, তাকে মারার পর কত গণ্ডগোল শুরু, তা বুঝতে পারছ না ? শোনো, বুঝিয়ে বলি । আমার মতো একটা ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি যা-ই বলো, তাকে তোমার রিভলভারে ঝাঁঝরা করে একটা বিষাক্ত-গ্যাসের পাতাল-গুহায় না-হয় ফেলে দিলে । কিন্তু তারপর তুমি নিজেই যে একেবারে অথই গাড্ডায় পড়বে, তা বুঝতে পারছ কি ?"

' "তোকে পাতাল-গুহায় ফেলে আমি অথই গাড্ডায় পড়ব ?" কথাগুলো রাগে গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলেও ব্রুল তার হতভম্ব ভাবটা ঠিক লুকোতে তখন পারছে না । সে-ভাবটা যথাসাধ্য চাপা দিয়ে তবু দাঁত খিঁচিয়েই বললে, "কেন ? তুই ভূত হয়ে আমায় গাড্ডায় ঠেলে দিবি ?"

' "না না, ভূত হতে হবে কেন আমাকে ?" চিংড়ি বোঝাবার চেষ্টা করলে, "আমি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কোনও পাতাল-গুহায় তলিয়ে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে তা একটুও বুঝতে পারছ না ? বুঝতে পারছ না যে, আমি না থাকলে তুমি তোমার ওই লোধা-গোধাকে নিয়েও কী অসহায় ! ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এই অজানা মরু-পাহাড়-জঙ্গলের দেশে আমি পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে এসেছি । আমি না থাকলে সারাজীবন খুঁজে-খুঁজেও এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথের হদিস পাবে না । সুতরাং আমার লাশ যদি বিষাক্ত-গ্যাসের পাতাল-গুহায় পড়ে থাকে, তা হলে তোমার লাশও এখানকার মরু-পাহাড়-জঙ্গলে কোথাও রোদে-বৃষ্টিতে শুকোবে কি পচবে, কিংবা এখানকার সিংহ-চিতা-নেকড়ের মতো হিংস্র প্রাণীদের পেটেও যেতে পারবে । তাই বলছি, আমায় মারার মতো অমন ভুল করার চেষ্টাও কোরো না ।"

'একটু থেমে চিংড়ি আবার বললে, "গুলি করেও কোনও লাভ নেই অবশ্য। তোমার ওই রিভলভার আমি আগে দেখিনি মনে করছ? এর মধ্যে আমায় মারবার মতো একটি গুলিও আমি কি রেখেছি? সুতরাং শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো। শোনো, দেশকে ভালবাসো বলে নাৎসিদের দলে একসময় ভিড়েছিলে বটে, কিন্তু নীচ নোংরা কাজ কখনও করোনি। তা ছাড়া এককালে খ্রিস্টান সাধু হয়ে আফ্রিকার এই ক্যামেরুন অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের সেবায় জীবন কাটিয়ে তাদের উন্নতির জন্যে যা দরকার, তা করবার ইচ্ছে তোমার ছিল। আজ আবার সেই সুযোগই তোমার এসেছে। এই আগ্নেয়গিরির অজানা অঞ্চলে অসংখ্য বিষাক্ত-গ্যাসের পাতাল-গুহা আছে। সেইসব গোপন গুহা থেকে বিষাক্ত-গ্যাস মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আদিবাসীদের সব বসতি ধ্বংস করে হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। তাদের রক্ষা করবার ব্রত নিয়ে তুমি এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই একটি মঠ গড়ে তুলতে পারো। সেই মঠ ধর্মের জন্যেও যেমন, বিজ্ঞানের গবেষণাতেও তেমনই তন্ময় হয়ে থাকবে। অন্যসব কাজের মধ্যে এখানকার বিষ-বাষ্প জমানো গুপ্ত গুহার খবর রাখাই হবে তোমার মঠের প্রধান দায়িত্ব। এখানে সেরকম কিছু বেয়াড়া ব্যাপারের আভাস পেলেই তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার জংলী আদিবাসী ভক্তদের দিয়েই রাজধানীতে না পারো অন্য কোনও ব্যবসার ঘাঁটিতে খবর পাঠাবে। সময়ে খবর পেলে এ বিষ-বাষ্পের সর্বনাশা ক্ষতি হয়তো ঠেকানো যাবে।"

'চিংড়ির কথা শুনে ব্রুল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওই নিয়ল হ্রদের কাছেই তার মঠ স্থাপন করেছিল। অন্তত করেছিল বলেই আমার ধারণা। গুপ্ত সব গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যে-ভয়ঙ্কর সর্বনাশ এবার হয়ে গেল, তার আভাস পেয়ে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রুল তা জানাবার জন্যে তার আদিবাসী দূতকে নানা জায়গায় পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই ফাং থেকে ফুলানি থেকে হাউসায় কথা চালাচালি করায় কোথাও-না-কোথাও ভুল হওয়ার জন্যেই সে-খবর আমাদের সভ্য জগতে পৌঁছয়নি। কিংবা...'

'কিংবা কী, ঘনাদা?' আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কিংবা...' ঘনাদা একটু ধীরে-ধীরে বললেন, 'সেই চিংড়ির সঠিক পরিচয় জানার কৌতূহলটা তার কাছে এত বড় হয়েছে যে, সেই সন্ধানে বেরিয়ে আর তার আফ্রিকায় ফিরে মঠ গড়া হয়নি।'

'সত্যিই দুঃখের কথা,' সহানুভূতি জানিয়ে আমরা বললাম, 'কিন্তু ওই চিংড়ি সত্যিই কে বলুন তো, ঘনাদা?'

বনোয়ারির হাতে খাবারের প্লেট সাজানো ট্রে তখন এসে পড়েছে। ঘনাদার কাছে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

ছবি : অনুপ রায়

শর্টকাট

লীলা মজুমদার



হরিচরণ সামন্ত ছিলেন আদর্শ ছাত্র, আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী না হোক আদর্শ গৃহস্বামী তো বটেই। সেকেলে বাড়ি এবং কড়া-কড়া বাপ-জ্যাঠা, কাজেই ওসব না হয়েও উপায় ছিল না। এখন তাঁরা যে যাঁর সগ্‌গে গেছেন। বাবা আছেন বটে, তবে তিনি হরিচরণকে অনেক সময় নিজের বাপ বলে ভুল করেন এবং যমের মতো ভয় করেন। হরিচরণের বয়স এখন ৫৩—তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গোড়াতেই তো বলেছি, বয়সটা খারাপ।

কর্মস্থলে দারুণ প্রশংসা ও প্রতিপত্তি। ভারতীয় জরিপ বিভাগে এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি দক্ষ কর্মচারী আর একজনও ছিল না। তিনি যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, হিংসে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ডিঙিয়ে দেখতে-দেখতে সাফল্যের সর্বোচ্চ সিংহাসনের দিকে ধাপে-ধাপে উত্তরণ করবেন তাতে আর বিচিত্র কী! সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, অসম্ভব ভাল জরিপের কাজ জানতেন। আর শুধু জানতেন না, হাতে-কলমে, পায়ে-থিয়োডলাইটে চাক্ষুষ দেখিয়েও দিতেন। ভারতে এমন কোনও দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় বন নদী সাগর ছিল না, পলক না ফেলতে যার উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, গভীরতা, নিজের চেয়ারে বসে বলে দিতে না পারতেন। দরকার হলে মনে-মনে 'সার্ভে' ইত্যাদি অবলম্বন করতেও পিছপাও হতেন না। বাস্তবিকই তাঁকে অঙ্কের আর অঙ্কনের জাদুকর বললেও অত্যুক্তি হত না। এমনকি যেসব দুস্তর জায়গায় সভ্য মানুষের পা পড়েনি, সাতদিন সময় পেলে সেখানকার যাবতীয় গুহ্য তথ্যও সংগ্রহ করে দিতে পারেন। সহকর্মীরা বলতেন, একুশটা উপজাতীয় ভাষা নাকি ওঁর নখাগ্রে।

হলে হবে কী, নিজের সংসারের অলিগলি কোনওদিনই চিনে উঠতে পারলেন না, মনের সুড়ঙ্গের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তার ফলে না মা, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, কাউকেই খুশি করতে পারতেন না। তারা সবাই সারাক্ষণ একক এবং সামগ্রিকভাবে অষ্টপ্রহর ওঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালাত।

শুনেছি অতিরিক্ত ঘর্ষণের ফলে লোহা, ইস্পাত, এরা পর্যন্ত বিদ্রোহ করে, মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম। ইচ্ছা করলেই হরিচরণ সামন্ত কলকাতার হেড

কোয়ার্টারে গদিমোড়া এবং হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে, অসমাপ্ত মানচিত্র আর ছুঁচলো ম্যাপিং-পেন নিয়ে কর্মজীবনের বাকি বছরগুলো নিয়ত বর্ধনশীল গৌরবে কাটিয়ে দিতে পারতেন। তা নয়। বাইরে থেকে দেখতে অমন নিরীহ, নির্বিবাদ, সর্বংসহা মানুষটি বাড়ির কাউকে বা সহকর্মীদের কাউকে কিছু না জানিয়ে, গোপনে বিস্তর কল-সুতো নেড়ে, ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে এখনও যেটুকু অল্প-জানা অরণ্যভূমি বাকি ছিল, যেচে সেইখানে সরেজমিনে তদন্ত করবার দায়িত্ব এবং ছোটখাটো একটি বাছাই করা অভিজ্ঞ কর্মীদল নিয়ে একদিন ভোরে রওনা হয়ে গেলেন। আপিস থেকে তাঁর হুকুমে আরেকটু বেলায় তাঁর বাড়িতে খবর দেওয়া হল। ততক্ষণে নির্দিষ্ট যাত্রার প্রথম ল্যাপটুকু শেষ করে একটা বিশেষ জায়গায় তাঁদের খুদে সরকারি প্লেনটি নেমেছে। বাড়িতে একটা ঠিকানা পর্যন্ত রেখে যাননি আর অফিসের কর্মচারীরা নিজেরাই কিছু জানতেন না তো বলবেন কী !

জরিপের সমস্ত সাম্প্রতিকতম নিয়মগুলো নখাগ্রে এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সঙ্গে থাকলেও জরিপের কাজ খুব সহজ নয়। এতটুকু ভুল থাকার বা ছিদ্র রাখার উপায় নেই। কী গাছ, ক'টা গাছ, কত নদী, কোন দিক, ক'টা বাঁক, কী-কী পাথর, কত দৈর্ঘ্য, কত গভীরতা, কী-কী জানোয়ার, কোন পাখি, তাদের আবাস কোথায়, খাদ্য কী, কত আদিবাসী উপজাতি, তাদের চেহারা, ধর্ম, ভাষা, জীবনযাত্রা কেমনধারা, মনোভাবই-বা কীরকম—এসব প্রশ্নের উত্তর তো আর অঙ্ক কষে সবসময় পাওয়া যায় না। চড়তে হয়, নামতে হয়, ওলন ঝোলাতে হয়, ফিতে টানতে হয়, ভাব করতে হয়, উপহার দিতে হয়, ফটো তুলতে হয়—এইরকম ব্যাপার। এসবে হরিচরণের কোনও আপত্তি নেই। বরং এ-ই শতগুণে ভাল। আঁকাজোকা ঠিক হলে উত্তরটা ঠিক হয়। সংসার করার মতো অখদ্যে ব্যাপার নয়। অঙ্ক কষা ঠিক, তবু উত্তর ভুল !

বলা বাহুল্য, এসব হল গিয়ে ভূমিকা। আপাতত হরিচরণ আর তাঁর ছোট দলটি ঘন অরণ্যের ভেতরে যতটা জিপ যায় ততদূর এগিয়ে তাঁবু করেছেন। সরকার আজকাল আর হাতির পারমিট দিতে চায় না। হাতির রসদ জোগানোও এক মহা-সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিছু খচ্চর আর টাট্টুঘোড়া সঙ্গে এসেছিল।

তাঁবু-জীবন হরিচরণ ভালবাসেন। চেতলার ওই অনড় সংসারের সঙ্গে এর কোনও সাদৃশ্য নেই। ঝাড়াঝাপটা ঘরকন্না। এক ঘণ্টার মধ্যে সব জিপে তুলে, উনুন বুজিয়ে, রওনা দেওয়া যায়। যেটুকু না হলে চলে না, তার চেয়ে একটা জিনিস বেশি নয়। বরং কম। যেসব দরকারি জিনিস বাদ পড়ে গেছে, সেগুলো ছাড়াও বেশ কাজ চলে যায়। দশদিন উদয়াস্ত কাজ, এগারো দিনের দিন ছুটি।

চারদিকে ঘন বন, মানুষের বাসের চিহ্নমাত্র নেই। জানোয়ারের তো নয়ই। সাধারণত থাকেও না এমনই অদৃশ্য পদসঞ্চারে তারা চলাফেরা করে। তবু চিহ্ন



একটা গাছের গায়ে তার দিয়ে বাঁধা একটা কাঠের তৈরি রঙ জ্বলা নোটিস ঝুলছে তাতে
ইংরেজিতে লেখা 'শর্টকাট'।

রেখে যায়। ওইরকম একটা ছুটির দিনে কর্মীরা বলল, 'স্যার, দু-মাস একাদিক্রমে শুকনো মাছ-মাংস খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। এখানে বুনো পেরু আছে, ঘোষাল তার চিহ্ন দেখেছে। মোটাসোটা গোটা তিনেক মেরে দিলে ছুটির দিনে ফিস্টি করি।'

হরিচরণের মনে নানা ঝামেলা। মাছ-মাংস খান, অথচ মিছিমিছি পশু-পাখি মারতে মন চায় না। অবিশ্যি লোকগুলো একদিন খেতে চেয়েছে, সেটাও কিছু ফেলনা কথা নয়। চন্দু ছিল বেশ হুঁশিয়ার, চটপটে। তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, হরিচরণের গুলিও কখনও বিফল হত না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনটে নির্দোষ বড় মাপের পাখি প্রাণ হারাল। অবিশ্যি খুব একটা নির্দোষও বলা চলে না। উনি কিছু করার আগেই, ওঁকে দেখবামাত্র, মহাবেগে নাকের ওপরকার লাল ঝুঁটি নেড়ে, কিতির-কিতির-বগ্-বগ্-গবর-গবর শব্দ করে তেড়ে এল। মনে হল, ধরতে পারলে খেয়েই ফেলবে। আত্মরক্ষার্থেও তো লোকে গুলি ছোঁড়ে। পাখি তিনটে এমনই অবাক হয়ে মরে গেল যে, হরিচরণের মনটন একদম খারাপ হয়ে গেল। বন্দুক আর পাখি দিয়ে চন্দুকে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে তিনি আরও গভীর বনে ঢুকে গেলেন। এদিককার বাঘ-ভাল্লুক যে স্থানীয় লোকেরাই কবে মেরে শেষ করেছে সে-কথা সবাই জানে। বুনো হাতিও ক্কচিৎ আসে। তাছাড়া হরিচরণের মতো নিরীহ মানুষকে ছারপোকারাও কামড়ায় না, তা বুনো হাতি!

বনের মধ্যে সারাদিনই আবছায়া, কখন যে সন্ধে হয়ে এল টের পেলেন না। হঠাৎ খানিকটা খোলা জায়গায় এসে খেয়াল হল আলো কমে গেছে, এখন ফেরা দরকার। কেমন যেন মনে হল, পায়ের নীচের মাটিটা একটু-একটু উঠছে। এখানে মাটি উঁচু হওয়ার একমাত্র কারণ একটা মন্দির-টন্দির কিছু ছিল একসময়ে। হয়তো কাঠের বৌদ্ধ মন্দির। তার কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না। খালি একটা কারিকুরি করা পাথরের খুঁটি একপাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সোজা করতেই দেখেন বুদ্ধ নয়, হয়তো বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধের মাথায় রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো থাকে, এঁর মাথায় মুকুট। খুঁটিটা নাড়াচাড়া করতেই একটা ছোট্ট চকচকে জিনিস পাশ থেকে গড়িয়ে গেল।

আশ্চর্য হয়ে সেটি তুলে দেখলেন কোনও মিশ্র ধাতুর তৈরি, টাকার মতো বড়, গোল একটা বোতামই হবে-বা। মধ্যিখানে সুতো লাগাবার দুটি ছ্যাঁদাও আছে। মাপের তুলনায় ওজনটাকে বড় বেশি মনে হল। এখানে তাহলে মানুষের যাওয়া-আসা আছে। নইলে এমন একটা চকচকে নতুন কৃত্রিম জিনিস আসে কী করে? বেশ জিনিসটি। সেটিকে পকেটে পুরে ওইখান থেকে ফিরলেন হরিচরণ।

মনের মধ্যে একটা খটকা লাগছিল। এখানকার মাটির তো এমন করে ক্রমাগত উঠে যাওয়ার কথা নয়। চিন্তা মনে আসতেই ভাবলেন, তবে কি বড় বেশি উত্তর-পূর্বে চলে এসেছি। হিমালয়ের পায়ের আঙুলগুলো যে অনেক দূর

অবধি ছড়িয়ে থাকে এটা তাঁর ভাল করেই জানা ছিল। কম্পাস দেখে হাঁটা অভ্যাস। কম্পাসটাই হয়তো ঠিকমতো কাজ করছে না। মাটির নীচে লোহা বা কোনও তেজস্ক্রিয় ধাতু থাকা বিচিত্র নয়। অসম্ভব বলে কিছু নেই এ দুনিয়ায়। জ্ঞানীরা জানেন, যা কিছু ঘটছে, সম্ভব বলেই ঘটছে। অসম্ভব হলে ঘটত না। আমাদের জ্ঞানের সীমানাটাই সম্ভাব্যের সীমানা নয়। ওই ভালমানুষ চেহারার চাঁদটাও সমুদ্রের জলকে টানে! তার চেয়েও আশ্চর্য কথা হল, খালি জলটাকে টানে না, পৃথিবীটাকেও টেনে কাছে আনে। উলটো দিকের জলটা পড়ে থাকে। তাকে পুরনো জায়গায় ছেড়ে পৃথিবী চাঁদের কাছে সরে আসে, তাই ওদিকের জলগুলোকে গভীর মনে হয়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে চলেছেন। হয়তো মানুষটাই কাঠখোট্টা। কল্পনাগুলোও অঙ্কের মতো। কিন্তু এটা সত্যি যে, অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলে কিছু নেই। স্বভাব হল প্রকৃতি। প্রকৃতির রাজ্যে অপ্রাকৃতিক বলে কিছু থাকতে পারে না। অতিপ্রাকৃত বলে কোনও কথাই হয় না। ওসব হল মুখ্যুদের প্রলাপ। যা কিছু ঘটে, প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে। আমাদের বিদ্যায় না কুলোলেই বলি অপ্রাকৃত। তবে হয়তো মহাকাশে যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাজ করে না, সেখানে অন্য নিয়ম খাটে! কিন্তু সে-ও প্রকৃতিরই নিয়ম। সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে প্রকৃতির আধিপত্য—নাঃ, পথ যে হারিয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ মাটিটা আগের চেয়েও অনেক বেশি খাড়া হয়ে ক্রমাগত উঠেই যাচ্ছে। বনও চারদিকে ঘন হয়ে আসছে।

কথাটা মনে হতেই হরিচরণ থমকে দাঁড়ালেন। তবে কি শেষটা তাঁকে সত্যি-সত্যি ‘বুনো’-তে ধরেছে নাকি? এ অঞ্চলের লোক বুনো-কে বড় ভয় করে। বুনো হল গিয়ে বনের অমঙ্গল-শক্তি, বোঙা যেমন মঙ্গল-শক্তি। ভেবেও হাসি পেল হরিচরণের। বুনোটুনো কিছু নয়, ব্যাপার হল দিকভ্রম। দিকভ্রম হলে মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারায়, অর্থাৎ মতিভ্রম হয়। তখন যা-তা চিন্তা হয়, এমনকি যা-তা দেখাও আশ্চর্য নয়। সব ভ্রান্তি, মনগড়া ছায়া মাত্র। তাহলেও এদেরকে কে বোঝাবে! এই বনের বড় দুর্নাম। স্থানীয় কর্মী পাওয়া যায়নি। জরিপ বিভাগের পাকাপোক্ত অভিজ্ঞ লোক আনতে হয়েছিল। বুনোর কথা তারা অনেকেই শুনেছিল। বনের অশরীরী অপদেবতা। নির্জন সংরক্ষিত বনে তার ভয়ঙ্কর প্রভাব। এসব কথা এ-দিকের শেষ পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার বলেছিলেন। মুখ্যুদের মনগড়া কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু তিনি নিজে ওই বনে পা দিতে রাজি নন—হাজার টাকা দিলেও না।

হরিচরণ জানতেন, বুনো একটা মানসিক রোগ ছাড়া কিছু নয়। বনের শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকের বনে ঘুরে-ঘুরে মাঝে-মাঝে মাথা ঘুরে যায়, তাই ভুলভাল দেখে। এর মধ্যে অপ্রাকৃত কিছু নেই। তাঁরও হয়তো তাই হয়েছে। কম্পাস ঠিক আছে, তিনি দেখছেন ভুল। সভ্য জগতে মানুষের মনে-মনে বনের ভয় সর্বদা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু বুনোয় ধরলেও নিজের ওপর প্রত্যয় হারাবার ছেলে

ছিলেন না হরিচরণ। জোর কদমে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

দেখেন একটা গাছের গায়ে তার দিয়ে বাঁধা একটা কাঠের তৈরি রঙ-জ্বলা নোটিস ঝুলছে। তাতে ইংরেজিতে লেখা 'শর্টকাট'। তার নীচে অবোধ্য অক্ষরে আরও কিছু লেখা ছিল। তার মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না। শর্টকাট ? শর্টকাট কেন ? কোথায় যাওয়ার শর্টকাট ? সে যাই হোক, সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। হরিচরণ শর্টকাট ধরলেন।

শর্টকাট ? কিন্তু শর্টকাট কি এমনধারা হয় ? পায়ের নীচে মাটি ঝিমঝিম করে ? কানও একটু বোঁ-বোঁ করে ? হরিচরণ পায়ের দিকে চেয়ে দেখলেন মাটি তো নয়, যেন একটা অ্যালুমিনিয়াম না কিসের পাতের ওপর দিয়ে হাঁটছেন। সেটা আবার বোবা মাদুরের মতো ভূমির ওপর চিতিয়ে পড়ে নেই, প্রতি পদক্ষেপেই যেন চিড়বিড়িয়ে উঠছে। সারা শরীরে শিহরন জাগছে। চীনে যুদ্ধের কোনও কলকব্জা কি না কে জানে। লোকে জাপানীদের প্রশংসা করে, আসলে চীনেরা তাদের বহু শতাব্দী আগে থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলকব্জার উদ্ভাবক। কে জানে এটা হয়তো ওদের দেশে যাওয়ারই শর্টকাট। একসময়ে এমনই স্বচ্ছন্দগতিতে হিমালয় ফুঁড়ে ওপারে বেরিয়ে আসবে। এক-এক পা ফেলছেন, মনে হচ্ছে যেন বিশ কদম এগিয়ে গিয়েছেন। দু-পাশের গাছপালাকে সাঁই-সাঁই করে পিছনে ফেলে যাচ্ছেন। যেন চলন্ত রেলগাড়ির কামরা থেকে দেখছেন।

বাস্তবিক, বুনোয় ধরেনি তো ? চীনেরাই যদি হবে তো সাইনবোর্ডে ইংরেজি লেখা কেন ? যাতে উনি পড়তে পারেন ? এটা ঝোলাবার সময় হরিচরণ সামন্তর এখানে আগমন তো সুদূর ভবিষ্যতের ক্রোড়ে ছিল। একেই কি বুনো বলে ? খপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন হরিচরণ। দু-পাশের গাছপালারাও দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু পা দুটো তখনও ঝিমঝিম করতে লাগল।

সামনে খাকি শার্ট-হাফপ্যান্ট পরা দাড়িওলা একটা লোক মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী যেন খুঁজছেন। ওঁর সাড়া পেয়েই মুখ তুলে চাইলেন। লোকটির চোখেমুখে এমন একটা জ্ঞানের ছাপ যে, হরিচরণ নিজের অজান্তেই বলে বসলেন, 'কী হারিয়েছে খুঁজে দেব, স্যার ?' অমনই লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। মুখটা কেমন চেনা-চেনা মনে হল। কাঠখোট্টা গলায় লোকটি বললেন, 'এ-পথ দিয়ে কোথায় যেতে চাও ?'

হঠাৎ মনে পড়ল, এ লোকটা কি অধ্যাপক ভি. জি. মাথাই, যিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন ? না কি এম স্ট্যান্ডিশ, উত্তর মেরুর পর যাঁর কোনও হদিস পাওয়া যায়নি ? কেমন যেন মনে হতে লাগল, দুনিয়ার যাবতীয় তুখোড় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এঁর চেহারার আশ্চর্য মিল! তবে কি বুনোই নাকি ? আবার চোখে কেমন ঝাপসা দেখতে লাগলেন, পা দুটো এমনই ঝিমঝিম করতে লাগল যে, ভাবলেন বুঝি পড়ে যাবেন। একটা অবলম্বনের জন্য শূন্যে খামচাতে লাগলেন।

লোকটি কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'ভয় নেই, পড়বে না। কালের পথ থেকে কে কবে পড়েছে বলো ? বসে পড়ো। পা দুটো দুর্বল লাগছে বুঝি ? তা সময়ের শর্টকাটে পা দেবে, দুর্বল লাগবে না !'

হরিচরণ আকাশ থেকে পড়লেন। 'সময়ের শর্টকাট ! সে আবার কী ?' কথাগুলো ইংরেজিতে বললেন, না বাংলায় বললেন, না কি আদৌ বললেন কি না, টের পেলেন না।

লোকটি পাশে এসে বসলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ভেবেছ কখনও, এক শতাব্দী হতে একশো বছর সময় লাগে ? ক'টা লোকই বা বাঁচে অত দিন ? দুই শতাব্দী তো কেউ না। অথচ অনন্তকালের হিসেবে দুই শতাব্দী হল চক্ষের পলকের চেয়ে বহুগুণ কম। আমার গবেষণার জন্য অত সময় কোথায় পাই বলো। তাই অনেক চেষ্টার ফলে সময়ের এই শর্টকাট করে ফেলেছি। বেগ কমিয়ে রাখলেও পাঁচ মিনিটে এক শতাব্দী পার হওয়া যায়। দু-দিকে, মাইন্ড ইউ, অতীতে এবং ভবিষ্যতে। আর যদি স্পিড বাড়ানো যায়—' এইখানে হরিচরণ সামন্ত হাত-পা এলিয়ে মুচ্ছো যাওয়ায় বাকিটুকু শোনা হয়নি।

যখন জ্ঞান হল, দেখলেন লোকটি ওঁকে একটা খুদে শিশি শোঁকাচ্ছেন আর মন থেকে সব ভয় ভাবনা অবিশ্বাস ধন্দ দূর হয়ে যাচ্ছে। সামান্য ভাঙা গলায় হরিচরণ বললেন, 'শর্টকাট কী করে হতে পারে ?'

লোকটি আকাশ থেকে পড়লেন, 'তা হবে না কেন ? সব সম্ভাব্য জিনিস যেভাবে হয়, নির্ভুল অঙ্ক কষে। একটা বিশ হাত লম্বা দড়ি সোজা করে পাতলে বিশ হাত দূরে তার মাথা থাকে। কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে দড়ির রেখা বেঁকিয়ে মাথাটা টেনে কাছে আনা যায় তাহলে কোলে তুলে নেওয়া যায় না কি ?'

বলেছি তো, অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন—অঙ্কে কখনও ১০০-তে ১০০-র কম পাননি—টপ করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, 'তবে কি আপনি বলতে চান, যেসব জিনিস ঘটে গেছে, সেসবও আবার ফিরে দেখা যায় ? তা কী করে সম্ভব ? যা চুকেবুকে গেছে—' লোকটি বিরক্ত হলেন : 'চুকেবুকে যায় না কিছুই, চারদিকে চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে। তুমি যে ঘরবাড়ি ছেড়ে এতদূর চলে এসেছ, কত শহর নদী মাঠ-পর্বত পার হয়ে এসেছ, সেসব এখন চোখের আড়াল হয়েছে বলে কি নেই হয়ে গেছে ? ওখানে ফিরে যাও, দেখবে সব যেমন ছিল তেমনই আছে। সময়ও তাই। লোকে কিছু জানে না বলে বোঝে না—'

হরিচরণের পায়ে জোর এল। উঠে পড়ে বললেন, 'কোনও বিশেষ মুহূর্তে আধ ঘণ্টার জন্যে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ? এই যেমন ধরুন পনেরো বছর আগের পয়লা বৈশাখের বেলা বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা ?'

'নিশ্চয় পারি। চাবিটা পেলেই পারি। এখন মুশকিল হয়েছে, চাবি আমি বোতাম করে পরে থাকি, পাছে ভুলে কোথাও ফেলে আসি—তা সেইটে সুতো ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গেছে। আমিও এই সময়ে আটকে আছি।'

হরিচরণ বললেন, 'সেটা পেলেই পারবেন ?'

'নিশ্চয় । কিন্তু পাচ্ছি কই ?'

হরিচরণ পকেট থেকে অদ্ভুত বোতামটি বার করে লোকটির হাতে দিলেন। উনি এমনই খুশি হলেন যে, চকাৎ করে তাঁর গালে একটা কিসি খেয়ে বললেন, 'রেডি ? এই দ্যাখো, পনেরো বছর আগের পয়লা বৈশাখের বেলা বারোটা—' বলার সঙ্গে-সঙ্গে হরিচরণ টের পেলেন তিনি তাঁর চেতলার বাড়ির পড়ার ঘরে ঢুকছেন। হাতে একটা উইল—দাদাশ্বশুরমশাইয়ের উইল। যা হারিয়ে ফেলা নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য। যার ফলে বাহান্ন বছর বয়সে এই বনে আগমন।

হরিচরণ উইল হাতে ইদিক-উদিক তাকিয়ে, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ডবলুর পেছনে গুঁজে রাখলেন। তার পরেই কেমন মাথা ঘুরতে লাগল। টের পেলেন ধপ করে পড়ে যাচ্ছেন। সব অন্ধকার।

তারপর মনে হল কারা তাঁর মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, চোখে টর্চ ফেলছে। ধড়মড় করে উঠে বসতেই চন্দু বলল, 'নিশ্চয়ই বুনোয় ধরেছিল, স্যার। এই জায়গাটা নাকি বড় খারাপ। পুরনো একটা মন্দির ছিল এখানে।'

ধড়মড় করে উঠে বসে হরিচরণ বললেন, 'বুনোটুনো নয় বাপু। সব অঙ্কের ব্যাপার। এখনও কি আজ, না কি কাল হয়ে গেছে ? পেরু তিনটেকে শেষ করেছ নাকি ?'

তারা বলল, 'না স্যার, আপনি না এলে খাই কী করে ? চলুন, ঠাণ্ডা করে কী লাভ ! হাঁটতে পারবেন তো ?'

হরিচরণ বললেন, 'বাঃ, এটুকু পারব না ? বলে কিনা আমি—' এই বলে পা চালালেন। একবার মনে হয়েছিল বটে—আমরা ভোজ খাব বলে তিনটে নির্দোষ পাখি শেষ হল। তারপরেই মনে হল, শেষটেষ কিচ্ছু নেই। এক্ষুণি বোতামটা ঘুরোলেই দেখা যাবে এখনও তারা কিতির-কিতির, গবর-গবর করে তেড়ে আসছে। উঃ ! বাপ ! ধরলে কাঁচা-কাঁচা খেয়ে ফেলত ! সে যাকগে, গিন্নির ঠাকুরদার উইলটা যে কোথায় রেখেছিলেন সেটা এতদিনে জানা গেল ! ব্যস, আর কথা নেই। এখানকার কাজও শেষ। এবার ঘরে ফিরে সবাইকে খুশি করে দেওয়া যাবে। কিন্তু বাহান্ন-তিপ্পান্ন কি আবার একটা বয়েস নাকি ! এবার থেকে বছরে-বছরে ঘন অরণ্যে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ !

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

টিটিঙ্গি-পাহাড়ের দেবতা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য



অনেকদিন পরে আবার টিটিঙ্গি-বউদির একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছেন :

সামনে লম্বা ছুটি, আশা করি এবার আর কোনও অজুহাত না দেখিয়ে সদলবলে চলে আসবে। যাচ্ছি-যাচ্ছি করে তো আজ বিশ বছর কাটিয়ে দিলে! ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা পর্যন্ত দেখলাম না! এবারে আর কোনও কৈফিয়ত নয়। তোমাদের জন্যে দুটো ঘর সাজিয়ে রেখেছি।

টিটিঙ্গি-বউদির আসল নাম কিন্তু টিটিঙ্গি নয়, কর্পূরমঞ্জরী না লোপামুদ্রা না প্রজ্ঞাপারমিতা—ওইরকম একটা গালভরা এবং দাঁতভাঙা নাম—কী সেটা, এতদিনের অব্যবহারে ভুলে গেছি। টিটিঙ্গিদার বউ—তাই টিটিঙ্গি-বউদি। টিটিঙ্গিদারও আসল নাম টিটিঙ্গি নয়—সোজাসুজি সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যে-নাম খুঁজলে বাংলাদেশের প্রত্যেক অলিগলিতে হয়তো কয়েক ডজন করে পাওয়া যাবে। তাহলে টিটিঙ্গি নাম এল কোত্থেকে?

তাহলে খুলেই বলি। পাঞ্জাব আর কাশ্মীরের মাঝামাঝি হিমালয়ের নিভৃত কোণে ছোট্ট একটি দেশীয় রাজ্য আছে। রাজ্যটি খুবই ছোট এবং ওখানকার বাসিন্দারাও যে জাতি হিসেবে খুব অগ্রসর, এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু ছোট হলেও অত্যন্ত সম্পদশালী রাজ্য এটি। বিশেষ করে নানারকম দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থ এবং কয়েকটি গন্ধকের প্রস্রবণের জন্য ওই অঞ্চলটির সুনাম আছে। রাজধানীর গা ঘেঁষে যে-পাহাড়টি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আসলে হিমালয়েরই একটি শাখা হলেও ওর স্থানীয় নাম হচ্ছে টিটিঙ্গি-পাহাড়, আর সেই থেকে শহরটিরও নাম হয়েছে টিটিঙ্গি। টিটিঙ্গিদা অর্থাৎ সুধীরদা প্রথম জীবনে এই রাজ্যে ডাক্তারি চাকরি নিয়ে আসেন এবং এইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই থেকে আত্মীয়স্বজনের কাছে তিনি হয়ে যান টিটিঙ্গি-সুধীর এবং

ক্রমে নামের সুধীর অংশটুকু টিকটিকির লেজের মতো খসে গিয়ে দাঁড়ায় শুধু 'টিটিঙ্গি'। বড়রা ওই নামেই ডাকতেন তাঁকে। আমরা ছোটরা, তার পাশে কেবল একটা 'দা' যোগ করে নিয়েছিলাম।

তা নামে কিছু এসে যায় না। টিটিঙ্গিদা আর টিটিঙ্গি-বউদি দুজনেই খুব দিলখোলা মানুষ। আত্মীয়স্বজন তো বটেই, ওখানকার সকলেই ওঁদের গুণে মুগ্ধ। একেই তো ডাক্তারদের খাতির সব জায়গাতেই একটু বেশি হয়, তার ওপর টিটিঙ্গিদা ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ।

প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। যে-আমলে কেবল ইংরেজি সাহিত্য, ফিলজফি—অর্থাৎ দর্শন—এবং অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে ভাল-ভাল ছাত্রেরা মশগুল থাকত, সে-যুগ কিছুটা কেটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় নতুন-নতুন বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন—নৃতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। যদিও এসব শাস্ত্রে যারা পণ্ডিত হবে তাদের ভবিষ্যৎ তখনও অনিশ্চিত, তবু কিছু-কিছু ছাত্র ঝোঁকের মাথায় ওইসব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। এবং, বলতে বাধা নেই, আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আমার বিষয় ছিল ভূতত্ত্ব—যাকে ইংরেজিতে বলে জিওলজি।

শুনতে আশ্চর্য লাগে। আমি, শ্রীকমনীয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, যে-আমি আজ ঈষৎ কালো আলপাকার কোট গায়ে দিয়ে জজকোর্টের বারান্দায় মক্কেলের খাতিরে সাক্ষীদের তালিম দিয়ে কাটাচ্ছি, সেই-আমিই একসময়ে দেশের খনিজ সম্পদ উদ্ধার করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভূতত্ত্বশাস্ত্রের ডিগ্রি দখল করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছিলাম, এবং চাকরির জন্য ছুটেছিলাম সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক নিভৃত অঞ্চলে, যেখানে আমার মুরুব্বি ছিলেন টিটিঙ্গিদা।

হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছিলাম বইকি! ওখানে গিয়েই। অবশ্য চাকরির উদ্দেশ্যেই যে গিয়েছিলাম তা নয়—বরঞ্চ তার চেয়ে বেড়ানোর লোভটাই ছিল হয়তো বেশি। ও-অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের কথা ভূতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে তো অজানা ছিল না!

একদিন রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে টিটিঙ্গি-বউদির হাতের মাংসের কালিয়াটা একটু চাখছি (খাওয়ার চেয়ে চাখতেই আরাম নয় কি? খেলেই তো সব ফুরিয়ে গেল!), হঠাৎ দাদার ডাকে বাইরের ঘরে এলাম। দেখি, দাদা একা নয়, পাগড়ি মাথায় আর-একটি যুবক দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে।

দাদা বললেন, 'এর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই আয়। আমার বন্ধু শ্রীবাস্তবের ছোট ভাই।'

যুবকটি ফিরে তাকাল। আরে, এ যে ইন্দরজিৎ, আমাদেরই সহপাঠী! আমারই সঙ্গে জিওলজি নিয়ে পাশ করেছে। বাংলাদেশে থেকে-থেকে বাংলাও বলে সুন্দর। এও তবে এ-রাজ্যেরই লোক!

ইন্দরজিতের সঙ্গে আমার আগে থেকেই বন্ধুত্ব আছে জেনে টিটিঙ্গিদা খুব



মূর্তি ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল—কাছে, আরও কাছে। এবারে টের পেলাম মূর্তি শুধু দ্যুতিমান নয়, তেজোময়ও বটে। তার ঠিকরে-আসা তাপ স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার সর্বদেহে।

খুশি। বললেন, ''তবে আর কী, তোকে নিয়ে এখানে ঘুরিয়ে বেড়ানোর কাজটাও তাহলে ইন্দরজিৎই নিতে পারবে। ও খুব ভাল ঘোড়সওয়ারও বটে! তোকে ঘোড়ায় চড়াটাও শিখিয়ে নেবে। ঘোড়া ছাড়া এই পাহাড়ী অঞ্চলে ঘোরাফেরা করা কঠিন।'

ইন্দরজিৎ আমাকে কয়েকদিন ধরে ওই অঞ্চলের সব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল। তারপর বলল, 'দেশে গিয়ে এখন কী করবি, কমিন্? স্টেট থেকে কয়েকজন জিওলজিস্ট নিচ্ছে, আমি তার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ডক্টর চ্যাটার্জি আছেন, তোরও ঢোকা কিছু কঠিন হবে না। একসঙ্গে চাকরি করা যাবে দুজনে। জায়গাটা ভালই লাগবে তোর। তুই থেকে যা, কমিন্!'

আমার কমনীয়কান্তি নামটা সংক্ষেপে কমিন্ করে নিয়েছিল ও।

চাকরিতেও বহাল হয়ে গেলাম। প্রথম চাকরি হিসেবে মাইনে এমন কিছু খারাপ নয়। তাছাড়া টিটিঙ্গিদার আশ্রয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। প্রথম-প্রথম ভালই লাগত। ওই সময়েই টিটিঙ্গি-পাহাড়ের চূড়ায় উঠবার সুযোগ জুটল একদিন। ইন্দরজিৎও সেদিন ছিল আমার সঙ্গী।

কী দেখেছিলাম পাহাড়ের চূড়ায়? না, কোনও দুর্মূল্য বা দুষ্প্রাপ্য পাথর নয়। ও তো এখানকার প্রায় সর্বত্রই আছে। পাহাড়ের ওপর আছে এক বিরাট ভাঙা পাথরের মন্দির। কালো ব্যাসল্ট পাথরে তৈরি। চূড়াটা ভেঙে পড়ে গেছে, ভেতরে কোনও বিগ্রহও নেই। কিন্তু মন্দিরের গড়ন এমনই যে, দেখলে খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। মন্দিরের পিছন দিকটায় পাহাড় একদম ঢালু হয়ে গভীর খাদে গিয়ে পড়েছে।

ইন্দরজিৎ বলল, 'এটা ছিল একসময়ে সূর্য-মন্দির—যাকে এখানে বলে "মার্তণ্ড মন্দিল" বা মার্তণ্ড মন্দির। কাশ্মীরে পহেলগামে যাওয়ার পথে বিখ্যাত মাটনের নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই? না না, নীচেকার সেই আধুনিক ছোট মন্দির নয়—যার পাশে মাছের কুণ্ড দেখিয়ে পাণ্ডারা যাত্রীদের কৌতূহল আর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমি বলছি পাহাড়ের চূড়ায় প্রাচীন যুগের ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরের কথা। সেও মার্তণ্ডদেবেরই মন্দির, আর ওর থেকেই জায়গাটার নাম হয়েছে মাটন। আমাদের টিটিঙ্গি-পাহাড়ের এই সূর্যমন্দিরও সম্ভবত ওই একই সময়কার তৈরি। জানি না, তখন এ-অঞ্চলটা ওই একই কাশ্মীররাজের অধীন ছিল কি না। হয়তো ছিল, কারণ এ-অঞ্চলে কাশ্মীরী প্রভুত্ব ঐতিহাসিক ঘটনা। কাশ্মীরী সংস্কৃতিও যে একসময় এসব দিকে বেশ কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল তারও প্রমাণ আছে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু মন্দিরে তো কোনও বিগ্রহ নেই, কেউ পুজোটুজোও দেয় না নিশ্চয়ই। তবু যেন মনে হচ্ছে ধূপধুনোর চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। শুকনো ফুলও রয়েছে কিছু-কিছু। এদিকে হোমের ছাই আর আধপোড়া কাঠও দেখছি!'

ইন্দরজিৎ বলল, 'ঠিক বলেছিস। বিগ্রহ না থাকলে পুজো করবে কাকে?

তবে এখানকার লোকদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, মন্দির পরিত্যক্ত এবং বিগ্রহ অন্তর্হিত হলেও এই দেবতা অত্যন্ত জাগ্রত। যুগে-যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটে এই মন্দিরে। কখন সময় হবে কেউ জানে না ; কিন্তু এটুকু জানে যে, দেবতা আবার ফিরে আসবেনই—যখনই প্রয়োজন মনে করবেন। তাঁর তেজোময় উপস্থিতিতে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তাঁর প্রখর তেজে অন্যায়কে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবেন। কখন তিনি আসবেন কেউ জানে না, তবু তাঁকে প্রসন্ন রাখবার জন্যে প্রতি সপ্তমী তিথিতে এখানে এসে তারা পুজো দেয়, হোম করে। উদ্দেশ্য—দেবতা যখন আসবেন তখন যেন তিনি বিরূপ না হন। সভ্য লোকেরই নানারকম সংস্কার আছে, আর এখানকার এরা যে এসব বিশ্বাস করবে তা তো স্বাভাবিকই।'

এরপরে আরও কয়েকবার আমি টিটিঙ্গি-পাহাড়ে গেছি। অলৌকিক কিছু দেখিনি। কিন্তু তবু যেন মনে হয়েছে, স্থানটি কেমন যেন রহস্যময়। এর পরিবেশ, এর অবস্থিতি দেবস্থানেরই যেন উপযোগী। আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি এখানকার লোকেদের মধ্যে : মার্তণ্ড-মন্দির সম্বন্ধে তাদের একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব।

কিন্তু বেশিদিন চাকরি করা আমার কপালে ছিল না। স্টেটের যিনি দেওয়ান তিনি লোকটি বড় সুবিধের ছিলেন না। অকারণে লোকের পিছনে লাগা ছিল তাঁর স্বভাব। অনেক আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন লোক তা বরদাস্ত করতে পারত না। প্রথম খিটিমিটি বাধল ইন্দর্‌জিতের সঙ্গে। ইন্দর্‌জিৎ কাজে ইস্তফা দিল। তারপর আমিও দিলাম। ভূতত্ত্ব শিকেয় তুলে রেখে দেশের ছেলে ফিরে এলাম দেশে। শুরু করলাম ওকালতি। তারপর ইন্দর্‌জিতের আর কোনও খবর পাইনি। তবে টিটিঙ্গিদার চিঠিতে জেনেছিলাম, সেও দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে চাকরি নিয়ে, আর ফেরেনি।

কুড়ি বছর পরে আবার ফিরে এলাম। টিটিঙ্গি-শহরে। দীর্ঘদিনে স্বভাবতই জায়গাটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নতুন-নতুন পথঘাট তৈরি হয়েছে। বাড়িঘরও তৈরি হয়েছে অনেক। রাস্তায় বিজলি-আলো, জলের কল, সিনেমা হাউস—মোটামুটি আধুনিক সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি—সবই দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ তো আর বদলাবার নয়। শহরের ধার ঘেঁষে টিটিঙ্গি-পাহাড় তার সুউচ্চ চূড়া নিয়ে তেমনই দাঁড়িয়ে আছে। আর পরিবর্তন হয়নি টিটিঙ্গি-বউদির আদরযত্নের।

খাবার টেবিলটাই ছিল ওখানকার পারিবারিক পার্লামেন্ট। যত রাজ্যের খবরাখবর ওখানেই হাজির হত, আলোচনা হত এবং তর্কাতর্কির পর সকলের মতামত ব্যক্ত হত ওখানেই।

ওইখানেই প্রথমে খবরটা পেলাম। সমস্ত শহরে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। টিটিঙ্গি-পাহাড়ের চূড়ায় মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে সত্যি-সত্যি দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। একজন নয়, দুজন নয়, বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছে সেই দেবমূর্তি। যারা অবিশ্বাসী, তারাও।

প্রতি সপ্তমী তিথিতে যারা মন্দিরে পুজো দিতে যেত, সর্বপ্রথমে তাদেরই সামনে দেখা দিয়েছেন দেবতা। না, চোখের ভুল নয়। ভাঙা মন্দিরে পাথরের আড়ালে ভাঙা বেদির পাশে তাঁর সেই তেজোময় মূর্তি—চোখের ভুল হতে পারে না কখনও। প্রধান পুরোহিত অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন। সমস্ত দেহ থেকে নীলাভ আলোর রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। শুধু আলো নয়, সেইসঙ্গে তাপও। পুরোহিত সেই প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে পারেননি, ছুটে বেরিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে মন্দিরের বাইরে।

দেবতা কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেননি। সেই ভাঙা বেদিকেই আসন করে সেখানেই অধিষ্ঠান করছেন তিনি।

শুধু প্রধান পুরোহিত নন, আরও অনেকে দেখেছে। সঙ্গে যারা ছিল, সকলেই। এবং তার পরেও, আরও অনেকে।

কিন্তু কেন হঠাৎ দেবতার এই আবির্ভাব? এখানকার প্রবাদ—মন্দির ভগ্ন এবং পরিত্যক্ত হলেও যুগে-যুগে এই জাগ্রত দেবতা আত্মপ্রকাশ করেন, যখনই প্রয়োজন মনে করেন তখনই। যখন রাজ্য পাপে পঙ্কিল হয়ে ওঠে, অন্যায় মাথাচাড়া দেয়, তখনই তিনি এসে তাঁর প্রখর তেজে সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যান। তাহলে কি সেই প্রলয়ের দিন সত্যি ঘনিয়ে এল?

দেখতে-দেখতে সমস্ত শহর ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার পর তো দূরের কথা, দিনের আলোতেও লোকে একা চলতে সাহস পায় না। লোকের দৈনন্দিন কাজকর্মও বন্ধ হওয়ার জোগাড়। রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে শুনতে পাই দু-পাশের বাড়ি থেকে মেয়েরা পাহাড়ী ভাষায় সূর্যদেবের বন্দনা-গান গেয়ে চলেছে অবিরত। যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত স্তোত্র আওড়ে চলেছেন। পরিচিত স্তোত্র, কার উদ্দেশে, বুঝতে কষ্ট হয় না। স্তোত্রের শেষে—

'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'

সূর্যপ্রণামের এ-মন্ত্র কার না জানা?

দেবতাকে তুষ্ট করার আয়োজনও চলল যথোচিতভাবে। এখন আর শুধু সপ্তমী তিথিতে নয়, নিত্য পূজার ব্যবস্থা, নিত্য হোমের আয়োজন। দেবতার উপযোগী ভোগ চলল ভারে-ভারে। 'হে মার্তণ্ডদেব, তুমি প্রসন্ন হও। কী অন্যায় করেছি আমরা, কোথায় আমাদের পাপ, বুঝিয়ে দাও। সৃষ্টি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস কোরো না দেব!'

এরই মধ্যে কে-একজন বিধান দিলেন, কোনও নিষ্পাপ শিশুকে যদি দেবতার সামনে হাজির করা যায়, তাহলে সেই শিশুর মুখ চেয়ে দেবতা

বিগলিত হবেন। শিশুর স্পর্শে হয়তো জাগ্রত হবে তাঁর করুণা। রাজ্য রক্ষা পাবে এ-যাত্রা। একজন ভক্ত তার দু-বছরের ছেলেকে বেদির সামনে দিয়ে এল, দেবতাকে স্পর্শ করাবার জন্য। স্পর্শমাত্র ছেলেটি কেঁদে উঠল যন্ত্রণায়। ছিটকে চলে এল বাইরে। দেখা গেল তার কাঁধে, বাহুতে বড়-বড় ফোসকা পড়ে গেছে—আগুনে হাত দিলে যেমনটা হয়। দেবতার তেজ নিষ্পাপ শিশুও সহ্য করতে পারেনি।

এই খবরে আতঙ্ক বেড়ে উঠল আরও ভীষণভাবে।

প্রথম যৌবনের বেপরোয়া ভাব অনেকটা কেটে গেছে। তবু এত কাছে এত বড় একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে মন চাইল না। ঠিক করলাম একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে হবে মন্দিরটা। কাউকে জানানো ঠিক হবে না। বিশেষ করে টিটিঙ্গি-বউদিকে তো নয়ই। তিনি যে রকম ভয় পেয়ে গেছেন তাতে বাড়িতে টেকাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

একটা ঘোড়া জোগাড় করা দরকার। অনেকদিন ঘোড়া চড়িনি বটে, কিন্তু পুরনো অভ্যাস, পারব নিশ্চয়ই চড়তে। অনেক উঁচুতে উঠতে হবে পাহাড়ের। ঘোড়া ছাড়া যাওয়া ঠিক হবে না।

ঘোড়া সংগ্রহ করতে একটু দেরি হল, বেরোতে-বেরোতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। তা যাক, ঘোড়ায় চড়ে গেলে সূর্যাস্তের আগেই ফিরে আসতে পারব। তাছাড়া সোজা পথে না গিয়ে শর্টকাট করলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে। ইন্দরজিতের কথা মনে পড়ল। শর্টকাটটা সে-ই দেখিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু স্মরণশক্তি যতই প্রখর হোক, কুড়ি বছরের স্মৃতির ওপর ভরসা করা যে কত বড় বোকামি তা যখন টের পেলাম তখন আর ফিরবার উপায় নেই। কোনওরকমে চূড়ায় উঠতেই হবে। একবার উঠতে পারলে তখন সোজা পথে নামা কষ্টকর হবে না।

পাহাড়ের ওপর তখন অন্ধকারের ছায়া নেমে আসছে—ধীরে, অতি ধীরে। সূর্য ডুবে গেছে। চীর গাছের সারির আড়ালে তার শেষ রশ্মিটিও বিলুপ্তপ্রায়। পকেটে টর্চটা ঠিক আছে তো? জ্বলছে তো? হ্যাঁ। এটা সঙ্গে এনে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছি।

হঠাৎ ঘোড়া বিগড়ে দাঁড়াল। নাক উঁচু করে কী শুঁকল, কান খাড়া করে কী শুনল, তারপর আর এক পা-ও এগুতে চায় না। ও কি ভয় পেয়ে গেল নাকি! লাফিয়ে নেমে পড়লাম। পিঠ চাপড়ে, ঘাড় চুলকে দিয়ে—কতরকমে আদর করে লাগাম ধরে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, এক পা-ও নড়বে না ও। অগত্যা লাগাম দিয়ে ঘোড়াটাকে একটা মোটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে হেঁটেই চললাম বাকি পথটা। মন্দির আর বেশি দূরে নয়, কিন্তু অন্ধকার পুরোপুরি নেমে এসেছে।

পাহাড় জনশূন্য। রাতের অন্ধকারে দেবতার সামনে আসতে সাহস হয়নি কারও। একেবারে নিঃসঙ্গ একা আমি। বুকটা দুরু-দুরু করে উঠল। এভাবে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না।

মন্ত্রচালিতের মতো যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

চোখের সামনে যে-দৃশ্য ভেসে উঠল তা বিশ্বাস করবার মতো নয়। কিন্তু তবু তা সত্যি। দেখলাম সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দ্যুতিমান মূর্তি। মূর্তির গা থেকে ঈষৎ নীলাভ আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকারে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মূর্তি যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে।

সংবিৎ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ চমক ভাঙল। দেখলাম, মূর্তি সজীব—ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

কী করব ? কোথায় যাব ? ছুটে পালাব কি ? কিন্তু পা দুটো কে যেন শিরীষের আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। এক পা নড়বার ক্ষমতা নেই যেন।

মূর্তি ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল—কাছে, আরও কাছে। এবারে টের পেলাম মূর্তি শুধু দ্যুতিমান নয়, তেজোময়ও বটে। তার ঠিকরে-আসা তাপ স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার সর্বদেহে। সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল আমার।

কিন্তু এ কী ! হঠাৎ সেই মূর্তি যেন আমারই মতো চমকে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কে ? কমিন্ ! তুই ! তুই এখানে ?'

কমিন্ ! এ-নামে তো আমায় একমাত্র ইন্দর্‌জিৎ ছাড়া কেউ ডাকত না ! এ কার কণ্ঠস্বর ! কুড়ি বছরের পুঞ্জীভূত স্মৃতির কুয়াশা হাতড়ে অভিভূতের মতো খুঁজতে লাগলাম যেন।

'চিনতে পারবি না আমায়। আমি ইন্দর্‌জিৎ। আপাতত টিটিঙ্গি-পাহাড়ের মন্দিরে বসে মার্তণ্ডদেবের ভূমিকায় অভিনয় করছি। কিন্তু বিশ্বাস করিস, এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না রে !'

আমার দিশেহারা ভাবটা সে হয়তো লক্ষ করল। বলল, 'ভয় পাস নে। ঠাট্টা নয়, আমি ইন্দর্‌জিৎই। চল, ওইখানটায় গিয়ে বসি। আলোর দরকার হবে না। বললাম তো, আমিই এখন দ্যুতিমান সূর্যদেব। নিজেই বিতরণ করছি আলো।'

ইন্দর্‌জিৎ অদূরে একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসল। আমাকে একটু দূরে বসবার ইঙ্গিত করল। বলল, 'আর কাছে আসিস না। মানুষের কাছে বসবার আমার আর অধিকার নেই। আমি ইন্দর্‌জিৎ বটে, কিন্তু এক অভিশপ্ত ইন্দর্‌জিৎ।'

ইন্দর্‌জিতের কথামতো আর-একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। ব্যাপারটা এমনই অভিনব যে, কারও মুখ দিয়ে

কতক্ষণ কোনও কথা বেরুল না। তারপর ইন্দর্‌জিৎই নিস্তব্ধতা ভাঙল।

'মনে পড়ে কমিন, কুড়ি বছর আগে এই পাহাড়ের ওপর আমিই তোকে প্রথম এই মন্দির দেখাতে এনেছিলাম ? ভাঙা, পরিত্যক্ত মন্দির, কিন্তু এর সম্বন্ধে যে কিংবদন্তি আছে তার কথাও তোকে বলেছিলাম। তখন কি স্বপ্নেও জানতাম এই মন্দিরই হবে আমার শেষ আশ্রয় ?'

তারপর ইন্দর্‌জিৎ একে-একে বলে চলল তার জীবনের সমস্ত ঘটনা। দেওয়ান-বাহাদুরের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার পর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কিছুদিন সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছিল। অথচ অধীত বিদ্যা কাজে লাগাবার জন্য চাকরি তাকে নিতেই হবে। কিন্তু এদেশে আর নয়। চাকরি যদি করতে হয় তবে কোনও সভ্য দেশে গিয়েই করবে। হঠাৎ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখল কাস্পিয়ান সি-র কাছাকাছি অঞ্চলে এক জায়গায় প্রচুর রেডিওঅ্যাকটিভ মিনারেল, অর্থাৎ কিনা তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেজন্য কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদের দরকার। মাইনে বেশ মোটা। কতকটা অর্থের লোভে এবং কতকটা নূতনত্বের মোহে তখনই সে দরখাস্ত করে দিল, এবং ডাকও এল শিগ্‌গিরই। দাদা নিষেধ করেছিলেন। গুরুজন বলতে একমাত্র তিনিই ছিলেন। কিন্তু ইন্দর্‌জিৎ নিরস্ত হয়নি—হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল দাদার কথা।

রেডিওঅ্যাকটিভ খনির কাজ ভালই লাগল তার। এখানে প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করত যে, সত্যিকারের বিজ্ঞানসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছে সে।

এখন, রেডিওঅ্যাকটিভ মিনারেল সম্বন্ধে যারা একটু-আধটু খোঁজখবর রাখে তারাই জানে—এইসব পদার্থ থেকে একাধিক ধরনের তেজোময় রশ্মি অবিরত বেরিয়ে আসে। ওরই নাম তেজস্ক্রিয় বা রেডিওঅ্যাকটিভিটি। এ-ও দেখা গেছে যে, এই স্বতঃপ্রবহমান রশ্মির ফলে পদার্থগুলি সর্বদাই জ্বলজ্বল করে—অন্ধকারে সেই জ্যোতি আরও বেশি করে চোখে পড়ে। অন্ধকারে জোনাকির জ্বলার সঙ্গে এর উপমা দেওয়া যেতে পারে। তবে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের জিনিস। জোনাকির আলো ঠাণ্ডা, কিন্তু এগুলো তা নয়—এবং এর প্রতিক্রিয়াও খুব কড়া। এই অবিরাম-বেরিয়ে-আসা রশ্মির ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি সর্বদাই উত্তপ্ত থাকে। শুধু তাই নয়, এই রশ্মি যে জিনিসের ওপর গিয়ে পড়ে তাকেও এরা তেজস্ক্রিয় করে তুলতে পারে। এবং করেও।

রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থের খনিতে যারা কাজ করে, এইসব কারণে তাদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয় এবং সময়বিশেষে নানারকম প্রতিষেধকও ব্যবহার করতে হয়। ইন্দর্‌জিৎও প্রথম-প্রথম খুব সাবধানে কাজ করত। কিন্তু বেশিদিন হয়ে গেলে—কোনও-কোনও ক্ষেত্রে যেমন হয়—ব্যাপারটাকে ক্রমে সে অত্যন্ত হালকাভাবে নিতে শুরু করল। অর্থাৎ, তখন আর সে যথারীতি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করত না। তার ওপরওয়ালা মাঝে-মাঝে

তাকে সাবধান করে দিলেও সে তা গায়ে মাখত না। কিন্তু এরই ফলে তার দেহের ওপরই যে ওইসব তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা তো সে ভাবেনি! এই তেজস্ক্রিয়া শরীরের পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর অতি সূক্ষ্মভাবে তার দেহে এই ক্রিয়া চলেছে। তারই ফলে, খুব সম্ভবত তার শরীর তার জন্য নিজেকে অনেকখানি তৈরি করে নিতে পেরেছে—অর্থাৎ, টিকা নেওয়ার সময় যেমন একটু-একটু করে সইয়ে-সইয়ে শরীরকে রোগ আক্রমণের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা এনে দেওয়া হয়—এক্ষেত্রেও অনেকটা সেই ব্যাপারই হয়েছে। একটু-একটু করে সইয়ে নেওয়ায় তার শরীরের ওপর ওই তেজস্ক্রিয়া মারাত্মকভাবে ফুটে উঠতে পারেনি—যা নাকি অন্যের বেলা অবশ্যই ফুটে উঠত।

কিন্তু যত সামান্যই হোক, যত ধীরগতিতেই হোক, তেজস্ক্রিয়া প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কারও নেই। ইন্দর্‌জিতেরও ছিল না। আপন গতিতে এগিয়ে চলেছিল ওই ক্রিয়া। ইন্দর্‌জিৎ যখন টের পেল, তখন তার শরীরের ওপর এই বিষক্রিয়া অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং শরীরের ভেতরকার তেজ থেকেই নতুন করে তেজোময় রশ্মি সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।

দেখতে-দেখতে তার শরীরে নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তার নিজেরই দেহ, আর সেই দেহ থেকেই তখন বিকীর্ণ হতে শুরু করল হালকা নীলাভ রশ্মি। অন্ধকারে দাঁড়ালে মনে হত সে বুঝি মানুষ নয়—নরদেহধারী কোনও দ্যুতিমান পদার্থ! শুধু তাই নয়, ওই বিকীর্ণ রশ্মির সঙ্গে দেখা দিল আর-একটা উপসর্গ—দেহের তাপবৃদ্ধি।

'তুই বিশ্বাস করবি না, কমিন্, সাধারণ মানুষের গায়ের উত্তাপ যেখানে সাতানব্বই কি সাড়ে সাতানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইট, সেখানে আমার দেহের উত্তাপ একশো চল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। একশো পাঁচ ডিগ্রির ওপর গায়ের উত্তাপ হলেই মানুষের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে, একশো সাত বা আট হলে কেউ আর বাঁচে না। অথচ এই প্রচণ্ড উত্তাপ শরীরে নিয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি। এর কারণ বোধহয়—এ তো শরীরের ভেতরকার খাদ্যদহনজনিত উত্তাপ নয়, এ-উত্তাপ হচ্ছে আমার শরীরে তেজস্ক্রিয়ার উত্তাপ।'

একটু চুপ করে ইন্দর্‌জিৎ আবার বলতে লাগল, 'তুই বুঝবি না, কমিন্, কী দুঃসহ এই জীবন! মানুষের সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না—আমার সান্নিধ্য মানুষের কাছে বিষের মতো পরিত্যাজ্য। সেদিন একটি ছোট ছেলেকে স্পর্শ করেছিলাম। আমার দেহের উত্তাপে তার শরীরে ফোসকা পড়ে গেল—আগুনের ছোঁয়া লাগলে যেমন পুড়ে গিয়ে লোকের গায়ে ফোসকা পড়ে। বুঝলাম, এইভাবেই তিল-তিল করে আমায় মরতে হবে। কোনও জীবন্ত প্রাণীর সাধ্য নেই এই তেজস্ক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, বা এর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারে। এর ক্রিয়া ক্রমেই বাড়ছে—ক্রমেই বাড়ছে—ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখন আর জামাকাপড় গায়ে রাখার উপায়

নেই। খনিতে কাজ করার সময় যে অগ্নিসহ চাদর তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম তাই কোনওরকমে পরে আছি।'

'তা চিকিৎসার কোনও চেষ্টা করিসনি?' একটা কিছু বলতে হয় তাই বললাম।

'চিকিৎসা: হো-হো করে হেসে উঠল ইন্দরজিৎ। বড় করুণ, বড় বীভৎস সে-হাসি: 'বললাম না, আমার সান্নিধ্য মানুষের কাছে বিষ! কে আমার চিকিৎসা করবে? আর এর কোনও চিকিৎসা তো আবিষ্কারও হয়নি! এ-রোগের বোধহয় আমিই একমাত্র রোগী। কে জানে, হয়তো প্রথম এবং শেষ রোগী!'

'তাই ভাবলাম, মরতে যখন হবেই, নিজের দেশে গিয়ে মরি। কীভাবে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এলাম, সে-কাহিনী বলবার সময় আজ নেই। এখানে পৌঁছে বুঝলাম, লোকালয়ে আমার স্থান হবে না—বিশ্বাসই করবে না কেউ আমাকে।'

একটু থামল ইন্দরজিৎ। বোধহয় একটানা কথা বলতে-বলতে হাঁপিয়ে উঠছিল সে। কিন্তু তারপরই আবার শুরু করল: 'কিন্তু কী অদম্য মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, কমিন্! হঠাৎ মনে পড়ল টিটিঙ্গি-পাহাড়ের এই সূর্যমন্দিরের কথা...এখানকার কিংবদন্তির কথা। তখনই মন স্থির করে ফেললাম। যে কদিন আছি, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দেবতা সেজেই বাঁচব। সূর্যদেবের মন্দিরে আমার এই দ্যুতিমান জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে আকস্মিক আবির্ভাব আমাদের দেশের মতো অনগ্রসর দেশের লোকদের ধোঁকা দেওয়ার পক্ষে খুব কঠিন হবে না হয়তো—এবং দেখছিস তো, তা হয়ওনি। ভক্তদের কল্যাণে আমার খাদ্যসংগ্রহের ভাবনাও ঘুচেছে। নিত্য দেবভোগ তৈরি হচ্ছে আমার জন্যে। কিন্তু আর না, আমার ভেতরটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে রে! কোনদিন দেখব দাউ-দাউ করে সমস্ত শরীরটাই জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।'

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেদিন টিটিঙ্গি-পাহাড়ে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ঘোড়াটা যে পাহাড়ের ওপরই বাঁধা রইল, তা আর মনেই রইল না।

বাড়ি এসেই জ্বর এল। বিছানা নিতে হল কয়েকদিনের জন্য। সপ্তাহখানেক ইন্দরজিতের কোনও খবর নেওয়া সম্ভব হল না। আর, ওই অবিশ্বাস্য কথা কাউকে বলাও যায় না। তাছাড়া ইন্দরজিতের বারণ তো ছিলই।

পথ্য করবার পরদিন। ভাবলাম, সন্ধের দিকে আজ একবার গিয়ে ইন্দরজিতের খবর নেব। কিন্তু তার আগে খবর আপনিই এল।

মার্তণ্ড মন্দিরের দেবতা চলে গেছেন। হয়তো শহরবাসীর পূজা-হোমে প্রসন্ন হয়ে তাদের শাস্তি না দিয়েই চলে গেছেন। তবে তিনি যে এসেছিলেন

এবং চলে গেলেন, তার একটা চিহ্ন রেখে গেছেন তিনি। মন্দিরের পিছনে পাহাড়ের যে-দিকটা ঢালু হয়ে গভীর খাদের মধ্যে নেমে গেছে, সে-দিকটা যেন কে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। একটা গাছপালারও চিহ্ন নেই সেখানে!

ছবি : অনুপ রায়

ডাঃ দানিয়েলির আবিষ্কার

সত্যজিৎ রায়



১৫ এপ্রিল, রোম

কাল এক আশ্চর্য ঘটনা। এখানে আমি এসেছি একটা বিজ্ঞানী-সম্মেলনে। কাল স্থানীয় বায়োকেমিস্ট ডাঃ দানিয়েলির বক্তৃতা ছিল। তিনি তাঁর ভাষণে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন। অবিশ্যি আমি যে অন্যদের মতো অতটা অবাক হয়েছি তা নয়, কিন্তু তার কারণটা পরে বলছি।

দানিয়েলির আশ্চর্য ভাষণের কথা বলার আগে একটা কথা বলা দরকার। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের উপন্যাস 'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড'-এর কথা অনেকেই জানে। যারা জানে না তাদের জন্য বলছি যে, ডাঃ জেকিল বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা ভাল দিক আর একটা মন্দ দিক থাকে। এই মন্দ প্রবৃত্তিগুলো মানুষ দমন করে রাখে, কারণ তাকে সমাজে বাস করতে হলে সমাজের কতকগুলো নিয়ম মানতে হয়। কিন্তু ডাঃ জেকিল দাবি করেছিলেন তিনি এমন ওষুধ বার করতে পারেন, যে-ওষুধ কেউ খেলে তার ভেতরে হীন প্রবৃত্তিগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে একটা নৃশংস জীবে পরিণত করবে। ডাঃ জেকিলের এ-কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, তাই তিনি তাঁর গবেষণাগারে ঠিক এইরকমই একটা ওষুধ তৈরি করে নিজের ওপর প্রয়োগ করে এক ভয়ঙ্কর মানুষ মিঃ হাইডে পরিণত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি খুনও করেছিলেন, যদিও ডাঃ জেকিল এমনিতে ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি।

স্টিভেনসনের এই উপন্যাস যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এমন ওষুধ বাস্তবে আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। দানিয়েলি দাবি করছেন তিনি করতে চলেছেন, এবং দানিয়েলির আগেই গিরিডিতে আমার ল্যাবরেটরিতে আমি করেছি। আমার ওষুধ আমি নিজে খাইনি, কিন্তু আমার পোষা বেড়াল নিউটনকে একফোঁটা খাইয়েছিলাম। খাওয়ানোর তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করে আমার ডান হাতে আঁচড় দিয়ে আমাকে জখম করে। আমি আমার ওষুধের নাম দিয়েছিলাম 'এক্স'। একই

সঙ্গে 'অ্যান্টি-এক্স' নামে আরেকটা ওষুধ বার করি যেটা 'এক্স'-এর অ্যান্টিডোট ; অর্থাৎ, যেটা খেলে মানুষ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। নিউটনকে 'অ্যান্টি-এক্স' খাইয়ে শান্ত করতে হয়েছিল।

দানিয়েলির বক্তৃতার সময় তাঁর অবস্থা জেকিলের মতোই হয়েছিল। অন্তত তিনজন বিজ্ঞানী—ইংল্যান্ডের ডাঃ স্টেবিং, জার্মানির প্রোফেসর ক্রুগার ও স্পেনের ডাঃ গোমেজ—দানিয়েলির কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে মিটিং-এ একটা তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দানিয়েলির পক্ষে তাঁর মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতে দানিয়েলির সঙ্গে আমার এখানে এসেই আলাপ হয়েছে। অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র স্বভাবের লোক বলে মনে হয়েছিল। অনেকদিন পরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে আজকের মতো একটা গোলমাল হতে দেখলাম। আমি অবিশ্যি আমার নিজের ওষুধের কথা দানিয়েলি বা অন্য কাউকে বলিনি। দানিয়েলি বললেন, তাঁর ওষুধ দু-একদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। তারপর সেটা তিনি নিজের ওপর পরীক্ষা করে দেখবেন, যেমন স্টিভেনসনের গল্পে ডাঃ জেকিল করেছিলেন। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না, কারণ এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয়, তাহলে ওষুধ-খাওয়া দানিয়েলি কী রকম ব্যবহার করবেন তা বলা কঠিন। নিউটনের যা হিংস্র ভাব দেখেছি তাতে আমার রীতিমত ভয় ঢুকে গেছে।

আজ আর আধ ঘন্টার মধ্যেই ডেলিগেটদের লাঞ্চ আছে। আমরা আছি হোটেল সুপার্বাতে। এইখানেই একতলায় ডাইনিং রুমে লাঞ্চ। সম্মেলন চলবে আর দু দিন। তারপর আরও দিন দু-তিন রোমে থেকে দেশে ফিরব।

১৭ এপ্রিল

আজ সম্মেলনের পর দানিয়েলির সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, তাঁর বক্তৃতায় তিনি যা বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করি। আমারও একই মত। তাতে ভদ্রলোক যারপরনাই খুশি হলেন।

আমি বললাম, 'তুমি যে ওষুধ বানাচ্ছ, সেইসঙ্গে তার প্রভাব দূর করার জন্যেও ওষুধ তৈরি করছ আশা করি।'

'তা তো বটেই,' বললেন দানিয়েলি। 'এ-ব্যাপারে আমি স্টিভেনসনের উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। এতদিন কেন যে কেউ এ রকম একটা ওষুধ তৈরি করতে চেষ্টা করেনি, তা জানি না।'

আমি বললাম, 'তার কারণ স্টিভেনসনের গল্পেতেই পাওয়া যাবে। মিঃ হাইডের মতো এমন মানুষ যদি সেই ওষুধ তৈরি করতে পারে, তাহলে সে ওষুধ খাওয়ার কী বিপদ, সে তো বুঝতেই পারছ।'

'কিন্তু তা বলে তো বিজ্ঞানকে থেমে থাকতে দেওয়া যায় না,' বললেন দানিয়েলি। 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই হবে। এবং আমার পরীক্ষা যদি সফল



দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। চাকর এসে দরজা খুলে দিতে দানিয়েলি হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকলেন।

হয় তাহলে তার পরিণাম যাই হোক না কেন, এটা মানতেই হবে যে, সেটা হবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটা নিদর্শন।'

'তবে তুমি যদি একটা হাইডে পরিণত হও, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমার সেটা মোটেই ভাল লাগবে না।'

'দেখা যাক কী হয়।'

'তুমি কী-কী উপাদান দিয়ে ওষুধটা তৈরি করেছ, সেটা জানতে পারি কী ?'

ভদ্রলোক যা উত্তর দিলেন তা শুনে আমি একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

আমিও ঠিক একই উপাদান দিয়ে আমার ওষুধটা তৈরি করেছি।

সেটা অবিশ্যি আর দানিয়েলিকে বললাম না, এবং দানিয়েলিও তাঁর উপাদানের পরিমাণ আমাকে বললেন না।

১৮ এপ্রিল

আজ কাগজে সাঙ্ঘাতিক খবর।

ডাঃ স্টেবিংকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের হোটেলটা টাইবার নদীর ওপর। স্টেবিং নাকি রোজ ডিনারের আগে টাইবারের ধারে হাঁটতে যেতেন। আজও গিয়েছিলেন, কিন্তু আর ফেরেননি। পুলিশ সন্দেহ করছে তিনি কোনও গুণ্ডার দ্বারা নিহত হয়েছেন, এবং গুণ্ডারা তাঁর মৃতদেহ টাইবারের জলে ফেলে দিয়েছে।

আমার কিন্তু ধারণা অন্যরকম। স্টেবিং দানিয়েলির বক্তৃতার পর তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং দানিয়েলিকে অবিজ্ঞানী আখ্যা দেন। দানিয়েলিও বলেছিলেন, তাঁর ওষুধ দু দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।

আমি টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে দেখলাম যে, দানিয়েলির বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে ২৭ নং ভিয়া সাক্রামেন্টো। আমি আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তাঁর বাড়িতে চলে গেলাম।

বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হল না, কিন্তু গিয়ে শুনি দানিয়েলি বাড়ি নেই। দানিয়েলির চাকর দরজা খুলেছিল ; আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'সিনিয়র আলবের্তির সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'তিনি কে ?'

'তিনি প্রফেসর দানিয়েলির সহকর্মী।'

আমি বললাম, 'বেশ, তাঁকেই ডাকো।'

চাকর চলে গেল। দু মিনিটের মধ্যেই একটি বছর ত্রিশের যুবক বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। কালো চুল, কালো চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

'তুমি কি দানিয়েলির সহকর্মী ?'

'সহকর্মীর চেয়ে সহকারী বললেই ঠিক হবে। আমি মাত্র তিন বছর

দানিয়েলির সঙ্গে আছি। আপনি কি ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রফেসর শঙ্কু ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

যুবকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'আমি আপনার বিষয়ে অনেক শুনেছি। আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক পড়েছি। আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি।'

আমি বললাম, 'সে-কথা শুনে আমারও খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আমি ডাঃ দানিয়েলির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। তিনি কখন আসবেন ?'

'যে-কোনও মুহূর্তে,' বলল আলবের্তি। 'তিনি বাজারে গেছেন কিছু কেনাকাটা করতে। আপনি একটু বসে যান।'

আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। সময় কাটানোর জন্য আলবের্তিকে প্রশ্ন করলাম, 'প্রফেসরের ওষুধ কি তৈরি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, সে তো পরশুই হয়ে গেছে।' বলল আলবের্তি, 'তারপর থেকেই প্রফেসর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। সামান্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি তাঁর মধ্যে। সেটা যে কী, সেটা স্পষ্টভাবে বলতে পারব না।'

'তিনি কি ওষুধটা খেয়েছেন ?'

'তা তো বলতে পারছি না। ওষুধটা উনি সম্পূর্ণ নিজে তৈরি করেছেন। আমি ওঁকে কোনওরকম ভাবে সাহায্য করিনি। ওষুধের ফরমুলাও আমি জানি না। তবে ওষুধটা যে হয়ে গেছে সেটা উনি আমাকে বলেছেন। অবিশ্যি না বললেও আমি বুঝতাম, কারণ গত এক মাস উনি সারাদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন দরজা বন্ধ করে। দু দিন থেকে ওঁকে আর কাজ করতে দেখছি না।'

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। চাকর এসে দরজা খুলে দিতে দানিয়েলি হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকলেন।

'গুড মর্নিং প্রফেসর শঙ্কু। দিস ইজ এ ভেরি প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ !'

আমিও ভদ্রলোককে প্রত্যভিবাদন জানালাম। বললাম, 'খবর না দিয়ে এসে পড়েছি বলে আশা করি কিছু মনে করছ না।'

'মোটেই না, মোটেই না। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তারপর কী খবর বলো।'

'খবর তো তোমার—তোমার ওষুধের খবর। ওটা তৈরি হল ?'

'হয়েছে বইকি ! পরশুই রাত্রে তৈরি হয়েছে।'

'পরীক্ষা করে দেখেছ ?'

'আমি চায়ের চামচের এক চামচ খেয়ে দেখেছি।'

'তারপর ?'

'তারপর কী হল জানি না।'

'তার মানে ?'

'মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। সকালে উঠে দেখি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। শরীরে কোনও গ্লানি নেই। রাত্রে কী ঘটেছে কিছু জানি না।'

'আজ কাগজে স্টেবিং-এর মৃত্যুসংবাদ পড়েছ ?'

'পড়েছি বইকি ! আর পড়ে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। যদিও সে আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী ছিল।'

'স্টেবিং-এর মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছ ?'

'এ তো বোঝাই যাচ্ছে স্থানীয় গুণ্ডাদের কীর্তি। তাকে মেরে শুনলাম টাইবারের জলে লাশ ফেলে দিয়েছে। দু-একদিনের মধ্যেই অবিশ্যি সে লাশ আবার ভেসে উঠবে।'

আমি আর দানিয়েলির সময় নষ্ট করলাম না। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। দানিয়েলির ওষুধ খাওয়ার কথাটা এখনও মাথায় ঘুরছে। তিনি যে কিছুই টের পেলেন না, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। আমার ওষুধেও কি এই একই প্রতিক্রিয়া হবে ? নিউটন যে আমাকে আক্রমণ করে, সেটা কি সে অজান্তে করে ?

১৯ এপ্রিল

কাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় জার্মানির প্রফেসর ক্রুগার আর স্পেনের ডাঃ গোমেজ খুন হয়েছেন তাঁদের ঘরে। সেইসঙ্গে টাইবার নদীতে স্টেবিং-এর লাশও পাওয়া গেছে। লাশের গলায় আঙুলের গভীর দাগ। অর্থাৎ তাঁকে গলা টিপে মারা হয়েছিল।

এবার আর আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তিনটে খুনই দানিয়েলির কীর্তি। পুলিশ অবশ্য তদন্ত করছে। ক্রুগার বা গোমেজের কোনও টাকা-পয়সাও চুরি যায়নি। কাজেই এটা চোর-ডাকাতের কীর্তি নয়।

পুলিশ আমাদের হোটেলের রিসেপশনিস্টকে জেরা করে জানতে পারে যে, কাল রাত্রে এগারোটার সময় একটি কুৎসিত লোক নাকি হোটেলে এসে ক্রুগার আর গোমেজের ঘরের নম্বর জানতে চায়। তারপর সে দুজনকেই টেলিফোন করে।

'কী কথা বলেছিল সেটা শুনেছিলে ?' পুলিশ জিজ্ঞেস করে।

'আজ্ঞে না, তা শুনিনি।'

ক্রুগার আর গোমেজ দুজনকেই স্টেবিং-এর মতোই গলা টিপে মারা হয়েছে। আততায়ী যে অত্যন্ত শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ দানিয়েলিকে দেখলে তাঁর মধ্যে শারীরিক শক্তির কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় না। ওঁর বয়সও হয়েছে অন্তত ষাট।

আমি এবার দানিয়েলির বাড়িতে একটা ফোন করলাম। তিনি নিজেই ফোন ধরলেন। শান্ত কণ্ঠস্বর। কোনও উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। আমি ফোন করছি শুনে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে অভিবাদন জানালেন। আমি বললাম, 'আমি একবার তোমার বাড়িতে আসতে চাই।'

'এক্ষুণি চলে এসো', বললেন দানিয়েলি, 'আমি সারা সকাল বাড়িতে আছি।'

দশ মিনিটে দানিয়েলির বাড়িতে হাজির হলাম। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমায় সোফায় বসতে বলে বললেন, 'বলো কী খবর!'

আমি বসে বললাম, 'তুমি কি কাল রাত্রে আবার ওষুধটা খেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, এবং সেই একই প্রতিক্রিয়া,' বললেন দানিয়েলি, 'ওষুধ খাওয়ার পরে কী করেছি, কোথায় ছিলাম, কখন ফিরলাম—কিছুই মনে নেই।'

'এক চামচই খেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বোধহয় জানো যে কাল ক্রুগার আর গোমেজ খুন হয়েছে, এবং স্টেবিং-এর লাশ পাওয়া গেছে।'

'জানি।'

'এরা তিনজনেই কিন্তু তোমার বক্তৃতায় ঘোর আপত্তি তুলেছিল।'

'তাও জানি।'

'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কী?'

'ওষুধটা আর খেয়ো না। তুমি যখন নিজে কিছুই অনুভব করছ না, তখন খেয়ে লাভ কী? বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তো তুমি কোনও জ্ঞান আহরণ করছ না। সত্যি বলতে কী, তুমি তো কিছুই জানতে পারছ না।'

'তা পারছি না, কিন্তু একটা যে কিছু হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিছু মনে কোরো না, কিন্তু আমার ধারণা, এই তিনটে খুনের জন্যেই তুমি দায়ী। অর্থাৎ, তোমার ওষুধই দায়ী।'

'ননসেন্স।'

'ননসেন্স নয়। কেন, সেটা আমি বলছি। আমি নিজে একই ওষুধ আবিষ্কার করেছি ভারতবর্ষে, আমার ল্যাবরেটরিতে। আমি সেটা আমার পোষা বেড়ালের ওপর পরীক্ষা করেছিলাম। ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ তার মুখে ঢেলে দিয়েছিলাম। তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে আক্রমণ করে জখম করে। তার আধ ঘন্টার মধ্যেই অবিশ্যি সে আমারই তৈরি একটা অ্যান্টিডোট খেয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।'

দানিয়েলি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি লক্ষ করলাম, তাঁর জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছে। তারপর চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'তুমি আমার আগে এই ওষুধ আবিষ্কার করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আই ডোন্ট বিলিভ ইট।'

দানিয়েলির কণ্ঠস্বরে এই প্রথম একটা তিক্ততার আভাস পেলাম। তিনি

আবার বললেন, 'আই ডোন্ট বিলিভ ইট।'

আমি বললাম, 'তুমি বিশ্বাস না করতে পারো। কথাটা কিন্তু সত্যি। তুমি তোমার ওষুধের উপাদানের কথা আমাকে বলেছ, কিন্তু পরিমাণ বলোনি। আমিও এই একই উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করেছি, এবং আমার পরিমাণ মুখস্থ আছে। সেটা আমি তোমাকে বলছি। দ্যাখো তোমার সঙ্গে মেলে কিনা।'

আমার পুরো ফরমুলাটা কণ্ঠস্থ ছিল। আমি সেটা দানিয়েলিকে বললাম। তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'আই কান্ট বিলিভ ইট ; পরিমাণ দুজনের হুবহু এক।'

'তাহলেই বুঝতে পারছ।'

'তুমি নিজে খাওনি তোমার ওষুধ ?'

'না, এবং কোনওদিনও খাব না।'

'কিন্তু আমাকে খেতেই হবে। যতদিন না জানতে পারছি ওষুধ খেয়ে আমার কী হচ্ছে, আমি কী করছি, ততদিন আমাকে এ-ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। দরকার হলে পরিমাণ বাড়াতে হবে ; এক চামচের জায়গায় দু চামচ।'

'তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছ না, ওষুধ খেয়ে তুমি কী করো ?'

'প্রথম দিন কিছুই বুঝিনি। কালকের সামান্য স্মৃতি আছে। আমি জানি, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিলাম।'

'তোমার কি ড্রাইভার আছে ?'

'না। আমি নিজেই গাড়ি চালাই।'

'তারপর কী হয়, কিছুই মনে নেই ?'

'না। কিন্তু এইভাবেই আমি আস্তে-আস্তে জানতে পারব আমি কী করছি, আমার কী পরিবর্তন হচ্ছে।'

'এর ফল ভাল হবে না, দানিয়েলি।'

'তা না হলেও, বিজ্ঞানের খাতিরে এটা আমাকে করতেই হবে। তুমি আর আমি এক লোক নই। আমার কৌতূহল তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

আমি বুঝলাম দানিয়েলিকে অনুরোধ করে কোনও ফল হবে না। ওঁর মাথায় ভূত চেপেছে।

আমি বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমায় একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে। এ দু দিনে দানিয়েলির তিনটি শত্রু খুন হয়েছে। আরও কত শত্রু আছে তাঁর কে জানে ?

২০ এপ্রিল

আজ চতুর্থ খুনের খবর কাগজে বেরিয়েছে। রোমের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নিনিকে কেউ কাল রাত্রে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গলা টিপে মেরে এসেছে। পুলিশ গলায়.আঙুলের ছাপ পেয়েছে, সেই অনুসারে তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

আমি তো অবাক ! এ আবার কে খুন হল ? কেন ?

আমি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দানিয়েলির বাড়িতে আলবের্তিকে ফোন করলাম। আলবের্তি ফোন ধরার পর বললাম, 'তুমি একবার আমার হোটেলে আসতে পারবে ? আমার ঘরের নম্বর হচ্ছে ৭১৩। বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে আলবের্তি আমার ঘরে চলে এল।

আমি তাকে প্রথমেই বললাম, 'আমার একটা বিশ্রী সন্দেহ হচ্ছে যে, এ ক'দিন যে-খুনগুলো হয়েছে সেগুলো দানিয়েলির কীর্তি। সে ওষুধ খেয়ে এই কাণ্ডটি করছে। তোমার কী মনে হয় ?'

আলবের্তি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমারও কাল থেকে সেই ধারণা হয়েছে, কারণ যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও সময় দানিয়েলির বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন, তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি বা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছেন।'

'কিন্তু কাল রাত্রে যিনি খুন হলেন—এই বার্নিনি ভদ্রলোকটি কে ?'

'ইনি এখানকার একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। দানিয়েলির একটা প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি তিন বছর আগে একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেটা একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল।'

'সেই রাগ দানিয়েলি এখনও ভোলেননি ?'

'তাই তো দেখছি ! এবং দানিয়েলিকে কোনও না কোনও সময় আক্রমণ করেছেন, এ রকম বিজ্ঞানী রোমে অনেক আছেন। প্রফেসর তুচ্চি, ডাঃ আমাটি, ডাঃ মাৎসিনি—আর কত নাম করব ? আমার এখন ধারণা হয়েছে এঁদের প্রত্যেকের ওপরই দানিয়েলি রাগ পুষে রেখেছেন। এতদিন কিছু করেননি, কারণ দানিয়েলি এমনিতে খুবই ভদ্র এবং অমায়িক ব্যক্তি। কিন্তু এই ওষুধই হয়েছে ওঁর কাল। আর আরেকটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই।'

'কী ?'

'আপনি বোধহয় প্রফেসরের আগে এই ওষুধ তৈরি করেছেন, তাই না ?'

'সেটা তুমি কী করে জানলে !'

'আমি কাল প্রফেসরের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম। উনিই বললেন, এবং যেভাবে বললেন তাতে মনে হয় না যে, উনি আপনার ওপর খুব প্রসন্ন।'

'তাই কি ?'

'তাই—এবং আমি বলি আপনি সাবধানতা অবলম্বন করুন। রাত্রে আপনার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেবেন না।'

'কিন্তু শুধু তা হলেই তো হবে না। এখানে হত্যাকাণ্ড যে চলতেই থাকবে। এরপর নিরীহ লোককেও দানিয়েলি খুন করতে আরম্ভ করবেন সামান্য ছুতো পেলেই।'

'তাহলে কী করা যায় ?'

'সেটাই ভাবছি।'

আমি কিছুক্ষণ ভেবে একটা ফন্দি বার করলাম। বললাম, 'তুমি প্রফেসরের ল্যাবরেটরিতে যাও?'

'হ্যাঁ, যাব না কেন? দিনের বেলাতে যাই।'

'ওই ওষুধ কি তোমার নাগালের মধ্যে থাকে?'

'না। ওটা উনি আলমারিতে বন্ধ করে রাখেন। চাবি ওঁর কাছে থাকে।'

আমি আরেকটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'তুমি কি ওঁর বাড়িতেই থাকো?'

'না। আমি সকাল দশটার সময় আসি, আবার সন্ধ্যা ছ'টায় বাড়ি চলে যাই।'

'ওঁর ল্যাবরেটরির চাবি তোমার কাছে আছে?'

'তা আছে।'

'তাহলে রাত্রে আমাদের দুজনকে ওঁর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে হবে। উনি যাতে ওষুধ আর না খান তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কাল আমি একটু মিলান যাচ্ছি। পরশু সন্ধ্যাবেলা আপনার কাছে চলে আসব।'

'বেশ, তাই কথা রইল।'

আলবের্তি চলে গেল। ঘটনাটা আজকে ঘটলেই ভাল হত, কিন্তু উপায় নেই। আলবের্তিকে প্রয়োজন।

২১ *এপ্রিল*

আজ দুটো খুনের খবর বেরিয়েছে কাগজে। তার মধ্যে একজনের নাম আলবের্তি, কালকে করেছিল। আরেকজন প্রফেসর বেলিনি—জীববিদ্যাবিশারদ। দুজনকেই রাত্তিরে গলা টিপে মারা হয়েছে। আঙুলের ছাপ আগের খুনের সঙ্গে মিলে গেছে। পুলিশ এটা বুঝেছে যে, সব খুন একই লোক করেছে। বেলিনির চাকর পুলিশকে বলেছে যে, রাত এগারোটার সময় সে দরজার ঘন্টা শুনে দরজা খুলে দেখে যে, একজন বীভৎস দেখতে লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে সে বলে তার নাম আরতুরো ক্রোচে। ক্রোচে বেলিনির সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেলিনি তখনও ঘুমোতে যাননি। ক্রোচের নাম শুনে তিনি চাকরকে বলেন লোকটিকে ভেতরে আসতে বলতে। পনেরো মিনিট পরে এই ক্রোচে লোকটি চলে যায়। বেলিনির চাকরই তার হ্যাট আর কোট তাকে এনে দেয়। তারপর মনিব ঘুমোতে যাচ্ছেন না দেখে চাকরটি তাঁর ঘরে উঁকি মেরে দেখে বেলিনি মেঝেতে পড়ে আছেন—মৃত অবস্থায়। সে তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ বেলিনির গলাতে আততায়ীর আঙুলের ছাপ পায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত

আততায়ীর সন্ধান পায়নি।

২৩ এপ্রিল

কাল রাত্রের সাঙ্ঘাতিক ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু তাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

কাল সকালে রোমের কিছু দ্রষ্টব্য দেখতে বেরিয়েছিলাম একটা ট্যুরিস্ট দলের সঙ্গে। ফিরেছি বিকেল সাড়ে চারটায়। তারপর কফি খেয়ে টাইবারের ধারে হাঁটলাম আধ ঘণ্টা।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আলবের্তি আমার হোটেলে এল। আমরা দুজনে একসঙ্গেই ডিনার খেলাম। তারপর স্থির করলাম সাড়ে দশটা নাগাদ দানিয়েলির বাড়ি যাব। বাড়ি যাব মানে বাড়ির বাইরে ওত পেতে থাকব। ল্যাবরেটরিটা বাইরে থেকে দেখা যায়, তাতে আলো জ্বললেই বুঝব দানিয়েলি ঢুকেছেন। তখন আমরা বাড়িতে গিয়ে ঢুকব।

দানিয়েলির পাড়াটা এমনিতেই নির্জন—তার ওপরে রাত্রে তো বটেই। বাড়ির সামনেই একটা পার্ক আছে। আমরা দুজনে সেই পার্কের রেলিং-এর ধারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ল্যাবরেটরি অন্ধকার, অথচ বাড়ির অন্য ঘরে আলো জ্বলছে।

বাড়ির দুশো গজের মধ্যেই একটা গির্জা, তাতে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যাবরেটরির আলো জ্বলে উঠল।

আমি আর আলবের্তি দানিয়েলির বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘন্টা টিপলাম। চাকর এসে দরজা খুলে আমাদের দেখেই বলল, 'এখন সিনিয়র দানিয়েলির সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর বারণ আছে।'

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলবের্তি তাকে একটা মোক্ষম ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিল। আমরা চাকরকে টপকে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আলবের্তি বলল, 'ফলো মি।'

সিঁড়ির পাশে একটা ঘর পেরিয়ে একটা প্যাসেজ, সেটা দিয়ে বাঁ দিকে হাত দশেক গেলেই ল্যাবরেটরির দরজা। দরজা অল্প ফাঁক, তা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে, প্যাসেজে কোনও আলো জ্বলছে না।

আমি আলবের্তিকে ফিসফিস করে বললাম, 'আমি ঢুকছি ভেতরে। তুমি দরজার বাইরে থেকো, দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

তারপর ল্যাবরেটরির ভেতরে ঢুকেই দেখলাম দানিয়েলি আমার দিকে পিঠ করে একটা খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একটা বোতল থেকে চামচে ওষুধ ঢালছেন।

'দানিয়েলি!'

আমার গলা শুনে তিনি চরকিবাজির মতো ঘুরে আমাকে দেখে চোখ

কপালে তুলে বললেন, 'সে কি, তুমি নিজেই এসে গেছ ? আমি তো তোমার হোটেলেই যাচ্ছিলাম।'

এই বলার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ওষুধটা খেয়ে ফেললেন, আর তারপরে অবাক হয়ে চোখের সামনে দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চেহারার পরিবর্তন হতে।

তিনি এখন আর সৌম্যদর্শন বিজ্ঞানী নন, তিনি হিংস্র চেহারার আধা-মানুষ আধা-জানোয়ার।

এরপরেই তিনি আর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি বিদ্যুদ্বেগে পাশ কাটাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথায় চরম ফন্দিটা এসে গেল। দানিয়েলি হাত দুটো বাড়িয়ে আবার আমার দিকে লাফ দেবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আলমারির তাকে রাখা ওষুধের বোতলটা হাতে নিয়ে এক ঢোক ওষুধ মুখে পুরে দিলাম।

তারপর এইটুকু শুধু মনে আছে যে, আমি ভীম-বিক্রমে দানিয়েলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এবং দুজনে একসঙ্গে মেঝেতে পড়ছি জড়াজড়ি অবস্থায়। এ-ও মনে আছে যে, আমার দেহে তখন অসুরের শক্তি। এ ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি আমার হোটেলের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার সর্বাঙ্গে বেদনা। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে আলবের্তি ঘরে ঢুকল।

'আপনি নিজে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না বলে রুম বয়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলেছি—আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'গুড মর্নিং,' বললাম আমি।

'আপনি আছেন কেমন ?'

'শরীরে কোনও জখম নেই, কেবল বেদনা।'

'আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, তিনি এসে আপনার ব্যবস্থা করবেন।'

'কিন্তু কাল কী হল ?'

'কাল দুই হিংস্র পিশাচকে মরণপণে লড়াই করতে দেখলাম। আমি এসে আপনার পক্ষ না নিলে কী হত বলা যায় না। আমি এককালে বক্সিং করেছি। দানিয়েলিকে একটা আপার কাট মেরে নক আউট করে দিই। তার আগে অবশ্য আপনিও ওঁকে যথেষ্ট কাবু করেছিলেন। উনি অজ্ঞান হলে আমি আপনাকে নিয়ে হোটেলে চলে আসি। যখন আপনাকে বিছানায় শুইয়ে দিই তখনও আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। যতক্ষণ না আমার চেনা প্রফেসর শঙ্কুকে আমার সামনে দেখতে পাই, ততক্ষণ আমি আপনার ঘরে ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে আসি। তখন রাত সাড়ে বারোটা।'

'আর দানিয়েলি ?'

এই প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই ডাক্তার চলে এলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি কাল কারুর সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তাঁর বাড়ি এই যুবকটি জানে। তিনি থাকেন ২৭ নং

ভিয়া সাক্রামেন্টোতে। তাঁর নাম ডাঃ এনরিকো দানিয়েলি। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত একটি ওষুধের প্রভাবে এই দশা করেছেন আমার। গত চার-পাঁচদিনে যে-ক'জন বিজ্ঞানী খুন হয়েছেন, তাঁদের গলার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই দানিয়েলির আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তাতে কোনও পার্থক্য নেই।'

'এটা তাহলে পুলিশের কেস ?'

'তা তো বটেই।'

'আমি এক্ষুণি পুলিশে খবর দিচ্ছি।'

ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন।

এবার আলবের্তি তার পকেট থেকে একটা বোতল বার করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এই হল বাকি ওষুধ। এটা আপনার কাছেই থাক। আপনার গবেষণাগারে যে বোতলটা রয়েছে, সেটার পাশে রেখে দেবেন। আশা করি এখন খানিকটা সুস্থ বোধ করবেন।'

'ওষুধ পড়েছে, আর চিন্তা কী। আমার মনে হয় পরশুর মধ্যেই দেশে ফিরতে পারব। তোমার সাহায্যের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। তোমার কথা ভুলব না কখনও।'

ছবি : সত্যজিৎ রায়

সেই রহস্যময় কুয়াশা

বিমল কর



বিকেলের দিকে হাতের কাজকর্ম শেষ করে চা খাচ্ছি, আমার ফোন এল অফিসে। রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই ও-প্রান্তে কমলেন্দুর গলা। স্পষ্ট করে কিছুই বলল না, বারবার সেই একই কথা, 'তুই একবার চলে আয়। জরুরি কথা আছে। আমি ওয়েট করছি তোর জন্যে।'

এক-একজন মানুষ থাকে যাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা বলি 'অদ্ভুত টাইপ'। কমলেন্দুও হল সেই জাতের মানুষ। সে কখন কী বলে, কোথায় যায়—কেউ বুঝতে পারে না। তাকে খেপা বলার উপায় নেই। বললে চটে যাবে, তারপর সারা পৃথিবীর এমন-এমন লোকের গল্প বলবে যাঁরা নমস্য ব্যক্তি, কিন্তু এক-একটি খেপার রাজা।

ক'দিন আগে কমলেন্দু গিয়েছিল চাইবাসায়। কেন গিয়েছিল তা জানি না। বলেছিল, 'জায়গাটার আশপাশ একবার দেখতে যাচ্ছি, যতীন একটা ফিল্ম করবে, বাচ্চাদের, আমায় সঙ্গে করে জায়গা পছন্দ করতে যাচ্ছে। আমি কিছু ছবি তুলে আনব।'

আমরা ভেবেছিলাম, সময়টা খাসা, একেবারে ডিসেম্বরের শেষ, জমাট ঠাণ্ডা পড়ছে, কমলেন্দুরা একেবারে বড়দিন পার করে ফিরবে। চাইবাসায় দিব্যি খাবে-দাবে ঘুরবে—তোফা থাকবে, বয়ে গেছে কলকাতায় ফিরতে!

তিনদিনের মাথায় কমলেন্দু ফিরে আসবে, ভাবতেও পারিনি। আর এমনভাবে ফোন করল যেন কী একটা ঘটে গিয়েছে বাড়িতে। ওর কথাবার্তা থেকেও কিছু বুঝতে পারলাম না, শুধু বারকয়েক 'ফ্যানটাসটিক' শব্দটাই যা শুনেছি। ওই শব্দটাও কমলেন্দু হামেশা বলে : বৃষ্টি নামলেও বলে, আবার মোহনবাগান গোল খেলেও বলে। অদ্ভুত ছেলে!

অফিস ছুটির পর কোথাও যাওয়া মানে প্রাণটিকে বাসের হ্যান্ডেলে না হয় মিনিবাসের পাদানিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই যেতে হল। কমলেন্দু থাকে গড়িয়ায়। শীতের দিন। যেতে-যেতে সন্ধে উতরে যাওয়ার জোগাড়।

কমলেন্দু আমার জন্য হাঁ করে বসে ছিল। যেতেই তার দোতলার ঘরে নিয়ে

গিয়ে বলল, 'এক মিনিট বোস, চায়ের কথা বলে আসি।'

চলে গেল কমলেন্দু। একটু পরেই ফিরল।

'কী ব্যাপার তোর ? এই কলকাতা ছেড়ে চাইবাসায় ছুটলি, আবার ফিরলি! ব্যাপারটা কী ?' আমি বললাম।

'বলছি। বোস একটু, জিরিয়ে নে।' বলেই কমলেন্দু টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে এনে আমার হাতে দিল।

দুজনেই সিগারেট ধরালাম।

কমলেন্দু বলল, 'ভাই, আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। ফ্যানটাসটিক। এ রকম জিনিস আর আমি দেখিনি। দেখব না।' বলতে-বলতে কমলেন্দুর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠল, 'ওই দেখার পর থেকে আমার এত শরীর খারাপ হল, জ্বর এসে গেল যে, আমি আর থাকতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম।'

অবাক হয়ে বললাম, 'পালিয়ে এলি ? আর যতীন ?'

'যতীনও চলে এসেছে। তবে আমি যা দেখেছি, যতীন তার সিকির সিকি দেখেছে। তাতেই ওর ভয় ধরে গিয়েছে।'

আমি বললাম. ঠাট্টার গলায়,'দেখেছিস কী ! ভূত ?'

'ভূত ! ভূত দেখলে তো ভালই হত। এ ভাই ভূত নয়, ভবিষ্যৎ।'

'ভবিষ্যৎ ! কী বলছিস ?'

'ওই বললাম, কথার কথা। সত্যি বলতে কী, আমি কী দেখেছি, ভূত, ভবিষ্যৎ, না বর্তমান, বলতে পারব না। এ-জিনিস জীবনে আর দেখিনি !'

আমি অবাক হয়ে কমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কমলেন্দুর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় সে কেমন বিহ্বল হয়ে রয়েছে। হয়তো ভেতরে-ভেতরে সামান্য ভীত। বললাম, 'হেঁয়ালি না করে ব্যাপারটা বল। তুই ফিরেছিস কবে ?'

'আজ সকালে। ...বলব ব্যাপারটা ?'

'বলতেই তো বলছি।'

কমলেন্দু বলল, 'তুই জানিস আমরা গত সোমবার চাইবাসায় গিয়েছিলাম। সোমবার রাত্রে গাড়িতে উঠি, মঙ্গলবার সকালে আমাদের যদি কেউ দেখত, বুঝত—আমরা খুশমেজাজে এক ভদ্রলোকের গেস্ট হাউসে বসে চা, সেদ্ধ ডিম আর রুটি-মাখন ওড়াচ্ছি। গেস্ট হাউস অবাঙালি ভদ্রলোকের। যতীনকে এখান থেকেই কেউ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ওই গেস্ট হাউস আর একটা জিপ।

'আমরা চা খেয়ে একবার টহল মারতে বেরুলাম। জায়গাটা ভাল। শীতও পড়েছে প্রচণ্ড। ভালই লাগছিল বেড়াতে। ঘণ্টাখানেক ঘুরে-ফিরে আবার গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। গল্পগুজব করলাম দুজনে অনেকক্ষণ। তারপর স্নানের ব্যবস্থা।

'দুপুরটাও বেশ কাটল। নাক ডাকিয়ে ঘুমোলাম। বিকেলে চা খেয়ে

গেলাম এক ভদ্রলোকের বাড়ি। বাঙালি। যতীন তাঁর ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা থেকে। ভদ্রলোক এককালে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজকর্ম করতেন। এখন রিটায়ার্ড লাইফ। খুব গপ্পে-লোক। সিংভূমের জঙ্গল তাঁর একরকম নখদর্পণে। তিনি নানান গল্প বললেন, তারপর বললেন, "তোমরা তো বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চারের সিনেমা করতে চাও, তা আমি তোমাদের একটা স্পটের কথা বলতে পারি। কেউ জানে না। নামও শোনেনি। তোমরা এখান থেকে মাইলপাঁচেক দূরে একটা চমৎকার জায়গা পাবে। উত্তরের দিকে। জায়গাটা ভাল বলছি—কারণ ওখানে জঙ্গল পাবে, ছোট-ছোট পাহাড় পাবে, মাঠ পাবে, এমনকি একটা সরু খালের মতন পাবে। এখন অবশ্য শীতকাল, খালে জল নেই। জায়গাটা সুন্দর। বুনো গাছে ফুলটুল দেখতে পাবে, পাখি-টাখিও এই সময় পাওয়া যায়।"

'যতীন ঠিক করল, কাল সকালেই যাবে জায়গাটা দেখতে। আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এমন কপাল ভাই, সকালে জিপ বার করতে গিয়ে দেখা গেল গাড়ি গোলমাল করছে। ড্রাইভার বলল, মিস্ত্রি ধরে এনে সারাতে হবে। দেরি হবে খানিকটা।

'মিস্ত্রি ধরে এনে সারাতে যে সারা বেলা কেটে যাবে, বুঝিনি! ড্রাইভার গিয়ে মিস্ত্রি ধরে আনল ঘণ্টাখানেক পরে। তারপর সেই যে বসল লোকটা যন্ত্রপাতি খুলে—পুরো বেলাটা কেটে গেল। তা আমরা ঠিক করলাম, বিকেলেই যাব। মাত্র তো পাঁচ মাইল রাস্তা, গাড়িতে আর কতক্ষণ! বরং বিকেলেই ভাল হবে।' কমলেন্দু একটু থামল।

আমাদের চা-জলখাবার এসেছিল। কমলেন্দু শুধু চা খাবে। আমার জন্য বড়বউদি কিছু সুখাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন, বাড়িতে তৈরি কচুরি আর হিং-দেওয়া আলুর দম। মেজবউদি এসে খাবার, চা দিয়ে গেলেন।

বলতে লজ্জা নেই, আমার খিদে পেয়েছিল। তার ওপর কচুরি আর আলুর দমের যে রকম সুবাস উঠছিল তাতে আমার মন তখন খাবারের দিকে, কমলেন্দুর দিকে নয়।

কমলেন্দু বলল, 'বিকেলে আমরা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আগেভাগেই বেরুলাম, কেননা পাঁচটা বাজতে-না-বাজতেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে। আমাদের জিপের ড্রাইভারের নাম তারক। লোকটা জোয়ান। গাড়ি ভালই চালায়। একমাত্র দোষ হল, বড় বেশি হর্ন বাজায়, অকারণে।

'তা জায়গাটায় পৌঁছে আমাদের ভালই লাগল। যদিও সঙ্গে আমার ক্যামেরা ছিল, দু-একটা ছবিও তুললাম, কিন্তু ঠিক হল, কাল সকালে এসে ভাল করে সব দেখতে হবে। তখন বেশ কিছু ছবিও তোলা হবে।

'জিপের কাছে ফিরে এসে যতীন বলল, সে এমন একটা জায়গা চায়—যেখানে অনেকটা ঢালু মাঠ, মাঠের পর আবার চড়াই, একটা ভাঙাচোরা পুরনো বাড়ি বা বড়-বড় পাথর-টাথর পড়ে আছে—এ রকম হলে ভাল হয়।



আমার চিৎকার শুনে যতীন ছুটতে-ছুটতে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে কুয়াশার দিকটা দেখালাম। ততক্ষণে ঘন কুয়াশা একেবারে ফিকে হয়ে আসছে।

'তারক আমাদের কথা শুনছিল। বলল, আর খানিকটা এগুলেই ও রকম একটা ভাঙা গড় চোখে পড়বে। এদিকে বিকেল মরে যাচ্ছিল, তবু যতীন বলল, চলো, একবার দেখে যাই।

'আমরা আবার জিপে উঠলাম। তারক আমাদের ভাঙা গড় দেখাতে নিয়ে চলল। খানিকটা রাস্তা, তারপর আর রাস্তা নেই, ঝোপজঙ্গল মাঠের ভেতর যেতে-যেতে অন্ধকার হয়ে গেল। আর বেশি এগুনো উচিত হবে না ভেবে তারক বলল, স্যার, আমরা আজ ফিরি, কাল সকালে আবার আসব। আমরাও রাজি হলাম তারকের কথায়। বিকেল বলে তখন আর কিছু ছিল না। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কনকন করছে শীত। জোর বাতাস দিচ্ছিল শীতের।

'তারক গাড়ি ঘুরিয়ে সামান্য এগিয়েছে, হঠাৎ একটা চাকা গেল ফেঁসে! তার মানে, এখন চাকা পালটাও। অন্তত দশ-পনেরো মিনিটের ধাক্কা। তারক বসল চাকা পালটাতে, যতীন তাকে সাহায্য করতে লাগল। গাড়ির ব্যাপারে যতীন কিছু-কিছু জানে, আমি কিছুই নয়। আমাদের সঙ্গে টর্চ ছিল না। খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল টর্চ সঙ্গে করে না নিয়ে গিয়ে। তারক কিছু শুকনো পাতা-টাতা পায়ে করে টেনে-টেনে জোগাড় করল, আর যতীন তার লাইটার দিয়ে সেগুলো জ্বালিয়ে দিল। ঠিকমতন জ্বলছিল না পাতাগুলো। কিন্তু অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

'ওরা চাকা পালটাচ্ছে দেখে আমি কাছেই পায়চারি করছিলাম। করতে-করতে সামান্য এগিয়ে গিয়েছি, হঠাৎ কেমন যেন লাগল। কেমন লাগল, ঠিক বোঝানো মুশকিল। মনটা আচমকা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, মাথা ধরে গেল ঝট করে, অস্বস্তি হতে লাগল, বুকের মধ্যে একটা কষ্টের মতন, শ্বাস নিতেও একটু কষ্ট হচ্ছিল। কেন এ রকম হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। সামনে তাকিয়ে থাকলাম। অদ্ভুত লাগছিল। খানিকটা তফাতে যেন কুয়াশা জমতে-জমতে ক্রমশই গাঢ় হয়ে গেছে। একেবারে যেন কুয়াশার নদী। দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমার চোখের সামনে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুধু কুয়াশার নদী বয়ে যাচ্ছে। আর অদ্ভুত কাণ্ড, মনে হচ্ছিল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সামান্য দূর থেকে যেন কারা চলে যাচ্ছে, পায়ের শব্দের মতন লাগছিল, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, সবই কুয়াশায় ভরা।

'আমার ভীষণ ভয় করছিল, খালি মনে হচ্ছিল ওই কুয়াশা যেন আমায় জোর করে ওখানে টেনে নিচ্ছে। একবার যদি টেনে নেয়, আমি আর ফিরতে পারব না। আমার শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।

'যতীনরা আমার থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে। শুকনো পাতা পুড়ছে তখনও। ওদের আমি দেখতেও পাচ্ছিলাম। ভয় পেয়ে আমি যতীনকে ডাকতে লাগলাম।

'আমার চিৎকার শুনে যতীন ছুটতে-ছুটতে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে কুয়াশার দিকটা দেখালাম। ততক্ষণে ঘন কুয়াশা একেবারে ফিকে হয়ে

আসছে। পাতলা ধোঁয়ার মতন দেখাচ্ছিল। আমরা দুজনেই দেখলাম, ছায়ার মতন কিছু লোক যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। ঠিক যেন তীর্থযাত্রী।

'তারপর সব মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে যাওয়ার পর আমি বুঝলাম। এতক্ষণ যে ঘন কুয়াশা নদীর মতন আমার চোখের সামনে ছিল, সেটা স্বাভাবিক কুয়াশা নয়। সেটা কী, তাও আমি জানি না। তবে জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক কুয়াশা ওই সন্ধের মুখে ও রকম হওয়ার কথা নয়।

'আমার মতন যতীনও অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে যেটুকু দেখেছে তাতে আমার মতন ভয় পাওয়ার কথা নয়। তবু যতীনও খানিকটা অসুস্থ বোধ করেছে, ভয় পেয়েছে।

'আমার শরীর বেশ খারাপ লাগলেও আমরা পরের দিন সকালে জায়গাটায় গিয়েছিলাম। কোনওরকম অস্বাভাবিকতা দেখিনি। বিকেলেও চেষ্টা করেছিলাম যাওয়ার—সেই রিটায়ার্ড ফরেস্ট অফিসার বারণ করলেন। আমরা আর ওখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। অন্তত আমার শরীর-মন খুব খারাপ লাগছিল। কলকাতায় চলে এলাম।

'একটা কথা তোকে বলি, কলকাতায় ফিরেও আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। ডিপ্রেশানের মতন লাগছে। এখন কী করা যায় বল তো ? তোকে তাই ডেকেছি।'

কমলেন্দুর সব কথা শুনে আমার মনে হল, ও মুখে যা বলছে বোধহয় তার কিছুটা সত্যি, কিছুটা বানানো। বানানো মানে মিথ্যে কথা নয়, অনেক সময় আমরা যা বাস্তবিক দেখি না, তাও কেমন দেখেছি বলে মনে হয়। এই ভ্রম সব মানুষেরই হয়। বিশেষ করে আমরা যখন অন্যমনস্ক থাকি, অসুস্থ থাকি, উদ্বিগ্ন থাকি, কিংবা কোনও ঘোরে থাকি। আমার বুদ্ধিমতে বলে, কমলেন্দু বাস্তবে যা দেখেছে তার চারগুণ বেশি দেখেছে কল্পনায় বা ভ্রমে।

কথাটা কমলেন্দুকে বলতেই সে চটে গেল। বলল, 'আমি কি নেশাখোর যে, তোর সঙ্গে গাঁজাখুরি গল্প করছি ?'

আমি বললাম, 'নেশাখোরের কথা হচ্ছে না। আমার কথাটা শোন। শীতকালে সন্ধের দিকে জঙ্গলে কুয়াশা দেখা তো অবাক হওয়ার মতন কিছু নয়। সবাই দেখে। সেটাই স্বাভাবিক। তুইও দেখেছিস। আর তুই নিজেই বলেছিস তোর শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে যায় ওই সময়ে। এটাও তো ভাই নতুন কিছু নয়। মানুষের শরীর, তার হাজার রকম কলকব্জা, হুট করে আমাদের শরীর খারাপ হয় না কী ? সবসময়েই হয়। অসুস্থ শরীরে ওই সন্ধের সময় জঙ্গলে চোখের ভুল বা মনের ভুল হতেই পারে !'

কমলেন্দু বলল, 'না, আমি ভুল দেখিনি। আর আমার এমন কোনও অসুখ নেই যে, হুট করে শরীর খারাপ হবে !'

'কী জানি ভাই ! তা হলে বলতে হবে—তুই যা দেখেছিস সেটা ভুতুড়ে কাণ্ড।'

কমলেন্দু বলল, 'বেশ, তাই হল। কিন্তু তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। আমাকে তুই একবার তোর মেসোমশাইয়ের কাছে নিয়ে চল। ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

বুঝলাম, কমলেন্দুর কাছে আমি নিমিত্তমাত্র, আসল হলেন আমার মেসোমশাই। বললাম, 'বেশ তো, কালই চল, এ আর এমন কী হাতি-ঘোড়া কাজ।'

'তোকে ফোন করব অফিসে?'

'কোনও দরকার নেই। তুই বিকেলে চলে আয় আমার কাছে। দুজনে চলে যাব। মেসোমশাইকে বরং আমি বলে রাখব।'

'সেই ভাল।'

কথাবার্তা শেষ করে আমি উঠে পড়লাম।

আমার মেসোমশাই কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তিনি না বিজ্ঞানী, না ভূত-প্রেত বিশারদ। সাদামাটা চাকুরে। এক বিদেশী ল' বুক্স-এর দোকানে চাকরি করেন। হিসেবপত্র দেখার দায়িত্ব তাঁর।

পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলেও নেশায় অন্য জাতের। উনি 'কুপারস' সোসাইটি বলে এক সমিতির মেম্বার। 'কুপারস' সোসাইটির ঘাঁটি হল বিলেতে, খাস লণ্ডন শহরে। সোসাইটির কাজ হল পৃথিবীর যেখানে যত অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অ-প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেছে তা জোগাড় করে তার রেকর্ড রাখা। বছরে একবার করে সেই রেকর্ড ছাপা হয়। গ্রসভেনার কোম্পানি সেটা ছাপে। অনেক নামকরা লোক সমিতির মেম্বার। তাঁরা রেকর্ড থেকে নানা জিনিস জানতে পারেন। আলোচনাও করেন প্রয়োজন মনে করলে।

আমার মেসোমশাই এই সমিতির একজন সদস্য। তাঁর অবশ্য কাজ হল, আমাদের এদিকে—যেমন বাংলায়, আসামে, উড়িষ্যায় যদি কোনও অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে—আর তার খবর কাগজেপত্রে ছাপা হলে তিনি সেটির রিপোর্ট লিখে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন। ভারতের নানা জায়গায় 'কুপারস' সোসাইটির লোক আছে। মেসোমশাইয়ের এই কাজে প্রচণ্ড নেশা।

কমলেন্দুকে সঙ্গে করে মেসোমশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলাম।

বাড়িতে মেসোমশাইয়ের নিজস্ব একটি আস্তানা আছে। সেখানে বই, ম্যাপ, গ্লোব আর কাগজের ছড়াছড়ি। টাইপরাইটার মেশিন আছে। আরও কত কী!

কমলেন্দুকে খাতির করে বসালেন মেসোমশাই। কফি আর কেক খাওয়ালেন আমাদের। তারপর চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'বলো, তোমাদের কথা শুনি?'

কমলেন্দু আমাকে যা বলেছিল—আগাগোড়া বলল আবার।

মেসোমশাই খুব মন দিয়ে সব শুনলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন।

তারপর উঠে গিয়ে খুঁজে-খুঁজে একটা ম্যাপের বই বার করে আনলেন। এগুলো অনেকটা সার্ভে ম্যাপের মতন। নিজেই সিংভূম অঞ্চলের একটা ম্যাপ বার করলেন। তাতে বিশেষ কোনও সুবিধে হল না। অত ছোট্ট একটু জায়গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তবু দেখি মেসোমশাই কাগজে কিছু নোট করে নিলেন।

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা কী, মেসোমশাই ?'

মেসোমশাই বললেন, 'আমি তো ঠিক বলতে পারব না। তবে কমলেন্দু যা বলছে—আমি পুরোটা লিখে ওকে দিয়ে দেখিয়ে, সই করিয়ে জায়গা মতন পাঠিয়ে দেব।'

কমলেন্দু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'বিশু বলছিল, ব্যাপারটা আমার মনগড়া।'

মেসোমশাই মাথা নাড়লেন, বললেন, 'আমার তা মনে হয় না। তুমি হঠাৎ এই মনগড়া কথা বলতে যাবে কেন ? তোমার কী লাভ ?'

আমি বললাম, 'না, তা নয়, মেসোমশাই। কিন্তু এমন তো হতে পারে—কমলেন্দু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায় জঙ্গলের কুয়াশার মধ্যে কিছু ভুল দেখেছে বা ভেবেছে, অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতন।'

মেসোমশাইয়ের চুরুট নিভে গিয়েছিল। চুরুট জ্বালাতে-জ্বালাতে বললেন, 'হতে পারে না তা নয়, বিশু। তবে না-ও হতে পারে।'

'তার মানে ?'

'মানে এককথায় বোঝানো যায় না। তবু বলি। প্রথমত ধরো, কমলেন্দু তোমার বয়েসী ছেলে। ওর শরীর স্বাস্থ্য তোমার চেয়ে ভাল। ঝপ করে ওর শরীর খারাপ নিশ্চয় হতে পারে, কিন্তু তাই কি সচরাচর হয় ! এই যে তুমি অফিস যাও, আমি অফিস যাই, আমাদের কি ঝপ করে কোনও বড়রকম শরীর খারাপ হয় ? যদি রোগ থাকে তবে হতেই পারে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে চট করে বড় কিছু হয় না। কাজেই স্বাভাবিক, সুস্থ, ছোকরা-বয়েসী একজনের হঠাৎ শরীর খারাপ হবে কেন ? কমলেন্দুর কোনও রোগ আছে কি ?'

মাথা নাড়ল কমলেন্দু, 'না।'

'ঠিক বলছ তো ?'

কমলেন্দু বলল, 'না, মেসোমশাই, আমার কোনও রোগ নেই।'

মেসোমশাই বললেন, 'তাহলে, আমার মনে হয়, কমলেন্দু যা দেখেছে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার চেয়েও বড় কথা যে, হঠাৎ শরীর খারাপ লেগেছে—তারও একটা কারণ আছে।'

আমি আর কমলেন্দু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কারণটা কী জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল।

মেসোমশাই বললেন, 'তোমরা হয়তো জানো না লেথব্রিজ বলে এক ব্রিটিশ পণ্ডিত একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। লেথব্রিজের পুরো নাম টি. সি. লেথব্রিজ। ভদ্রলোক একজন নামকরা এথ্‌নোলজিস্ট এবং আর্কিওলজিস্ট।

এথ্‌নোলজিস্ট কথাটার মানে বোঝো ? সোজা করে বলতে হলে—মানুষ কীভাবে আলাদা আলাদা জাতি হয়ে গেল, কেমন করে জাতিভাগ ঘটল, পরস্পরের সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, এইসব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, গবেষণা করেন, তাঁদের বলে এথ্‌নোলজিস্ট।... তা লেথব্রিজ সাহেব নানা গবেষণা করতে-করতে একবার এক অভিজ্ঞতা থেকে একটি তত্ত্ব খাড়া করেন। তত্ত্বটি হল, পাহাড়, জল, মরুভূমি এবং কোনও-কোনও ফাঁকা জায়গার এক-এক ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে যাকে আমরা বাংলায় বলি চৌম্বক ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রগুলি মানুষের কাছে ধাঁধার মতন। আমরা স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারি না, কিন্তু এই পাহাড়, নদী, প্রান্তর—এক-এক সময় আমাদের ভীষণ বিভ্রমে ফেলে।'

কমলেন্দু আমার দিকে তাকাল। আমি তার দিকে। আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারলাম না।

মেসোমশাই বললেন, 'দাঁড়াও, তোমাদের একটা বই দেখাই।'

উঠলেন মেসোমশাই। তাঁর ঘরে বইপত্রের অভাব নেই। বই আর কাগজ সবই বেশ গুছিয়ে রাখা।

খোঁজাখুঁজি করে একটা বই এনে আবার বসলেন। বললেন, 'এর মধ্যে লেথব্রিজের নিজের দু-একটা অভিজ্ঞতার কথা আছে। দেখাচ্ছি তোমাদের।'

বইয়ের পাতা হাতড়ে মেসোমশাই ঠিক জায়গাটি বার করলেন। এগিয়ে দিলেন কমলেন্দুর দিকে।

কমলেন্দু বই নিল। পড়ল। তারপর আমার দিকে দিল। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই পড়লাম আমি। পড়ে দেখলাম, লেথব্রিজ যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হয়—তবে কমলেন্দুর সব কথাই মেনে নিতে হয়।

বইয়ে কিছু লেখা থাকলেই কী সবসময় তা মেনে নিতে মন চায় ? আমি বললাম, 'মেসোমশাই, আপনার লেথব্রিজসাহেবও এমন এক পরিবেশের কথা লিখেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কমলেন্দুর মতনই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই হঠাৎ কেমন মন-ভেঙে-পড়া ভাব, গা-বমি গা-বমি অনুভূতি, ভয়-ভয় অবস্থা। আর ওই অবস্থায় তিনি তো প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা ঘটনা দেখেছিলেন। এখন কথা হল, স্থানমাহাত্ম্যে এত ঘটনা কি ঘটে ?'

মেসোমশাই আমার ঠাট্টাটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'ঘটে যে, তা আমি জোর গলায় কেমন করে বলব ? আবার ঘটে না, তাও বলব না। সব জায়গায় যে ঘটছে, তাও তো নয়। পৃথিবীর সব জায়গায় মাটি খুঁড়লেই যেমন কয়লা বা তেল পাওয়া যায় না—সেইরকম যে-কোনও নদী, পাহাড়, মরুভূমি কিংবা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়লেই যে তুমি ম্যাগনেটিক ক্ষেত্র পাবে, তা নয়। কোথাও-কোথাও থেকে যায়। কেমন করে যায়, কোথায় থাকে—তা আমি বলতে পারব না। খুবই আচমকা, হঠাৎ হয়তো সে-জায়গায় আমরা গিয়ে পড়ি। কমলেন্দু কিছু না জেনেই সেইরকম এক জায়গায় গিয়ে পড়েছিল।'

আমি বললাম, 'বেশ, আপনার প্রথম কথাটা না হয় স্বীকার করাই গেল। কিন্তু কমলেন্দু যে কুয়াশার মধ্যে ঝাপসা কিছু মানুষ দেখেছে—তাদের পায়ের শব্দ শুনেছে—তার কী যুক্তি দেখাবেন ?'

চুরুটের ছাই ঝেড়ে মেসোমশাই বললেন, 'অতীতের কোনও-কোনও ঘটনা এইভাবে আচমকা আমাদের চোখে ভেসে আসে। সেটা নিশ্চয় তোমার-আমার কথামতন বাস্তব নয়। কিন্তু আসে। এ রকম বহু ঘটনার কথা পৃথিবীর নানা জায়গায় শোনা গিয়েছে। রেকর্ড করা আছে। তার মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা হল ফ্রান্সের এক জায়গায় দু-ভদ্রলোক, একান্ন-বাহান্ন সাল নাগাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দশকের একেবারে শেষের দিকে, এক যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি তাঁরা এটা দেখেন। পরে পুরনো কাগজপত্র হাতড়ে জানা গেল, মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী যখন যুদ্ধজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে তখন ওই বিশেষ জায়গায় ওই সময় মিত্রশক্তি ও তার শত্রুপক্ষের এক ঘোরতর মাঠ-ময়দানের লড়াই হয়। ভদ্রলোকরা সেটা দেখেছিলেন। ঘণ্টাখানেক ওইসব দেখার পর আবার সব শান্ত, স্বাভাবিক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখেছি বললেই তো সেটা সত্যি হয় না মেসোমশাই, যুক্তি কী!' আমি বললাম।

মেসোমশাই বললেন, 'যুক্তি নেই বলেই তো এসব ঘটনা রহস্য বলে খাতাপত্রে লেখা থাকছে। তবে মোটামুটি দু-একটা যুক্তি দেখানোও হয়। যেমন, লেথব্রিজসাহেব বলছেন, এই ধরনের কোনও-কোনও জায়গায় যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বা তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্র ঘটনাটি ধরে রাখে। কেমন করে ধরে রাখে সেটা আমার পক্ষে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে ধরো, টেপরেকর্ডারে আমরা যেভাবে শব্দ ধরে রাখি সেইরকম একটা ব্যাপার।'

কমলেন্দু বলল, 'গ্রামোফোন রেকর্ডেও তো আমরা শব্দ ধরে রাখি।'

'হ্যাঁ,' মেসোমশাই বললেন, 'মানুষ এক সময় যা অসম্ভব ভাবে—পরে বিজ্ঞান পাঁচরকম হাতড়াতে-হাতড়াতে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। রেকর্ড, রেডিয়ো, সিনেমা, টেলিভিশন—এসবও তো একসময়ে অসম্ভবের পর্যায়ে ছিল। আজ আর ওর কোনওটাই অদ্ভুত নয়, রহস্যময় নয়। এমনকি চাঁদে পাড়ি দেওয়াও গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে গেল।'

আমি বললাম, 'যা অতীত তা কি তাহলে কোথাও লুকনো আছে ?'

মেসোমশাই মাথা নাড়লেন, বললেন, 'তোমার প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। তবে কমলেন্দু যদি সেদিন ওই অবস্থায় কুয়াশার মধ্যে কিছু লোকজন ঝাপসাভাবে দেখে থাকে—তবে আমি অন্তত অবিশ্বাস করব না।'

'কেন ?'

'এইজন্যে যে, সেদিন ওই সময়ে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বিশেষ জায়গায় তৈরি হয়েছিল, বা ওখানে বরাবরই আছে, কমলেন্দু তার কাছাকাছি

যাওয়ামাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর ওই ফিল্ডে সে এমন এক দৃশ্য দেখেছে, যা অতীতের। হয়তো একদল মানুষ ওই জঙ্গল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল—কোনওদিন, সেটা ধরা থেকে গেছে। আচমকা ছবিটা এসেছিল, আবার সেটা হারিয়ে গেল। প্রকৃতির খেয়াল, মানুষের সাধ্য কী বোঝে !··· যাকগে, কমলেন্দুর ব্যাপারটা আমি আমাদের সোসাইটিতে রেকর্ড করার জন্যে পাঠিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'আজকাল সবাই ডাইমেনশান-ডাইমেনশান বলে। এর সঙ্গে কি তার সম্পর্ক আছে ?'

মেসোমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, আজকাল ডাইমেনশান যেন বেড়েই যাচ্ছে। ফোর্থ, ফিফ্‌থ, সিক্সথ···কে জানে ! হতে পারে দৃষ্টির বাইরে যে ডাইমেনশান, তার আচমকা খেয়ালে এসব হয়। পৃথিবী বড় বিচিত্র, বিশু, প্রকৃতি আরও বিচিত্র। কতটুকু আমরা জানি বা বুঝি ! কতটাই বা দেখতে পাই !'

বাইরে এসে কমলেন্দু বলল, 'বিশু, আমি আর-একবার চাইবাসায় যাব। যাবি তুই ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'তোদের ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার সহ্য হবে না।'

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ক্যাপ্টেন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



হাতের তাস শাফ্‌ল করতে-করতে ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যস, তাহলে এই কথাই রইল। আমি ডিল করছি। সবচেয়ে কম দরের তাস যার ভাগ্যে উঠবে, তাকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। সে নিজে হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু তারই জন্যে যে বাদবাকিরা বেঁচে যাবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা।'

মাত্রই ঘণ্টাখানেক আগে বার্বেরিস গ্রহের এই চাঁদের পিঠে পাঁচ অভিযাত্রী এসে নেমেছিল। মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইদি ওকাবু, পিটার জ্যাকসন, রোবের সুস্তেল আর মালাকানু বিকিলা। তারা ভেবেছিল, এখানে একটি রিলে-স্টেশন তৈরি করে তোলা যাবে। তার প্রাথমিক কাজ শুরুও করেছিল তারা। কিন্তু ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে এখন তারা এই গুহার মধ্যে বসে আছে।

গুহার বাইরে, এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমির ওপরে ছড়িয়ে আছে হাল্‌কা বেগ্‌নি রঙের রোদ্দুর। সেই সূর্যের রোদ্দুর, পৃথিবীর মানুষরা যাকে 'পরাশর' বলে চেনে। রোদ্দুর অবশ্য গুহার ভেতরে বিশেষ ঢুকতে পারছে না, কেননা, গুহার ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন পৃথিবীর সেই ডাইনোসরের মতোই বিশাল একটি প্রাণী। বার্বেরিসের যে-চাঁদকে তারা সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ একটা উপগ্রহ বলে ধরে নিয়েছিল, জমি জরিপ করতে নেমে সেখানে যে একেবারে অতর্কিতে এই হিংস্র জন্তুর মুখের সামনে পড়তে হবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি। ন্যাড়া একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই জন্তুটি তাদের তাড়া করে। ঠিক তক্ষুণি যদি না এই গুহার মধ্যে তারা ঢুকে পড়ত, তা হলে আর তাদের বাঁচতে হত না।

বাঁচবার আশা অবশ্য এখনও বিশেষ নেই। কেননা, টাইটান মহাকাশযান থেকে ছোট্ট মাপের যে-শাট্‌লে করে তারা এখানে নেমেছে, তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে তাদের লেসার-পিস্তল। দরকার হবে না ভেবেই সেগুলো আর তারা নামায়নি। ফলে, এখন তারা পুরোপুরি নিরস্ত্র। বাইরে, বেগ্‌নি রঙের রোদ্দুরের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছে তাদের শাট্‌ল-যান। কিন্তু এই গুহা থেকে

বেরিয়ে সেখানে পৌঁছবার কোনও উপায়ই তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

কী করে পাবে? গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে সেই জন্তু। রাগে গজরাচ্ছে, পাথুরে জমির ওপরে ঘন-ঘন লেজ আছড়াচ্ছে। গুহার মুখটা তার শরীরের তুলনায় এতই ছোট যে, কিছুতেই সে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। কিন্তু যেভাবে সে তার থাবা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে গুহার মুখের পাথরের চাঁইটাকে, যে-কোনও মুহূর্তে সেটা আল্‌গা হয়ে খসে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। কী হবে তখন?

ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদের নেতা। দেখে যুবক বলে ভ্রম হয়, কিন্তু তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশ। কথা ছিল, রিলে-স্টেশনের জরিপের কাজ শেষ করেই তিনি অবসর নেবেন। হাইবারনেশন-ক্যাপসুলে পুরে তাঁকে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে, এবং সেইখানেই তিনি কাটাবেন তাঁর অবসরজীবন। কিন্তু এই শেষ মিশনেই যে তাঁর অনুসন্ধানী দলটিকে নিয়ে এমন বিপদে পড়তে হবে, তা কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন?

সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকালেন মিলিন্দ। তাঁর ওপরে নির্ভর করছে এদের জীবন-মৃত্যু। আপন হাতে এদের তিনি তৈরি করে তুলেছেন। সাফল্যের মুহূর্তে যেমন মুক্তকণ্ঠে 'শাবাশ' দিয়েছেন, তেমনই বিপদের মুহূর্তে জুগিয়েছেন সাহস। বয়সে এরা প্রত্যেকেই তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। সবচেয়ে ছোট আফ্রিকার ওই কালো মেয়ে মালাকানু, যাকে তিনি আদর করে 'মালা' বলে ডাকেন। মালার বয়স বাইশ বছর। মাত্রই দু-বছর আগে মালা তাঁর অনুসন্ধানী দলে এসে যোগ দিয়েছে, কিন্তু বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও সাহসে, সহিষ্ণুতায়, বুদ্ধিতে আর উদ্ভাবনী কৌশলে সে কারও থেকে কিছুমাত্র পিছিয়ে নেই। ইদি, পিটার আর রোবেরও সে-কথা খোলাখুলি স্বীকার করে। একবার তো ঘোর বিপদের মুহূর্তে এই মালার বুদ্ধিতেই বেঁচে গিয়েছিল পিটার জ্যাকসন। পিটার সে-কথা ভুলে যায়নি।

মালাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন মিলিন্দ। তাঁর মেয়ে নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটি ছেলে। কিন্তু ছেলেটিও কাছে নেই। পৃথিবীতে সে তার কাজের মধ্যে ডুবে আছে। দিল্লিতে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই সে এখন মহাকাশবিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নামজাদা অধ্যাপক। এখন অবশ্য সেই ছেলের কথাও মিলিন্দ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কথা। ভাবছিলেন যে, যেমন তাঁর নিজের, তেমনই তাঁর সহকর্মীদের জীবনেরও আজ শেষ দিন।

সকলেরই শেষ দিন? মিলিন্দের মাথার মধ্যে একেবারে হঠাৎই একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেল। আছে, পাঁচজনকে না হোক, অন্তত চারজনকে বাঁচাবার একটা উপায় হয়তো আছে। দলের পাঁচজনের মধ্যে যে-কোনও একজন যদি ছুটে বেরিয়ে যায় এই গুহা থেকে, তাহলে ওই জন্তুটা নিশ্চয় তাকে তাড়া করবে,



হিংস্র জন্তুটার পেটের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন... । আর জন্তুটা তাঁকে তাড়া করতেই বাদবাকি চারজনও...শাট্‌লের দিকে ছুট লাগাল ।

আর সেই ফাঁকে বাকি চারজন হয়তো উলটো পথে দৌড়ে গিয়ে শাট্‌লে উঠে পড়তে পারবে। অর্থাৎ, একজনের প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে যাবে বাকি চারজন।

কিন্তু কে হবে সেই একজন, দলের চারজনকে বাঁচাবার জন্য মিলিন্দ যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন ?

সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকালেন মিলিন্দ। তিনি জানেন, নেতার নির্দেশ ওরা কেউই অমান্য করবে না। যাকে আদেশ করবেন, সে-ই ছুটে বেরিয়ে যাবে এই গুহা থেকে। বেরিয়ে গিয়ে শাট্‌লের বিপরীত দিকে দৌড়তে থাকবে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ক্ষুধার্ত জন্তুটার দৃষ্টিকে সে তার দিকে আকর্ষণ করতে একটুও দ্বিধা করবে না।

কিন্তু কাকে সে-কাজ করতে বলবেন মিলিন্দ ? জেনেশুনে কাকে তিনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন ? ইদি ওকাবুকে, যাকে তিনি আত্মহত্যার পথ থেকে একদিন ফিরিয়ে এনেছিলেন ? পিটার জ্যাকসনকে ? জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে যাকে তিনি মানুষের কল্যাণের কাজে লাগিয়েছেন ? রোবের সুস্তেলকে ? তাঁরই কথায় যে কিনা বিলাসের জীবন হাসিমুখে ছেড়ে এসেছে ? না কি মালাকে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যে-মেয়েটিকে তিনি তাঁর নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন ?

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি হল না ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁরই হাতে জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়ে যারা নিশ্চিন্ত, তাদের কাউকেই তিনি এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে বলতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং ব্যাপারটাকে তিনি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবেন।

হাতে যখন কাজকর্ম থাকে না, মিলিন্দ তখন 'পেশেন্স' খেলেন। এ-খেলার সুবিধে এই যে, একা-একাই খেলা যায়, শুধু এক প্যাকেট তাস থাকলেই হল। পকেটে তাই সবসময়েই এক প্যাকেট তাস রাখেন মিলিন্দ। ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই তাসের প্যাকেটটাকে তিনি বার করে আনলেন।

তাস শাফ্‌ল করতে-করতে মিলিন্দ বললেন, 'ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আমাদেরই মধ্যে একজনকে এই গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে, যাতে শাট্‌লের বিপরীত দিকে জন্তুটা তাকে তাড়া করে যায়, আর সেই ফাঁকে বাকি চারজন যাতে শাট্‌লে গিয়ে উঠতে পারে। কে সেই দায়িত্ব নেবে, সেটা আমি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, কেমন ?'

সঙ্গীদের কেউই কোনও কথা বলল না। কারও দৃষ্টিতে লেশমাত্র ভয় নেই। সকলেই মিটিমিটি হাসছে। মিলিন্দ বললেন, 'ব্যস, তাহলে ওই কথাই রইল। আমি ডিল করছি। সবচেয়ে কম দরের তাস যার ভাগ্যে উঠবে, তাকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। সে নিজে হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু তারই জন্যে যে বাদবাকিরা বেঁচে যাবে, এটাই হচ্ছে বড় কথা।'

পিটার জ্যাকসনই প্রথম তার তাস তুলল। রুহিতনের সাহেব। পিটার

বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না।'

ইদি ওকাবু বলল, 'আমি পেয়েছি হরতনের দশ। মনে হচ্ছে, আমিও এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম।'

রোবের সুস্তেল বলল, 'আমি পেয়েছি হরতনের বিবি। ক্যাপ্টেন, দেখা' যাচ্ছে, আমার মৃত্যুও আপাতত মুলতুবি রইল।'

মালাকানু বলল, 'আমি পেয়েছি ইস্কাবনের পাঁচ। সঙ্গীদের বাঁচাবার দায়িত্ব দেখছি আমাকেই নিতে হবে।'

সবশেষে তাস তুললেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর, তাসখানাকে ভাল করে দেখে নিয়ে পকেটে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'না মালা, সম্মানটা তোমার কপালে জুটল না। তোমাদের বাঁচাবার দায়িত্ব দেখছি আমাকেই নিতে হল। আমি পেয়েছি চিড়িতনের তিরি।'

কথাটা বলেই মিলিন্দ চটপট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রোদ্দুর পড়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোমরা উঠে পড়ো। আমি পাহাড়ের দিকে ছুটব। জন্তুটা নিশ্চয় তাড়া করবে আমাকে। তোমরাও তৎক্ষণাৎ উলটো দিকে দৌড় লাগিয়ে শাট্‌লে উঠে পড়বে। বিদায়।'

হিংস্র জন্তুটার পেটের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর জন্তুটা তাঁকে তাড়া করতেই বাদবাকি চারজনও গুহা থেকে বেরিয়ে এসে উলটো-পথে শাট্‌লের দিকে ছুট লাগাল।

শাট্‌লে উঠেই স্টিয়ারিং হুইল হাতে নিল মালাকানু। তারপর, ছোট্ট মহাকাশযানটিকে মাটি থেকে ফুট-কুড়ি ওপরে তুলে, কমিউনিকেশন চ্যানেলে মুখ রেখে তার তিন সঙ্গীকে বলল, 'দলের নেতাকে ফেলে রেখে এক্ষুণি আমরা টাইটান মহাকাশযানে ফিরে যাব না। ক্যাপ্টেন যেভাবে ওই জন্তুটার থাবা এড়িয়ে ছুটছে, তাতে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। যদি বেঁচে যায়, তাহলে যেমন করেই হোক, এই শাট্‌লে ওকে তুলে নিতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিন্দের পিঠের ওপরে এসে পড়ল জন্তুটার থাবা। একটা ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। মিলিন্দ বুঝতে পারলেন, জন্তুটার নখ তাঁর পিঠের চামড়ায় বসে যায়নি বটে, কিন্তু তাঁর পোশাকটা তার বাঁকানো নখে আটকে গেছে। পরক্ষণেই জন্তুটার থাবা তাঁকে মাটি থেকে অন্তত দশ ফুট ওপরে তুলে ফেলল।

পিটার বলল, 'জন্তুটা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে খাদের ধার দিয়ে ছুটছে।'

রোবের বলল, 'ক্যাপ্টেন ওর থাবা থেকে যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝুলছে।'

ইদি বলল, 'মালাকানু, পাহাড়টাকে চক্কর মেরে আমাদের শাট্‌লটাকে ওই খাদের দিকে নিয়ে চলো।'

পিটার বলল, 'এখন তো আমরা নিরস্ত্র নই। শাট্‌লটাকে ওই জন্তুর মুখোমুখি করে দিয়ে শূন্যে একেবারে স্থির করে ভাসিয়ে রাখো। আমি আমার

লেসার-গান চালাব।’

মালাকানু বলল, ‘শাট্‌লটাকে আমি ওর মুখোমুখি নিয়ে ভাসিয়ে রাখছি। কিন্তু পিটার, তুমি কিংবা রোবের লেসার-গান চালিয়ো না। ইদির মাথা তোমাদের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা, টিপও তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল। ওকেই লেসার-গান চালাতে দাও।’

শাট্‌ল ততক্ষণে পাহাড়টাকে চক্কর দিয়ে খাদের ধারে জন্তুটার মুখোমুখি এসে পড়েছে। স্পিড কমানোর হাতলটাকে একেবারে জিরোর দিকে ঠেলে দিয়ে মালা সেটাকে পুরোপুরি স্থির করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখল। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড। তারপরেই ইদি ওকাবু টিপে দিল তার লেসার-গানের বোতাম।

বিশাল সেই জন্তুর শরীর তৎক্ষণাৎ ভীষণভাবে কেঁপে উঠল একবার। তারপরেই সে আছড়ে পড়ে গেল বার্বেরিসের চাঁদের এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপরে। আর ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক সেই মুহূর্তেই তার থাবা থেকে ছিটকে বেরিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেলেন। পড়তে-পড়তেই দু-হাত বাড়িয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি, তা নইলে আর মালাকানুর ঝুলিয়ে-দেওয়া দড়িটা ধরে তিনি শাট্‌লে উঠে আসতে পারতেন না।

তার খানিক বাদেই শাট্‌ল টাইটান মহাকাশযানে ফিরে আসে। ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে অর্ধচেতন অবস্থায় টাইটানের সিক-রুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ হল কয়েকদিন আগের কথা। ইতিমধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁকে সিক-রুম থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তার আগে টাইটান মহাকাশযানের কমান্ডার নোগিচো মাশাতাসি তাঁর সঙ্গে দরকারি দু-একটা কথা বলতে চান।

মাশাতাসি বললেন, ‘মিলিন্দ, কথাটা আর কিছুই নয়। তোমার বয়েস হয়েছে, তাই ঠিক হয়েছিল যে, কাজ থেকে অবসর নিয়ে তুমি এবারে পৃথিবীতে ফিরে যাবে। তুমি জানো, যে-ধরনের বিপজ্জনক কাজ আমাদের অনুসন্ধানী দলগুলিকে করতে হয়, পঞ্চাশের পরে আর তার দায়িত্ব কাউকে দেওয়া চলে না। কিন্তু তোমার টিমে যে নেক্সট ইন কমান্ড, সেই পিটার জ্যাকসন টাইটানে ফিরে যে-রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে বুঝতে পারছি, বয়স যা-ই হোক, এক্ষুণি তোমাকে রিটায়ার করতে দেওয়া ঠিক হবে না। তোমার টিমও তোমাকে ছাড়তে আদৌ রাজি নয়। তাই আমাদের ইচ্ছে, আরও অন্তত কয়েকটা বছর তুমি কাজ চালিয়ে যাও।’

কমান্ডার মাশাতাসি বেরিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার একটু পরেই বেরিয়ে এলেন সিক-রুম থেকে। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পার হয়ে এলেন লম্বা করিডর। তারপর ৫০৩ নম্বর ঘরে এসে ঢুকলেন। টাইটান মহাকাশযানে এটাই তাঁর নিজের ঘর।

ভেবেছিলেন, ঘরে কেউ থাকবে না। তাই মিলিন্দ একটু অবাক হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন যে, ইদি, পিটার, রোবের আর মালা তাঁর ঘরে বসে গুলতানি করছে। তাদের সামনে, টেবিলের ওপরে এক প্যাকেট তাস ছড়ানো।

মিলিন্দকে দেখে তারা আনন্দে হইহই করে উঠল। মিলিন্দ কিন্তু একটুও হাসলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাস খেলছ কেন ? টাইটানে যে তাস খেলা নিষিদ্ধ, তা তোমরা জানো না ?'

শুনে মুচকি হাসল সবাই। পিটার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মালা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন, একান্নটা তাস দিয়ে কি খেলা যায় ? প্যাকেটে মোট বাহান্নটা তাস থাকবার কথা, কিন্তু এই প্যাকেটে দেখছি একান্নটা রয়েছে। বাকি তাসটা তোমার পকেট থেকে তুমি বার করে দেবে ?'

মিলিন্দ বললেন, 'তার মানে ?'

'মানে আর কিছুই নয়,' মালা বলল, 'যে-তাসটা এখানে পাচ্ছি না, সেটা হল ইস্কাবনের টেক্কা। সবচেয়ে বেশি দামের তাস। গুহার মধ্যে যখন তাস বাঁটা হয়, তখন এটাই তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু এটাকে তুমি পকেটে ঢুকিয়ে রেখে অম্লানবদনে বলেছিলে যে, চিড়িতনের তিরি পেয়েছ। কেন বলেছিলে, তাও আমরা জানি। আমি পেয়েছিলুম ইস্কাবনের পাঁচ। তাই গুহা থেকে বেরিয়ে আমারই মৃত্যুবরণ করার কথা। কিন্তু তুমি··· শুধু আমাকে কেন, দলের কাউকেই তুমি মৃত্যুবরণ করতে দিতে চাওনি। আর তাই··· মিথ্যে কথা বলে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে তুমি নিজেই সেদিন মৃত্যুবরণ করবার জন্যে গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলে। তাই না ? দাও, ক্যাপ্টেন, পকেট থেকে এবার ইস্কাবনের টেক্কাটা বার করে দাও।'

মিলিন্দ চুপ করে রইলেন। অবসর নিয়ে পৃথিবীতে ফেরা হয়নি বলে এখন আর তাঁর সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছিল না। কোথায় ফিরবেন তিনি ? ছেলের কাছে ? ইদি, পিটার, রোবের আর মালার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হচ্ছিল, এরাই তাঁর ছেলেমেয়ে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ঘটোৎকচের জাগরণ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



সেহরাগড় ফরেস্ট বাংলোয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম ডঃ আর. পি. গুপ্টা। তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ।

প্রথমে চোখে পড়েছিল ওঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য। অত লম্বা মানুষ গিনেস রেকর্ড বইতে এখনও উল্লিখিত হননি বলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু আক্ষেপ করেছিলেন। তাই শুনে ডঃ গুপ্টা হাসতে-হাসতে বললেন, 'কী দরকার? আসলে কী জানেন, নিজের এই লম্বা হওয়া নিয়ে আমার নিজেরই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে বেরুলে সাড়া পড়ে যায়। যেখানে যাই, পিছনে ভিড়। তার ওপর সমস্যা হল, দরজার মাপ। কোনও বাড়িতে ঢুকতে হলে প্রতিমুহূর্তে আমাকে নিজের উচ্চতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় মনেও থাকে না কথাটা এবং মাথায় ঠোক্কর খাই। এই দেখুন না, কী অবস্থা হয়েছে?'

কপালে অনেক কালো ছোপ দেখে সমস্যাটা হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম। বললাম, 'আপনার এই দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থটাও যদি বাড়ত, তাহলে লোকেরা আপনাকে ভয়ও পেত।'

ডঃ গুপ্টা বললেন, 'রক্ষে করুন, মশাই। তাহলে লোকেরা আমাকে ঘটোৎকচ বলতে শুরু করত। কী বলেন, কর্নেল?'

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়ি টানাটানি করছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা ডঃ গুপ্টা, কবে থেকে আপনি লম্বা হতে শুরু করেছেন?'

ডঃ গুপ্টা কর্নেলের কথায় অবাক হলেন যেন।

'তা তো লক্ষ করিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, মাস তিনেক আগে একদিন ভোরবেলা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগল মাথায়। তখন···মাই গুডনেস!'

উনি আরামকেদারা থেকে সোজা হলেন হঠাৎ। কর্নেল বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আমার মতো বোকা দেখছি পৃথিবীতে নেই।' ডঃ গুপ্টা মুখে হতাশার ভাব

ফুটিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য ! সত্যি তো, ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত ছিল আমার। ওই প্রথম মাথায় ঠোক্কর খাওয়ার আগের দিন সম্ভবত আমার উচ্চতা প্রায় স্বাভাবিক ছিল।... হ্যাঁ, স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তার আগে তো বাথরুম কেন, কোনও ঘরের দরজার সামনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়নি। কর্নেল, এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ করতে ভুল হয়ে গেছে দেখছি।'

কর্নেল ওঁকে যেন আশ্বস্ত করতে চেয়েই বললেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞ মানুষই নিজের সম্পর্কে অসচেতন। ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের একটু হেরফের ঘটলে মানুষ বামন কিংবা দৈত্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিও এসে যায়।'

ডঃ গুন্টা আস্তে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমার বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন হয়ে এল। এই বয়েসে হঠাৎ আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কেন এ-খেল দেখাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি অনেকের তুলনায় একটু লম্বা ছিলাম ছেলেবেলা থেকেই। হঠাৎ একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটল। আমি রাতারাতি সাত ফুট উঁচু হলাম। অথচ খেয়াল পর্যন্ত করলাম না। কর্নেল, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যাই।'

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজা দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে। আমিও।

ডঃ গুন্টা উঠেছিলেন পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে সে-ঘরের দরজায় তালাবন্ধ দেখলাম। বললাম, 'কর্নেল, ডঃ গুন্টা কি বাংলো ছেড়ে চলে গেলেন নাকি !'

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। বললেন, 'চলো জয়ন্ত, সেহরাগড় ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসি।'

এই বাংলোটা একেবারে সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলার গায়ে ! নীচে ছোট্ট এক নদী। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বন-জঙ্গল শুরু। দুর্গে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল। প্রকৃতিবিদ দুর্গের ওপর থেকে বাইনোকুলারে কী পাখি দেখতে পেয়ে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেওয়ালের ওপর বসে আমি নীচের জঙ্গলের শোভা দেখতে থাকলাম।

কতক্ষণ পরে পিছনে কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি, ডঃ গুন্টা একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে টানাটানি করছেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ডঃ গুন্টা চাপা হুঙ্কার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দু-হাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নীচে ছুঁড়ে ফেললেন। নীচে বিকট শব্দ করে পাথরটা পড়ল এবং গড়াতে-গড়াতে চলল। ডঃ গুন্টা হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। মুখের চেহারায় কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ

করে আমার অস্বস্তি হল। বললাম, 'ডঃ গুপ্টা, আপনি দেখছি সুপারম্যানও বটে !'

ডঃ গুপ্টা আমার কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, 'মিঃ চৌধুরি, আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলি !'

আঁতকে উঠে বললাম, 'সে কী ! না—না। দয়া করে ইচ্ছেটা একটু সামলে রাখুন, মশাই !'

'আমাকে ঘটোৎকচ মনে হচ্ছে না আপনার ?'

'হচ্ছে। খুব হচ্ছে। আপনি ঘটোৎকচই বটে !'

ডঃ গুপ্টা ফিকফিক করে হাসতে-হাসতে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে ?'

'পেয়েছি বইকি ! আপনি অমন প্রকাণ্ড পাথরটা যেভাবে ছুঁড়ে ফেললেন !'

'আরও শক্তি দেখবেন নাকি ?' বলে ডঃ গুপ্টা দুর্গের উঁচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দু-হাতে ঠেলতে শুরু করলেন। প্রকাণ্ড পাঁচিলটা সশব্দে ভেঙে পড়ল।

আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে, পালিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরাপদ পথ খুঁজছি। ডঃ গুপ্টা ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আগের মতো দু-হাতের ধুলো-ময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি—কিন্তু কেমন অস্বাভাবিকতাও ফুটে আছে।

হঠাৎ উনি ফের চাপা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মারলেন এবং ওই লাফে অন্তত ফুট বিশেক উঁচু ফটকের মাথায় পৌঁছে গেলেন।

অমনই আমি নিচু পাঁচিলের ভাঙা অংশটা পেরিয়ে নামতে শুরু করলাম। এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অজস্র পাথর আর ঝোপ-জঙ্গলে ভরতি। ভাগ্যিস নীচের গভীর গড়খাইটা শুকনো ছিল। হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারে উঠতেই প্রকৃতিবিদের দেখা পেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'ডঃ গুপ্টা সুপারম্যান হয়ে গেছেন ! কীসব সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছেন, দেখলে বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাবে !'

কর্নেল কিন্তু হাসছিলেন। বললেন, 'এখান থেকে বাইনোকুলারে আগাগোড়া সবটাই আমি দেখেছি, ডার্লিং। তবে ডঃ গুপ্টাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'নেই মানে ? আমাকে ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছে করছে বলেছিলেন !'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'সেই গল্পটা জানো তো ? এক পাগল যাচ্ছেতাই পাগলামি শুরু করেছে। একটা লোক যেই বলেছে, ওরে ! দেখিস, যেন ঢিল ছুঁড়িস না—অমনই পাগল বলে উঠল, বাঃ ! মনে পড়িয়ে দিয়েছে রে ! বলে সে তখন ঢিল ছুঁড়তে লাগল। ডঃ গুপ্টাকে আমরা হয়তো ওইরকম মনে পড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, এসো—বাংলোয় ফেরা যাক।'

★



ডঃ গুণ্টা চাপা হুঙ্কার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দু-হাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নীচে ছুঁড়ে ফেললেন।

বিকেলে লনে বসে আছি কর্নেলের সঙ্গে, সেই সময় ডঃ গুন্টাকে ফিরতে দেখলাম। হাসিমুখে সম্ভাষণ করে বললেন, 'সেহরাগড় ফরেস্টকে জব্দ করে এলাম, কর্নেল! শ'খানেক শালগাছ উপড়েছি। একটা বাঘকে ছাতু করে দিয়েছি। একটা দাঁতাল হাতিকে আধমরা করে দিয়েছি। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে। আর, ফোর্টের অবস্থাটাও দেখে আসুন গিয়ে। একখানা দেওয়ালও আস্ত নেই।'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া? চৌকিদারকে আপনার খাবার টেবিলে রাখতে বলেছিলাম। দেখুন তো!'

ডঃ গুন্টা বললেন, 'আরে তাই তো! আমার খিদে পেয়েছে যে! আমি খাব—প্রচুর।'

তারপর ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়লেন। কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, 'মাথায় ঠোক্কর লাগবে, ডঃ গুন্টা।'

ডঃ গুন্টা তক্ষুণি নিচু হয়ে বারান্দায় উঠলেন এবং দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর মিনিট দুই হয়েছে, পরদা তুলে চৌকিদারকে ডাকতে থাকলেন। চৌকিদার এসে বলল, 'হুজুর!'

'এটুকু খানা তুমি আমার জন্যে রেখেছ? আমি কি মাছি, না পিঁপড়ে?'

চৌকিদার বেজার মুখে বলল, 'আর তো কিছু নেই, হুজুর।'

'চলো দেখি, তোমার কিচেনে কী আছে।'

ডঃ গুন্টা কিচেনের দিকে গেলেন। চৌকিদারও গুটিসুটি পিছনে-পিছনে গেল। কিন্তু একটু পরে সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে: 'হুজুর! হুজুর! উনি আদমি না রাক্ষস? বাপরে বাপ! চাল, ময়দা, সবজি, যা ছিল—সব আস্ত গিলে খাচ্ছেন যে! একটা ব্যবস্থা আপনারা করুন, হুজুর!'

ডঃ গুন্টার হাঁক শোনা গেল, 'চৌকিদার! চৌকিদার!'

চৌকিদার চাপা গলায় বলল, 'দোষ-গলতি মাফ করবেন হুজুর। আমি এখন ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে চললুম।'

বেচারা চৌকিদার প্রায় লেজ তুলে দৌড়নোর মতো গেট দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

তারপর কিচেনের দিক থেকে ডঃ গুন্টা বেরিয়ে এলেন। মুখে একরাশ ময়দা লেগে আছে। বললেন, 'এ কী বিচ্ছিরি খিদে বলুন তো, কর্নেল! ইচ্ছে করছে, আপনাদেরও খেয়ে ফেলি।'

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'জঙ্গলে গিয়ে হরিণ-টরিন ধরে খান, ডঃ গুন্টা। কী আর করবেন!'

ডঃ গুন্টা সঙ্গে-সঙ্গে পা বাড়ালেন। বললেন, 'আরে, তাই তো বটে!' বলে মাটি কাঁপিয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণের ধারে উঁচু বেড়া মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'কর্নেল! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে! চলুন,

এখান থেকে চলে যাই আমরা। এ যে সত্যি ঘটোৎকচের কাণ্ড বেধে গেল।'

কর্নেল শুধু হাসলেন। আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না।

ঘন্টা দুই পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাংলোয় বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মশার বড্ড জ্বালাতন। তাই আমরা ঘরে বসে আছি। ডঃ গুন্টার আর পাত্তা নেই। বলছিলাম, 'এতক্ষণে হয়তো জঙ্গলের সব হরিণ ওঁর পেটে চলে গেল।'

এমন সময় জিপের শব্দ হল বাইরে।

দুজন ফরেস্ট অফিসার আর একদল গার্ড হন্তদন্ত এসে গেলেন। রেঞ্জার সাহেব আমার চেনা। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'কর্নেল! এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আপনার পাশের ঘরের সেই লম্বা ভদ্রলোক...'

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, 'বুঝেছি। জঙ্গলে হরিণের পাল সাবাড় করে বেড়াচ্ছেন।'

রেঞ্জার বললেন, 'দুঃখের কথা, আমরা ওঁকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছি।'

'সে কী!'

'গুলি না করে উপায় ছিল না। উনি একজন ফরেস্ট গার্ডকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য, কর্নেল! লোকটা একেবারে নরদানব কিং কং বললেই চলে।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ঠিকই করেছেন। তা না হলে এবার ভদ্রলোককে আটকানো কঠিন হত। ক্রমশ ওঁর ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর শক্তি জেগে উঠছিল। এরপর জঙ্গল ছেড়ে হয়তো উনি বসতি এলাকায় গিয়ে ঢুকতেন। তারপর আরও বীভৎস ঘটনা ঘটত।'

কথা থামিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন: 'চলুন তো, ওঁর ডেডবডিটা দেখে আসি।'

জিপে চেপে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। মাইল দুই এগিয়ে বাঁদিকে এক জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল। রেঞ্জার বললেন, 'ওই যে, ওখানে। ডেডবডির পাহারায় দুজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

কাঠকুটো জ্বেলে লোক দুটো আসলে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের দেখে সাহস ফিরে পেল। তারা বন দফতরেরই কর্মী। একজনের হাতে একটা বন্দুক, অন্যজনের হাতে নিছক বল্লম। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। একটু তফাতে দলা-পাকানো রক্তাক্ত একটা লাশ পড়ে ছিল। রেঞ্জার টর্চের আলোয় সেটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা ফরেস্ট গার্ড মণি সিং-এর ডেডবডি। কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।'

কর্নেল বললেন, 'ডঃ গুন্টার ডেডবডি কোথায়?'

রেঞ্জার পা বাড়িয়ে বললেন, 'আসুন, দেখাচ্ছি।'

জায়গাটা খোলামেলা। একটু এগিয়ে টর্চের আলোয় একটা ছোট্ট নদী দেখা গেল। বালি আর পাথরে ভরতি। রেঞ্জার অবাক হয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! ডেডবডিটা কোথায় গেল। জানোয়ারে টেনে নিয়ে গেল না তো?'

বালির ওপর একটু রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে বললেন, 'নাঃ। টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু··· আশ্চর্য তো!'

'কী, কর্নেল?'

'মনে হচ্ছে, ডঃ গুন্টা মারা যাননি। দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।'

'অসম্ভব! গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। দেহে প্রাণ ছিল না। দুটো গুলিই হার্টে লেগেছিল।'

যে-দুটি লোক পাহারায় ছিল, তাদের একজন বলল, 'কী একটা শব্দ শুনেছিলুম, কিছুক্ষণ আগে। টর্চ জ্বেলে কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি।'

অন্য লোকটি বলল, 'আমি ভেবেছিলুম কোনও জানোয়ার।'

রেঞ্জার তাদের খুব বকাবকি করলেন। তারা আমতা-আমতা করছিল। বুঝতে পারছিলুম, ওদের বকাবকি করা বৃথা। বেচারারা ভয়ে আধমরা হয়ে বসে ছিল। যদি দেখত, ডঃ গুন্টার মড়া হেঁটে যাচ্ছে, তাদের ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

কর্নেল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীর ওপার পর্যন্ত গেলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারপর কঠিন পাথুরে মাটিতে আর কোনও ছাপ দেখা গেল না। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'সেহরাগড় টাউনশিপের লোকেদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।'

ফরেস্ট বাংলোয় ফিরে এ-রাতে আর অন্ধকার বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মন ছিল না। তাছাড়া মশার খুব উৎপাত, সে-কথা আগেই বলেছি।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছিলুম। কর্নেলের নাক ডাকছিল যথারীতি।

একসময় হঠাৎ বাইরে কী একটা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল। অমনই কর্নেলের নাক ডাকাও থেমে গেল। ওঁর ঘুম বরাবর পাতলা। ওদিকে পাশের ঘরে কেউ যেন চুপিচুপি তালা খুলছে। তারপর সাবধানে দরজা খুলল। কর্নেলের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর টেবিলবাতিটা জ্বলে উঠল। ফিসফিস করে বললুম, 'কর্নেল! পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল।'

কর্নেলও ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ!'

উনি বারান্দার দিকের জানলার পরদা তুলে উঁকি দিলেন। আমিও ওঁর কাছে গিয়ে উঁকি দিলুম। বারান্দায় আলো আছে। একটু পরে শিউরে উঠে দেখি, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ডঃ আর. পি. গুন্টা। হাতে একটা

প্রকাণ্ড সুটকেস। পোশাকে ধুলো-ময়লা আর চাপ-চাপ রক্ত লেগে আছে। বারান্দা থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে চলে গেলেন।

কর্নেল বললেন, 'যাকগে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাবে।'

বললুম, 'রহস্যটা কিন্তু শেষপর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল, কর্নেল।'

কর্নেল একটু হাসলেন : 'তা ঠিক। তবে যা আশঙ্কা করেছিলুম, সম্ভবত তত কিছু ঘটবে না। কারণ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সেই দানব শেষপর্যন্ত দানবই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ডঃ গুন্টাকে দেখলুম, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো নিজের জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন। তার মানে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওঁর এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই সাব্যস্ত করেছেন।'

পরদিন আমরা জঙ্গল থেকে সেহরাগড় টাউনশিপে ফিরে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে ফৈজাবাদ। কলকাতা ফেরার ট্রেন রাত বারোটা নাগাদ। একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল হঠাৎ বললেন, 'চলো জয়ন্ত, ডঃ গুন্টার খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'সর্বনাশ ! উনি কি ফৈজাবাদের লোক নাকি ?'

'বাংলোর খাতায় সেই ঠিকানাই তো জেনেছি।'

'কিন্তু...'

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার ধারণা, ডঃ গুন্টা এখন আর নরদানব বা ঘটোৎকচ হয়ে নেই। কাজেই ওঁকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। হয়তো ভুলটা আমারই। আমি ওঁকে সচেতন করে দেওয়াতে ওইসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে সেই পাগলের গল্পটা বলেছিলুম, আশা করি মনে আছে। কোনও কারণে মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এলে তাকে উত্ত্যক্ত করা উচিত নয়।'

রাত এখন প্রায় ন'টা। কিন্তু ফৈজাবাদ ছোট্ট শহর। ডঃ গুন্টাকে সবাই চেনে—সেটা উনি লম্বা মানুষ বলেই। শেষদিকে একটা টিলার গায়ে একটা পুরনো গড়নের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালা তার গেটের কাছে নামিয়ে দিল আমাদের। লন পেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যেন জনমানুষ নেই। অস্বাভাবিক স্তব্ধ পরিবেশ। তবে আলো দেখা যাচ্ছিল একটা ঘরে।

দরজার বোতাম টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল। সেই অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা মানুষ, চেনা মুখ। অমায়িক হেসে বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা ?'

আমি তো অবাক ! কর্নেল নমস্কার করে বললেন, 'আপাতত আসছি সেহরাগড় থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, ডঃ গুন্টা।'

ডঃ গুন্টা ভুরু কুঁচকে কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, 'সেহরাগড় ! সেখানে তো একটা জঙ্গল আছে শুনেছি। যাকগে, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢুকে আমরা বসলুম। ডঃ গুন্টাও বসলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় লক্ষ করছিলুম। কর্নেল বললেন, 'ডঃ গুন্টা, আপনার প্রজেক্ট যে সাকসেসফুল সেই

কথাটা বলতে এসেছি—যদিও দেশের আইনে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন।'

ডঃ গুন্টা চমকে উঠলেন : 'কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনার ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি সেহরাগড় জঙ্গলে বীভৎস কাণ্ডকারখানা করেছে, জানেন কি ?'

ডঃ গুন্টা নড়ে বসলেন : 'মাই গুডনেস।'

'হ্যাঁ। এক ডজন হরিণ, একটা বাঘ আর একজন ফরেস্ট গার্ডকে আপনার ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি খুন করে ফেলেছে। অসংখ্য গাছ উপড়ে ফেলেছে। সেহরাগড় কেল্লাটা ভাঙচুর করেছে। এমনকি একটা দাঁতাল হাতিকেও মারাত্মক জখম করেছে।'

ডঃ গুন্টা দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু আপনি একজন বায়োফিজিসিস্ট। আপনি জানতেন, আপনার ফ্যান্টম প্রজেক্টের পরিণতি সাঙ্ঘাতিক হতে পারে।'

ডঃ গুন্টা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, মাসতিনেক আগে হঠাৎ আমার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর কী-কী ঘটেছে, এখন একটুও মনে নেই।'

'আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না, ডঃ গুন্টা।'

ডঃ গুন্টা হঠাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঝনঝন দুমদাম প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার, কর্নেল ?'

কর্নেল হাসলেন, 'ল্যাবরেটরি ভাঙছেন। প্রমাণ লোপের চেষ্টা। যাই হোক, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, জয়ন্ত। চলো, আমরা কেটে পড়ি।'

স্টেশনে পৌঁছে বললুম, 'ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো ?'

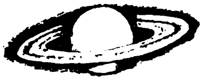
কর্নেল বললেন, 'প্রতিবস্তুর কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। মানুষের ব্যক্তিসত্তার তেমনই কোনও প্রতিরূপ আছে কিনা, এ নিয়ে বায়োফিজিসিস্টরা গবেষণা করেছেন। কতকটা ডঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের ব্যাপারটা যেমন। তবে ওই প্রতিরূপ ফ্যান্টম অস্তিত্ব কোনও মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রের একেবারে উলটো না হতেও পারে। আমাদের মধ্যে একটা করে প্রতি-মানুষ আছে। সে অসম্ভব শক্তিমান। তাকে দিয়ে যেমন ভাল কাজ করানো যায়, তেমনই খারাপ কাজও করানো যায়। কাজেই ওই ফ্যান্টম-প্রতিমূর্তিকে তুমি ঘটোৎকচ বলতেও পারো। ভুলে যেয়ো না, মহাভারতের ঘটোৎকচ একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তবে অতিমানুষ। তাকে জাগালে ভাল বা মন্দ, দুই-ই ঘটতে পারে।'

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। তাই বললুম, 'নিকুচি করেছে ফ্যান্টমব্যাটার। তাকে জাগিয়ে আর কাজ নেই।'

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

বেলুন-পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনী

অদ্রীশ বর্ধন



এ-কাহিনীকে সত্যি কাহিনী বললে টিটকিরি শুনতে হবে। তার চাইতে বরং বিচিত্র কাহিনী বলা যাক। অথবা আজগুবি কাহিনী।

ছোটনাগপুরের জঙ্গলে এমন অনেক অঞ্চল আছে, যা এখনও দুর্গম। এমন অনেক পাহাড় আছে, যা এখনও অজ্ঞাত। বেলুন-পাহাড় তেমনই একটা পাহাড়।

বিচিত্র গড়নের পাহাড়। ঠিক যেন একটা বাটি। বাটির গোলাকার কিনারা হল পাহাড়ের চূড়া। বাটির ভেতরে গভীর জঙ্গল। সেখানে রক্তপলাশের আগুন-হাসি আর মহুয়ার মাতাল-করা বন্যা। লতায় পাতায় সে-অরণ্য এত নিবিড় যে, পাহাড়-চূড়া থেকে দেখলেই জঙ্গলে প্রবেশের আর সাধ থাকে না। মাঝে-মাঝে শোনা যায় ধনেশ পাখির ডাক। শম্বর হরিণের রব।

পাহাড়ি অঞ্চলে কত পাহাড়ই না থাকে! নাম থাকে না কারও। এ-পাহাড়েরও নাম ছিল না। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, রাতারাতি একটা নাম অর্জন করে বসল অখ্যাত সেই পাহাড়।

চাঁদনি রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠেছে গহন অরণ্য। বনজ্যোৎস্নার এ-রূপ যে না দেখেছে, সে কল্পনা করতে পারবে না।

সাঁওতালদের প্রাণে পুলক জেগেছে চাঁদের আলোয়। আকণ্ঠ মহুয়া খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়েছে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে। হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করেছে গাঁয়ের চত্বরে। সেইসঙ্গে বাজছে মাদল : দ্রিমি—দ্রিমি—দ্রিমি। চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে ওদের কালো কষ্টিপাথরের মতো অঙ্গ বেয়ে। ওরা ঝকঝকে দাঁতে হাসছে, নেশায় আবিল স্বরে গাইছে, আর স্খলিত চরণে নাচছে।

ঠিক এমনই সময়ে তারার চুমকি বসানো ঝিকিমিকি আকাশে দেখা গেল একটা বিচিত্র নক্ষত্র। অগুনতি নক্ষত্রের মধ্যে থেকেও এ যেন অন্য জগতের নক্ষত্র। কারণ এর গতি আছে।

ঝিকমিকে তারার মতই এককণা একটা বস্তু। অথচ তারা নয়। তারা মিটমিট করে, কিন্তু সরে-সরে যায় না। উল্কাও নয়। উল্কা হলে চক্ষের

নিমেষে খসে পড়ে আকাশপথে।

কিন্তু আশ্চর্য এই বস্তুটি অতি ধীর গতিতে নামছিল নীচের দিকে। নামছিল বিরামবিহীন ভাবে। এবং মুহূর্তে-মুহূর্তে বিপুল হতে বিপুলতর হচ্ছিল তার আয়তন।

প্রথমে যা ছিল হিরের কুচির ঝিকিমিকি, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা পরিণত হল হিরের ডেলায়। দেখতে-দেখতে আরও বৃহৎ হল তার আকার। এখন আর হিরের ডেলা নয়—যেন একটা হিরের ফানুস।

নাচে মত্ত সাঁওতালদের চোখকেও এবার আর ফাঁকি দেওয়া গেল না। বিস্ফারিত হল ওদের বিহ্বল চক্ষু। কানাকানি হল অস্ফুটকণ্ঠে, 'চাঁদ নামছে...চাঁদ নামছে!'

অর্থাৎ আকাশের চাঁদ ধরায় অবতীর্ণ হচ্ছে! কিন্তু তাও তো সত্যি নয়! পূর্ণিমার হাসিখুশি চাঁদ ওই তো ঝুলছে কালো আকাশে। এ তবে কোন চাঁদ? পৃথিবীর আকাশে দু-দুটো চাঁদ কি সম্ভব?

বিশাল বস্তুটা ভাসতে-ভাসতে আরও নেমে এল। চাঁদ বলে তো মনে হচ্ছে না! এ তো একটা অতিকায় বল...পেল্লায় বর্তুল...দারুণ ঝকমকে...এমন ঝকমকে যে, ঠিকরোনো চন্দ্রকিরণে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতে চাইছে।

এবার ভয় পেল সাঁওতালের দল। ঝুলে পড়ল চোয়াল। ছুটে গেল নেশা। দু-চোখ চেপে কেউ পড়ল শুয়ে, কেউ হল নতজানু, কেউ দিল চম্পট।

বিশাল বলটা আরও নেমে এল। শব্দহীন ধীর স্থির গতিবেগে ভাসতে লাগল পাহাড়চূড়ায়। চাঁদের আলোয় তার হিরের মতো ঝকঝকে আবরণে মনে হল যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

সে যে কত বড় বল তা আন্দাজ করতে গেলে নাকি মাথা ঘুরে যায়। মস্ত-মস্ত প্রাচীন শালতরুর একটা ছোটখাট জঙ্গল নাকি অনায়াসে সেঁধিয়ে যেতে পারে বলের উদরে।

গাঁয়ের মোড়ল হাঁ হয়ে দেখছিল ভাসন্ত বলের আলোময় চেহারা। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখতে হল না। আচম্বিতে রঙ পালটাতে লাগল সাদা বলের। দেখতে-দেখতে সিঁদুরে হয়ে গেল ভাসন্ত গোলা। রক্তের মতো টকটকে সেই রঙ দেখে রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল মোড়ল বেচারার। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে-কাঁপতে বন্ধ করেছিল চোখ।

চোখ খুলেছিল সেকেন্ডকয়েক পরেই। খুলে দেখেছিল উধাও হয়ে গিয়েছে রক্তাক্ত বল। আকাশ ফাঁকা।

সেই থেকে পাহাড়টার নাম হয়ে গেল বেলুন-পাহাড়। মোড়ল লোকটা নিরক্ষর নয়। পেটে বিদ্যে ছিল কিছু। ফানুস বা বেলুন বলতে কী বোঝায়, তা জানত। পাহাড়চূড়ায় ভৌতিক বেলুনের আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান—দুটো ঘটনাই সে মনে রাখতে চেয়েছিল পাহাড়ের নাম বেলুন-পাহাড় রেখে।



সাঁওতালদের প্রাণে পুলক জেগেছে চাঁদের আলোয়।...হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করেছে...। চাঁদের আলো পিছলে যাচ্ছে ওদের...অঙ্গ বেয়ে।

★

সংক্ষেপে বেলুন-পাহাড়ের এই গেল ইতিবৃত্ত। এর পরেই আমরা আসছি মূল কাহিনীতে। সে-কাহিনী বেলুন-কাহিনীর চাইতেও লোমহর্ষক, অবিশ্বাস্য এবং আজগুবি।

কারণ, সবুজ বনশীর্ষ আর ধূসর শিখরদেশের শীর্ষে হিরের ফানুস আবির্ভূত হওয়ার ঠিক এক বছর পরে আর-এক চাঁদনি রাতে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন মুছে গেল বেলুন-পাহাড়ের আশপাশে।

সে-রাতেও উল্লাসে মেতেছিল আদিবাসীর দল। বিচিত্র শব্দে উত্তাল বনভূমি ছিল তার সাক্ষী।

আচম্বিতে নিশীথ রাত্রি খানখান হয়ে গিয়েছিল বিকট চিৎকারে। আর্তকণ্ঠের মরণ চেঁচানি একবার নয়—শোনা গিয়েছে বারবার। বনভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়েছে ভয়ার্ত কণ্ঠের কান্না। মুহুর্মুহু ছিন্ন হয়েছে কান্নার রোল—শোনা গিয়েছে অন্যত্র।

শুধু মানুষ কাঁদেনি—কেঁদেছে বনভূমির পশুরাও। তাদের কাতর গজরানিতে ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছে অরণ্যের নিথরতা।

তারপর একসময়ে স্তব্ধ হয়েছে কান্নার রোল, মুমূর্ষু গজরানি। শ্মশানের নীরবতা নেমে এসেছে বনভূমির সর্বত্র। মাঝে-মাঝে শোনা গিয়েছে ধনেশ পাখির কু-ডাক, আর বিরামবিহীন মর্মর ধ্বনি—প্রাচীন শালবীথির দীর্ঘশ্বাস। কেউ জানতেও পারল না চাঁদনি রাতে লতাপাতার রহস্যময় আবছায়া অন্ধকারে কী অবিশ্বাস্য নাটক অভিনীত হয়ে গেল।

পরের দিন বেলুন-পাহাড় ঘিরে কয়েক মাইল পর্যন্ত বনভূমিতে জীবিত প্রাণী একটিও দেখা যায়নি। নিছক মৃত হলেও কথা ছিল। কিন্তু কারা যেন সমস্ত রাত ধরে জঙ্গলের পশু আর মানুষদের নিছক নিধন করেই ক্ষান্ত হয়নি—কুচি-কুচি করে কচুকাটা করেছে। খণ্ডবিখণ্ড মৃতদেহ স্তূপাকারে জমে রয়েছে অরণ্যভূমির সর্বত্র।

মানুষ নেই—জানোয়ার নেই। রেহাই পেয়েছে কেবল উড়ন্ত পাখিরা।

রহস্যভেদ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মাথা ঘামায়নি। কুসংস্কার তাদের অস্থিমজ্জায়। পাইকারি হত্যার পিছনে বেলুন-পাহাড়ের ভুতুড়ে হাত যে আছে, তা অনুমান করে তারা আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছে। পরের দিনই তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিয়েছে ঘটিবাটি জরু-গোরু নিয়ে।

অভিশপ্ত বেলুন-পাহাড়ের সানুদেশ সেই থেকেই পরিত্যক্ত। প্রাণের মায়া সবারই আছে। সুতরাং অপদেবতার থান মাড়াতে কেউ আসেনি।

মায়াকাননের মায়া তিমিরাবৃত থেকে যেত যদি না পারমাণবিক কমিশন সার্ভে টিম পাঠাত সেখানে। সামরিক কারণে একটা গোপন অ্যাটমিক চুল্লি বসাতে হবে গহন অরণ্যে। তাই জমি পর্যবেক্ষণে এসেছিল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি।

এসেই মহা ফেসাদে পড়ল তারা। স্থানীয় অধিবাসীরা শিউরে উঠল কমিটির

অভিপ্রায় শুনে। ভুতুড়ে জঙ্গলে পুনর্বসতি! বাস্‌রে! প্রাণ থাকতে নয়!

ফলে, কেউ এল না কমিটির সঙ্গে। কমিটি ব্যঙ্গের হাসি হেসে নিজেরাই প্রবেশ করল রহস্যময় সেই অরণ্যে—প্রাণের চিহ্ন মুছে গিয়েছে যে-বনাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে।

দেখেশুনে হোমরা-চোমরা সদস্যরা ঈষৎ বিচলিত হল। যা রটে, তার কিছু বটে। এই সেদিনও যে-অঞ্চল প্রাণের চাঞ্চল্যে মুখরিত ছিল, আজ তা নিষ্প্রাণ কেন? কী আছে রহস্যময় ওই বেলুন-পাহাড়ে? চাঁদনি রাতে উড়ে আসা হিরের ফানুস নিছক মহুয়ার নেশায় দেখা মায়া মরীচিকা, না সত্য?

অতএব, গোপন রিপোর্ট যথাসময়ে পৌঁছল যথাস্থানে। তোলপাড় হল সরকারি মহল। সেখান থেকে কী সূত্রে এবং কার সুপারিশে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রর তলব পড়ল—সে-কাহিনী বলতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয়।

বেলুন-পাহাড়ের ভুতুড়ে রহস্য সমাধানে বিজ্ঞানীর তলব পড়েছে শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম, শুধিয়েছিলাম প্রফেসরকে, 'আপনি কি ভূতের ওঝা?'

ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলেছিলেন প্রফেসর, 'না হে দীননাথ, ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। শত্রুদেশের গুপ্তচরদের হাত আছে এ-ব্যাপারে, সন্দেহ করছে নয়াদিল্লি।'

'তাতেই বা আপনার কী? আপনি কি গুপ্তচর ধরার বিদ্যায় পণ্ডিত?' আমি অসহিষ্ণু।

'দুর! আমাকে ডাকা হচ্ছে ওই সাদা ফানুসের ধাঁধা সমাধানের জন্যে। তুমি যাবে?'

'কেন যাব না? এ রকম একটা থ্রিলিং ব্যাপার। কিন্তু আপনি হালে পানি পেলে হয়!'

'দেখা যাক', বলে তোবড়ানো গালে ফের খিকখিক করে হাসলেন প্রফেসর।

হাসি শুনে গভীর ভ্রূকুটি করেছিলাম। মনে-মনে বলেছিলাম, বড় দেমাক হয়েছে বুড়োর। ভূতের মার খেয়ে এবার কেরামতি ঘুচবে তোমার।

নিয়তি অলক্ষ্যে তখন হেসেছিলেন। কেননা ভূতপ্রেতের চাইতেও কিম্ভূতকিমাকার যাদের সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম, তারা মানুষ নয় সত্যিই। কোন লোকের জীব, তা এখনও অজ্ঞাত।

সরষেপোড়ায় নাকি ভূত পালায়। কিন্তু সৈন্যসামন্ত, ট্যাঙ্ক, কামান নিয়ে ভূতের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার নজির কোনওদিন শুনিনি। দেখলাম সেই প্রথম। দেখে তো চক্ষু কপালে উঠল আমার।

সে কী এলাহি কাণ্ড! দূরে দেখা যাচ্ছে বেলুন-পাহাড়। নীল আকাশের

মাঝে তার উদ্ধত শীর্ষ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিপদের ছায়াও তো কোথাও দেখলাম না।

অথচ, বেলুন-পাহাড় থেকে বহু দূরে ঘাঁটি গেড়েছে সামরিক বাহিনী। গিজগিজ করছে মিলিটারি, বনের সর্বত্র। নিষিদ্ধ অরণ্য অঞ্চল তফাতে রেখে তারা ঘিরে রয়েছে গোটা বেলুন-পাহাড়। ওত পেতে বসে আছে অহোরাত্র। কিসের প্রতীক্ষায়, ঈশ্বর জানেন।

চাঁদের আলোয় যে-বনতল একরাত্রেই শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে, আমি চেয়েছিলাম তার মধ্যে এক চক্কর ঘুরে আসতে। কিন্তু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র সহ মেজর প্যাটন সিং। বললেন, 'খেপেছ?'

'খেপব কেন? ভূতকে আমি পরোয়া করি না। দিনের বেলায় ভূতরা ঘুমোয়।'

'ভূত নয়, ভূত নয়। ভূতের চাইতেও দুঁদে বিপদ। তারা দিনেও জাগে।'

'কারা?'

নিগূঢ় হাসলেন প্রফেসর, 'দেখাই যাক না!'

দেখা গেল সেইদিনই দুপুরবেলা। স্বচক্ষে না দেখলে সে-দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না।

বেলুন-পাহাড়ের ভেতরে কী রহস্য নিহিত রয়েছে, তা দেখার জন্য একটা সামরিক হেলিকপ্টার উড়েছিল আকাশে। সুপ্রাচীন শালতরুর শীর্ষে বনবন করে ঘুরছিল হেলিকপ্টারের চাকা। অরণ্যের মাথা দিয়ে দূর হতে দূরে ভেসে যাচ্ছিল ঘুরন্ত প্রপেলারের নিনাদ।

আমি সকৌতুকে দেখছিলাম এঁদের বিপুল প্রচেষ্টা। মশা মারতে কেউ কামান দাগে না। কিন্তু এঁরা দেখছি তারও এককাঠি ওপরে যান। হেলিকপ্টার, কামান, ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছেন ভুতুড়ে পাহাড়-বনের দখল নিতে।

তখন কি ছাই জানতাম, সামরিক বাহিনীর গোপন রিপোর্ট কতখানি ভয়াবহ। ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো নয়, গুপ্তচর-অন্তর্ঘাতী নয়—তার চাইতেও সাঙ্ঘাতিক।

টের পেলাম একটু পরেই। ঠিক যখন উড়ন্ত চাকতি-বোমার বিস্ফোরণে নিমেষমধ্যে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল অত বড় হেলিকপ্টারটা!

ঘটনাটা ঘটল ঠিক এইভাবে :

শালতরুর মাথা দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ফড়িংয়ের মতো স্বচ্ছন্দে উড়ে গেল আকাশযান। ধীরে-ধীরে ছোট হয়ে এল তার আকৃতি। ছোট হতে-হতে যখন বিন্দুর মতো হয়ে এল, তখন আমরা বার করলাম দূরবিন। পিছনের পটে নীল আকাশের বুকে বেলুন-পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বিশাল গঙ্গাফড়িংয়ের মতো উড়ন্ত হেলিকপ্টার পৌঁছল পাহাড়চূড়ায়।

আমরা রেডিয়ো খুলে বসে আছি। ব্যবস্থা হয়েছে, চালক একাধারে তিনটি কাজ করবে। হেলিকপ্টার চালু রাখবে, ক্যামেরায় ছবি তুলবে এবং ট্রান্সমিটারে অনর্গল বলে যাবে চোখের সামনে কী দেখছে।

কিন্তু পাহাড়চূড়ায় পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে তিনটি কাজের কোনওটিই করা গেল না। কেননা, আচম্বিতে বেলুন-পাহাড়ের অভ্যন্তর থেকে উড়ে এল একটা বিচিত্র বস্তু।

উড়ন্ত পিরিচ! ফ্লাইং সসার!

দূরবিনের কাচে আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম সেই আষাঢ়ে দৃশ্য। ফ্লাইং সসার! এতদিন গালগল্প বিস্তর শুনেছি—স্বচক্ষে বহুদূর থেকেই দেখলাম সেই উড়ন্ত পিরিচের ঘূর্ণ্যমান আকৃতি। প্রখর রোদে সোজা হেলিকপ্টারের দিকে ধেয়ে গেল পিরিচ।

এবং সবেগে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টারের ওপর।

নিমেষে ঘটল বিস্ফোরণ। প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। থরথর করে কেঁপে উঠল সমগ্র বনভূমি। বিস্ফোরণের শব্দ খানিক পরে ভেসে এলেও সেই মুহূর্তে দেখলাম ব্যাঙের ছাতার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে বেলুন-পাহাড়ের শীর্ষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওয়ায় উড়ে গেল তাল-তাল ধোঁয়া। কিন্তু উড়ন্ত পিরিচ আর হেলিকপ্টারের কোনও চিহ্ন ধারেকাছে দেখা গেল না। দুটো বস্তুই বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে গেছে শূন্যে।

অর্থাৎ, উড়ন্ত পিরিচ নিছক পিরিচ নয়—পিরিচ-বোমা!

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল শিবিরে-শিবিরে।

বেলুন-পাহাড়ের উপকথা তা হলে নিছক কপোলকল্পনা নয়। সাঁওতালদের আষাঢ়ে গল্প নয়। চাঁদনি রাতে ঝকঝকে ফানুসের অবতরণ-কাহিনীও মিথ্যে নয়—মহুয়ার নেশায় ভুল দেখা নয়।

কিন্তু ওরা কারা? কাদের উদ্ভাবন এই প্রলয়ঙ্কর পিরিচ-বোমা? কেন তারা ঘাঁটি গেড়েছে বেলুন-পাহাড়ের গহন বনে? কী তাদের অভিসন্ধি?

সবচাইতে বড় কথা, রাতারাতি এ-তল্লাটের যাবতীয় প্রাণিহত্যাও কি তাদেরই কুকীর্তি? কিন্তু তার সাক্ষী কোথায়? কেনই-বা এই পাইকারি হত্যা? বেলুন-পাহাড়ের ভেতরকার বিবর-ঘাঁটি সুদৃঢ় এবং দুর্গম রাখাই কি মূল উদ্দেশ্য? কিন্তু কেন? কী আছে বেলুন-পাহাড়ের ভেতরে? ওরা কারা? কী চায়?

শত-সহস্র প্রশ্ন সহস্রনাগের মতোই পাক দিয়ে ধরল আমাদের চিন্তাধারা। ভূত নয়, প্রেত নয়—স্বচক্ষে দেখা গেল বিজ্ঞানের নবতম বিস্ময় এদের করায়ত্ত। মারাত্মক মারণাস্ত্রে সেজে ওরা বেলুন-পাহাড়ের ঘাঁটি আগলাচ্ছে। পাছে কেউ গুটি-গুটি পৌঁছে যায় পাহাড়ে, দেখে ফেলে ওদের কীর্তিকলাপ—তাই রাতারাতি দ্বিপদ, চতুষ্পদ সমস্ত প্রাণী নিধনেও ওদের অরুচি নেই। শ্মশান বনভূমি আগলাচ্ছে ওদের গুপ্তচক্র। আকাশপথও সুরক্ষিত।

তবে কি চম্পট দেওয়াই শ্রেয় ?

সত্যি কথা বলতে কী, আমার সমস্ত বীরত্ব উবে গিয়েছিল চোখের সামনে হেলিকপ্টারের শূন্যে বিলীন হওয়া দেখে। পিরিচ-বোমার কল্পনাতীত শক্তি আমার নার্ভ নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। মনে-মনে ভাবছিলাম, অশরীরী ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে রাজি আছি, কিন্তু শরীরী এই বিভীষিকাদের সঙ্গে নয়। পৈতৃক ধড়টাকে কচুকাটা অবস্থায় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ফেলে যাওয়ার চাইতে মানে-মানে কেটে পড়াই ভাল।

করতামও তাই। টিটকিরি গায়ে মাখতাম না। পরের দিন ভোরেই লম্বা দিতাম ঘরের দিকে।

কিন্তু রাত পোহানোর আগেই ঘটল নতুন এক বিভীষিকা। যে-কোনও পালোয়ানের ধাত ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভয়াবহ সেই ঘটনা। আমি তো কোন ছার !

মানুষ-জন্তু কচুকাটা হওয়ার রহস্য ভেদ করলাম আমি নিজেই—প্রাণটা হাতে নিয়ে।

রাত হয়েছে। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র অতি গুহ্য মন্ত্রণায় ব্যস্ত সামরিক হোমরাচোমরাদের সঙ্গে। আমি আমার শিবিরে বসে হরিনাম জপ করছি। সমগ্র বনভূমি থমথম করছে। সূচীভেদ্য সেই নীরবতার সঙ্গে তুলনা চলে না কোনও কিছুরই। বাতাস নেই—বনমর্মরও নেই।

শ্বাসরোধী সেই স্তব্ধতায় আমারও টুঁটি যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তাই ক্যাম্পখাটে পা দুলিয়ে বসে কম্বল দিয়ে মাথা পর্যন্ত মুড়ে রেখেছি। বেরিয়ে আছে শুধু নাক আর চোখ। মনে-মনে হিসেব রাখছি সময়ের। কতক্ষণে ভোর হবে—সেই প্রত্যাশা।

অকস্মাৎ একটা সরসর শব্দ শুনলাম। খুব ক্ষীণ শব্দ। বনের মধ্যে ক্যাম্প খাটিয়ে থাকতে গেলে এমন শব্দ হামেশাই শুনতে হয়। যারা অভ্যস্ত, তারা চমকায় না। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। ভয়ে কাঠ হয়ে ছিলাম বলেই সামান্য সরসরানি আমাকে অতটা চমকে দিয়েছিল এবং দিয়েছিল বলেই সে-যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।

আর, আমার টুঁটি।

সরসরানির কারণ অনুসন্ধান করতে স্বভাবতই এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। প্রথমেই চোখ গিয়েছিল তাঁবুর প্রবেশপথের দিকে। সেখানে হারিকেনের ক্ষীণ আলোয় বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। এবার তাকালাম পাশের জমির দিকে। ক্যাম্পখাটের পিছনদিকে। ঘাসের ওপর সামান্য ধুলো ওড়া নজরে পড়ল। তাঁবুর তলা দিয়ে একটা সরলরেখা বরাবর ধুলোর স্তর যে-কোনও কারণেই হোক চঞ্চল হয়েছে। তাই সামান্য ধুলো উড়ছে।

ধুলো ওড়ার সরলরেখাটা এসেছে আমার ক্যাম্পখাটের নীচের দিকে।

দেখেই অজানা আতঙ্কে আঁতকে উঠেছিলাম।

আর, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হিমশীতল কী একটা বস্তু আমার পায়ের গোছ বেয়ে উঠে এসেছিল হাঁটুর ওপর।

চমকে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম আমি। চক্ষের পলকে ক্লেদাক্ত কীটের মতো কনকনে ঠাণ্ডা বস্তুটা হাঁটু ছাড়িয়ে উঠে এসেছিল উরুর ওপর পাতা কম্বলের ওপর। সেখান থেকে বুকের ওপর দিয়ে গলার কাছে। এবং পরক্ষণেই ফ্যাঁস করে একটা শব্দ হল।

ঝটিতি হাত চালিয়েছিলাম। হাতের এক ঝটকায় আগন্তুক কীটটি ছিটকে পড়েছিল ক্যাম্পখাটের ওপর।

তৎক্ষণাৎ বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলাম দুটি দৃশ্য।

প্রথম, গলার কাছে আমার কম্বল কেটে ফালাফালা হয়ে গেছে। চকিতে বুঝলাম, কম্বল না থাকলে আমার গলার অবস্থা ওইরকম হত। অলক্ষ্য আততায়ীর প্রথম চোট গিয়েছে কম্বলের ওপর দিয়ে।

দ্বিতীয়, ক্যাম্পখাটের ওপর পড়ে একটা বিদঘুটে বস্তু। অনড় নয়—সচল। ছোট্ট একটা ইস্পাতের পিং-পং বলের দুপাশে দুটো ব্লেড লাগালে যা হয়—বিচিত্র বস্তুটা অবিকল তাই। বলটা বনবন করে ঘুরছে—সেইসঙ্গে ঘুরছে দুপাশের ক্ষুরধার ব্লেড। বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে-ঘুরতে ক্যাম্পখাট থেকে এগিয়ে আসছে কিনারার দিকে।

এক পলকে এর বেশি দেখার সাহস আমার হয়নি। ঘুরন্ত ছুরিওলা সচল পিং-পং বলটা একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে—কিন্তু দ্বিতীয়বার আর হবে না! ওর তেড়ে আসার ধরন দেখেই রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল আমার। ঘুরন্ত ওই ছুরি ফের যদি টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

একলাফে গিয়ে পড়েছিলাম তাঁবুর প্রবেশপথের সামনে। সেখান থেকে বেসুরো গলায় বিকট এক চিৎকার ছেড়ে বাইরে।

বাইরে গিয়েই ঠ্যাং দুটো যেন স্ক্রু-আঁটা হয়ে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। এ কী দৃশ্য দেখছি আমি!

শিবিরের সামনেই চিৎপটাং হয়ে পড়ে ছিল শিবির-প্রহরী। ধারালো অস্ত্রে ছিন্ন টুঁটি। শুধু তাই নয়। সারা গায়ে পিলপিল করছে অনেকগুলো ঘূর্ণ্যমান পিং-পং বল। শুধু ঘুরছে নয়—ঘুরন্ত ছুরির ঘায়ে খণ্ড-খণ্ড করছে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রক্তে ভেসে গেছে তলার ঘাস।

আমি স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই দুটো ঘুরন্ত বল লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে ছিটকে এল আমার দিকে। চলার পথে কুচকুচ করে কেটে উড়ে গেল লম্বা-লম্বা ঘাস। উড়তে লাগল ধুলো।

আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। কালান্তক মৃত্যুদূতদের এগিয়ে আসতে দেখেই ফিরে পেলাম সংবিৎ। ভাঙা গলায় বুকফাটা বিকট চিৎকার

করে ছুটেছিলাম প্রফেসরের মন্ত্রণা শিবিরের দিকে।

পরে শুনেছিলাম, আমার সেই ভয়ার্ত চিৎকার নাকি পাগলা-ঘন্টির কাজ করেছিল ভয়ঙ্কর সেই রাতে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ছুটে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ঘুরন্ত বলের ঘুরন্ত ছুরিকাঘাতে টুঁটিকাটা এবং কচুকাটা হওয়ার আগেই দেখেছিল শিবির-প্রহরীর খণ্ডবিখণ্ড লাশ।

আমার শিবিরটাই ছিল বেলুন-পাহাড়ের দিকে প্রথম সারির প্রথমে। তাই প্রথম হানা এই শিবিরেই ঘটেছিল। আমি মরতে-মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম নেহাত পরমায়ু ছিল তাই। বেঁচে গিয়েছি স্রেফ কপালজোরে। কিন্তু বাঁচেনি বেচারি প্রহরী।

ছুটতে-ছুটতে প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রও এসেছিলেন। বড়-বড় সার্চলাইটের আলোয় দিন হয়ে গিয়েছিল সামনের জমি।

ঘুরন্ত বল-বাহিনীকে দেখা গেল ঠিক তখনই। সংখ্যায় কত হবে? হাজার? লক্ষ? নিযুত? কোটি? ধুলোর ঘূর্ণিঝড় তুলে পঙ্গপালের মতো ওরা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। আসছে...আসছে...আসছে...!

কী করবে সৈন্যবাহিনী? লড়াই কাদের সঙ্গে? কত বন্দুকের গুলি খরচ করলে এদের রোখা যাবে? কিন্তু একটিও যদি কোনওমতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসে, নিমেষে টুঁটি হবে ছিন্ন।

অতএব মেজর বিহ্বল চোখে তাকালেন প্রফেসরের পানে। সময় অতি অল্প। কয়েকটা ঘুরন্ত বল এসে গেছে কয়েক গজের মধ্যে। রিভলভার তুলে ফায়ার করলেন মেজর। একটা বল ভেঙে উড়ে গেল। বাকিগুলো বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়ো না করে এগিয়ে এল মেজরের পানে...

'পালান।' চিৎকার করে উঠলেন প্রফেসর, 'এগিয়ে যাক শুধু ট্যাঙ্ক!'

সুতরাং শেষপর্যন্ত আমার পন্থাই অনুসরণ করতে হল গোটা বাহিনীকে। চম্পট! চম্পট! চম্পট! গোলা, বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে টেনে দৌড়। ঝোপঝাড় টপকে খানাখন্দ ডিঙিয়ে শুধু দৌড়! দৌড়! দৌড়! দৌড়!

তবে হ্যাঁ, সচল দুর্গরা বিপুল রোষে এগিয়ে গিয়েছিল বেলুন-পাহাড়ের দিকে। ট্যাঙ্কবাহিনীর অগ্রগতির সামনে পিষ্ট হয়েছিল ঘুরন্ত বলেরা হাজারে-হাজারে। এগিয়েছে আর মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করেছে ট্যাঙ্কের দল। গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে বারেবারে কেঁপে উঠেছে বনভূমি।

প্রত্যুত্তরে কিন্তু একটি পালটা কামানও গজরায়নি। এমনকি বেলুন-পাহাড়ের গোপন বিবর থেকে উড়ন্ত পিরিচ-বোমাও উড়ে আসেনি।

শুধু দেখা গিয়েছিল একটি দৃশ্য।

শেষ দৃশ্য!

আচম্বিতে বেলুন-পাহাড়ের চূড়ায় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। টকটকে লাল রঙের আশ্চর্য খেলা শুরু হয়েছিল পাহাড়ের ওপরকার আকাশে-বাতাসে।

সে এক অবিশ্বাস্য হোলিখেলা।

পরক্ষণেই রক্তবর্ণের অতিকায় একটা গোলক সিধে উঠে এসেছিল শীর্ষ ছাড়িয়ে। শুধু গোল বললে পুরো বলা হয় না—যেন একটা খুদে ভূ-গোলক। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড। লোহিত এবং ভয়াল।

দেখতে-দেখতে অনেকটা শূন্যে উঠে পড়েছিল অতিকায় গোলক। তারপর ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল রক্তবর্ণ। সে-জায়গায় তারার আলোয় ঝিকমিক করে উঠেছিল হিরের মতো উজ্জ্বল সাদা আবরণ।

হিরের ফানুস! নিরক্ষর সাঁওতালদের কথা তা হলে সত্যি! উড়ন্ত গোলা দেখে ওরাও 'হিরের ফানুস' নামকরণ করেছিল। যদিও জিনিসটা হিরে নয়—হিরের মতো ঝকঝকে কোনও ধাতু!

ক্রমশ বেগ বাড়ছে ভাসন্ত গোলার। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে আকৃতি। নিঃশব্দে কিন্তু অসম্ভব গতিবেগে শ্বেত-গোলক এবার বুঝি তারার রাজ্যে পৌঁছেছে। অগুন্তি নক্ষত্রের মাঝে যেন চিকমিক করছে আরও একটি নক্ষত্র।

বেগমান নক্ষত্র—স্থির নয়।

আমরা সবাই হাঁ করে দেখছিলাম—কল্পনাতীত এই দৃশ্য।

প্রফেসর বললেন, 'স্পেসশিপ।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'ব্যোমযান। কিন্তু কোন গ্রহের?'

'জানি না।' বললেন প্রফেসর, 'তবে শিগ্গিরই হয়তো জানবে। কেননা, ওরা আবার আসবে।'

'কী করে জানলেন?' মেজরের প্রশ্ন।

'ওরা গোপনে প্রস্তুত হচ্ছিল গোপন ঘাঁটিতে। অতর্কিতে আমরা হানা দিয়ে ওদের বিরক্ত করেছি। ওরা নির্বোধ নয়। আমরা প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছি—ওরা খবর পেয়েছে। তবুও ওরা চলে গেল। কেন? না, ফিরে এসে ওদের উদ্যোগপর্বে আবার আমরা বাধা দিতে পারি নতুন করে। সুতরাং—'

'এখনকার মতো চম্পট প্রদান। কিন্তু অচিরে বীরবিক্রমে প্রত্যাবর্তন। কেমন, তাই তো?' বলি আমি। উড়ন্ত গোলার পলায়নে আমার লুপ্ত সাহস ফিরে এসেছিল বলেই রসনায় সুন্দর-সুন্দর কথাগুলো এসে গেল।

ফোকলা হেসে প্রফেসর বললেন, 'যা বলেছ! তা হলে এবার ফিরে যাওয়া যাক।'

'কোথায়?'

'অকুস্থলে।'

'কেন? মরতে?' সন্ত্রস্ত কণ্ঠ আমার।

'না, না, মরতে কেন?' অমায়িক কণ্ঠ প্রফেসরের, 'ওদের মরণ দেখতে।'

'কাদের মরণ? কী বলছেন কী?' মেজর এবার কণ্ঠ চড়ালেন।

'ওই তো, ওই ঘুরন্ত বলগুলোর,' বলে আর দাঁড়ালেন না প্রফেসর। হাঁটা

দিলেন ফেলে আসা বনতলের দিকে—যেখানকার জমিতে লাখে-লাখে ঘুরন্ত ছুরি হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের টুঁটি।

আমি প্রায় ককিয়ে উঠে বলেছিলাম, 'প্রফেসর, আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল ? ওরা যে সাক্ষাৎ মৃত্যু ?'

'তোমার মুণ্ডু। ওরা মৃত্যুর দূত। স্বয়ং মৃত্যু ব্যোমযানে চেপে যখন পলাতক, তখন দূতগুলোর একটা ব্যবস্থা করেই গেছে। দেখাই যাক না ব্যবস্থাটা কী।'

অগত্যা গুটি-গুটি যেতে হল আমাদের সকলকেই। যতই এগিয়েছি, ধড়াস-ধড়াস করেছে বুক, শুকিয়ে গেছে তালু। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করেছি এই বুঝি শুকনো ঘাসে ধুলো ছিটিয়ে এগিয়ে এল ঘুরন্ত ছুরি...যাদের লক্ষ্য জীবিত প্রাণীর টুঁটি।

টুঁটির ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়েও কিন্তু আমার টুঁটি কাটা যায়নি—এই কাহিনীই তার প্রমাণ। যদিও ওদের ফের দেখেছিলাম। লাখে-লাখে দেখেছিলাম। সমগ্র বনস্থল আকীর্ণ হয়ে ছিল ওদের নিশ্চল দেহে।

হ্যাঁ, নিশ্চল। 'নিষ্প্রাণ' শব্দটা প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। কেননা, ওরা কেউ প্রাণীস্থানীয় নয়, যন্ত্র। নিছক যন্ত্র।

লাখে-লাখে যান্ত্রিক বলে ছেয়ে ছিল সারা অরণ্য। তবে জোড়া ছুরি ঘুরিয়ে পাকসাট দিচ্ছিল না একটিও।

একটি বল তুলে নিয়েছিলেন প্রফেসর। দেখেছিলেন বিচিত্র এক ধাতুতে গড়া ওদের দেহ। ফাঁপা বল। বেবাক ফাঁপা। দুপাশে দুটি শাণিত ছুরিকা। শূন্যগর্ভ বলটা কিসের শক্তিতে ঘুরেছে, কার হুকুমে টুঁটি লক্ষ্য করে তাড়া করেছে এবং অকস্মাৎ এখন শক্তিহীন হয়ে কেনই-বা লাখে-লাখে পড়ে রয়েছে, এ-প্রহেলিকা আজও প্রহেলিকাই রয়ে গিয়েছে।

প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র শুধু মাথাই চুলকেছেন, জবাব দিতে পারেননি। তবে তিনি আজও প্রতীক্ষা করে আছেন।

এ-প্রতীক্ষা ওদের ফিরে আসার।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কাদের মিয়ার কান

সমরজিৎ কর



আমাদের চিফ কুক কাদের মিয়ার সবচেয়ে বড় গর্ব তার দুটি কান। কানের কথা উঠলেই সে বলে, 'হেঁ-হেঁ, খোদা আমার দুই গালে যে-কান দুটি বসিয়ে দিয়েছেন তার কোনও জুড়ি পাবেন না, হুজুর। কালো কাপড়ে আমার চোখ দুটি বেঁধে দিয়ে মেঝের ওপর খড়কুটো ফেলুন। শব্দ শুনেই বলে দেব, খড়কুটো ফেললেন।'

হ্যাঁ, সুযোগ পেলেই সে তার কানের গুণপনার কথা না শুনিয়ে ছাড়ত না। আর সে-সুযোগ আসত আমরা যখন খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসতাম, তখন। মানুষকে খাওয়ানোটাও তার একটা আর্ট। যা রাঁধত, তাই অমৃত। খাওয়ার সময় টেবিলের একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ করত সে। কোনও একটি পদ হয়তো মুখে তুলেছি, অমনই তার মন্তব্য, 'যাক, হুজুরের খানা পছন্দ।'

'কী করে বুঝলে ?' আমার প্রশ্ন।

'খানা পছন্দ কিনা, খানেওয়ালার মুখ-চোখই তা বলে দেয়, সাহেব।' তার সতৃপ্ত উত্তর।

তারপর শুরু হত বক্তৃতা। কথার ফুলঝুরি।

'বুঝলেন কিনা, হুজুর। পাতে খাবার ফেলে দিলেই খাওয়ানো হয় না। মানুষের খাবার ভাল লাগছে কিনা সেটা দেখতে হয়। ভাল লাগলে রসুইকরের আনন্দ। বুঝতে পারে কতটা তার হাতযশ। আমার আগের মালিক মেজর ধনেশ্বর সিংও এ-কথা মানতেন।'

এক সময় আর্মির কুক ছিল কাদের মিয়া। রাজপুত ব্যাটালিয়নের মেজর ধনেশ্বর সিং তখন ছিলেন তার কর্তা।

কখনও বিরক্তও যে হই না তাও নয়। কাজের তাড়া। কোনওরকমে কিছু মুখে দেওয়া তখন। অমনই, 'আরে আরে, কী করছেন, হুজুর ? চাপটার ওপর অবিচার করবেন না। এক নম্বর ভেড়ার মাংস। ওভাবে গপ-গপ করে গিললে আমার কষ্ট হয়। ভাল খাবার একটু রসিয়ে খাবেন তো ?' তার চোখ-মুখে যেন

যন্ত্রণার ছাপ।

বয়েসের কথা তুললেই কাদের মিয়া বলে, 'এই এপ্রিলে চল্লিশে পড়লাম হুজুর।'

গত বছর এপ্রিলেও সে একই উত্তর দিয়েছিল। রেকর্ডে তার বয়স যে একান্ন তা সে ভুলেই গিয়েছে। লম্বাটে মুখ। নাকের ডগা কিছুটা চাপা। তার নীচে পুরু সাদা-কালো গোঁফ। থুতনিতে চুটকি দাড়ি। মাথায় এক ঝুড়ি চুল। আর কান ? সত্যিই তা দেখার মতো। অমন বড় এবং গোলাকার কান আর কারও দেখিনি।

'কী বলব, সাহেব। সেবার রাজস্থানের মরুভূমিতে। জয়শলমিরের কাছাকাছি হবে। মেজর দলবল নিয়ে ছাউনি ফেলেছেন এক জায়গায়। আগেই তিনি খবর পেয়েছিলেন নেশার কী যেন ওষুধ নিয়ে পাকিস্তানের চোরাকারবারি সেখান দিয়ে ভারতে ঢোকে। তাদের ধরার জন্যেই সেখানে ঘাপটি মেরে থাকা। একটানা সাতদিন ওইভাবেই চলল। চালানিদের পাত্তা নেই। একদিন, রাত তখন দেড়টা হবে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার, হুজুর, ঘুম বড় পাতলা। হঠাৎ মনে হল কিসের যেন শব্দ ! তড়াক করে উঠে বসে কান খাড়া করতেই, যা ভেবেছি, তাই ! এ তো তাদেরই চলার আওয়াজ। আওয়াজটা আসছে পশ্চিম থেকে। যে-দিকটায় বালির উঁচু পাহাড়। পাশের তাঁবুতে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে মেজর সাহেবের ঘুম ভাঙালাম।'

'কী ব্যাপার ?' ধমকে উঠলেন মেজর। পাকা ঘুম ভাঙলে তো ধমকাবেনই।

'উঠুন, হুজুর। তারা আসছে।' আমিও বেপরোয়া।

'কারা আসছে ?' সাহেব থতমত খেলেন।

'নির্ঘাত কারবারিরা। ইঁদুরের পায়ের মতো শব্দ, মালুম করার চেষ্টা করুন, হুজুর।'

'কোথায় শব্দ ?' কান খাড়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জবাব দিলেন মেজর।

'উঠুন, হুজুর। আওয়াজটা আমি ঠিকই মালুম করছি।' জুলুম করলাম আমি।

'কী বলব, সাহেব। মেজর হলে কী হবে, সেপাই তো ! রেগে গেলে কি ওঁদের ভাষা ঠিক থাকে ? গালাগালের সে কী বহর !' বলতে লাগল কাদের মিয়া, 'ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ায় তিনি বারুদ হয়ে উঠলেন। মুখ যেন আঁস্তাকুড়। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার চাপে দলবল নিয়ে মেজর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অন্ধকারে বালির পাহাড়ে। ব্যস, কিল্লা মাত। পাকিস্তানের ডাকুবুকু চোরাচালানি শের খাঁ আর তার শাগরেদরা গিরিপ্তার। তাদের কাছে পাওয়া গেল কুড়ি কোটি টাকার নেশার ওষুধ। মেজর এর জন্যে সরকার থেকে দশ লক্ষ টাকা ইনাম পেলেন। আর তা পেয়েই তা থেকে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে



'ওই দেখুন, হুজুর। দূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন কোট প্যান্টালুন পরা দুটি মানুষ। এতক্ষণ এই তাঁবুতে এসে কী হুটোপুটিই না করছিল...।' কাদের রীতিমত উত্তেজিত।

দিলেন আমাকে, আর বাকি টাকা তাঁর জন্য পঞ্চাশ পল্টনদের। বলেন, "কাদের, তোর জন্যেই তো ব্যাপারটা জানলাম। আর আমার পল্টনরাই তো তাদের পাকড়াল। তাই ইনামের টাকা তোদের।" বড় অফিসার হতে গেলে বড় কলিজা থাকা চাই, সাহেব।'

বেশ রসিয়ে কথা বলতে পারে কাদের মিয়া। আর্মি থেকে অবসর নিয়ে বছর-পাঁচ হল সে যোগ দিয়েছে আমাদের এই আবহাওয়া অফিসে। অফিসটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দফতরের। পাঁচজন ভারতীয় এবং পাঁচজন বিদেশি নিয়ে এই দফতর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ চিন সাগর, তাইল্যান্ড উপসাগর, বান্দা সাগর, জাভা সাগর এবং তংকিং উপসাগরে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় নিয়ে গত পাঁচ বছর ধরে গবেষণা করছি আমরা।

প্রতিভা বটে কাদের মিয়ার! নতুন কোনও জায়গায় গেলেই হোটেলে গিয়ে সে স্থানীয় রসুইকরদের সঙ্গে ভাব জমায়। তারপর দিন-দুই যেতেই আমাদের পাতে নতুন পদ। কখনও চিনে খাবার, কখনও তাইল্যান্ডের শুঁটকি মাছের ঝাল। তার কথা, 'বুঝলেন কিনা হুজুর, মুখের রুচিটা লম্বা মাপের করতে হয়। কোনও নতুন দেশে হয়তো গেলেন। সেখানকার কেউ আপনাকে তাদের ভাল খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করল। সে-খাবার খেয়ে আপনি খুশি তো সেই মানুষটি আপনার আত্মীয়।'

তার কথা শুনে মনে হয়, সমাজবিজ্ঞানের পাঠটা আমাদের বুঝি তার কাছ থেকেই নেওয়া উচিত।

'কিন্তু ওই যে কান! সত্যিই তা গর্ব করার মতো।

এটি একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষক দল। আমিই তার নেতা। আমার সহকারীদের মধ্যে ভারতীয় বলতে রবি কুলকার্নি, রাঘবন এবং মহাবীর পাণ্ডে। বিদেশিদের মধ্যে রয়েছেন জার্মানির ফ্রাঙ্ক গেরহার্ড, ইকুয়াডরের ক্রিস্তোফার হিহং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেম্‌স ওয়েল্‌চ।

গত বছর জুন মাসে আন্দামানের পুব দিকে বঙ্গোপসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপে আমরা আস্তানা গেড়েছি।

জনহীন দ্বীপ। উপকূলের পাশে কিছুটা জায়গা মসৃণ পাথরে ঢাকা। দ্বীপের বাকি অংশে গভীর বন। এ-সময় এ-অঞ্চলের সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় দানা বাঁধে। আমরা তারই অপেক্ষায় দিন গুনছি। আমাদের নজর পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্রপাতির ওপর। আকাশে ভাসা-ভাসা মেঘ। কয়েকদিন গরমও পড়েছে খুব। সেইসঙ্গে দরদর ঘাম।

একদিন দুপুরে। রেডার স্ক্রিনে আমরা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ঝোড়ো মেঘের অনুসন্ধান করছি। কিন্তু কোথায় মেঘ!

এমন সময় কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল কাদের মিয়া। এসেই শুরু করল তার বয়ান, 'আজ বিকেলে আপনাদের ওই চক্করপানা ঝড় হবেই।' চক্করপানা ঝড় মানে সাইক্লোন।

তার কথা শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না ! চক্করপানা ঝড় ! মানে ঘূর্ণিঝড় । খাসা নাম দিয়েছে বটে !

'বিশ্বাস করুন, সাহেব । ওইদিকে একটি খালে বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরছিলাম । পেছনে কাশের ঝোপ । জানেন তো হুজুর, পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বইলে শব্দ হয় । কাশের পাতার শব্দ কানে যেতেই, আরে, এ যে দেখছি জবরদস্ত ঝড়ের নিশানা । কান খাড়া করে শুনলাম । কোন বাতাস ঝড় আনে, পাতায় কান পাতলেই আমি মালুম করতে পারি । বলে দিলাম হুজুর, আজ সাঁঝের আগেই ঝড় আসছে ।' গড়গড় করে বলে গেল সে ।

মাথা নিচু করে কাজ করছিল ওয়েল্চ । সে বাংলা ভাষা কিছু-কিছু বোঝে । মাথা নিচু অবস্থাতেই সে মন্তব্য করল, 'পাগল !'

'বিরক্ত কোরো না, কাদের, এ তোমার রসুইঘর নয় যে, গন্ধ শুঁকেই বলে দেবে খাবার কেমন ।' বলল পাণ্ডে । ভুল বলেনি । যন্ত্রে ঝড়ের কোনও লক্ষণই তো নেই !

আমাদের কাছ থেকে পাত্তা না পেয়ে সে বিড়বিড় করতে-করতে চলে গেল । ব্যাপারটা আমার কাছে কৌতুক বলেই মনে হয়েছিল ।

কিন্তু ঘণ্টা-দুই না যেতেই কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবিতে এ কী দেখছি আমরা ?

ইমেজারির দায়িত্বে ছিল গেরহার্ড । সে তো লাফিয়েই উঠল : 'ডঃ মিত্র, দেখুন তো । ঘূর্ণিঝড়ের চোখ বলেই তো মনে হচ্ছে ।'

'ঠিক ! ঘূর্ণির চোখ ছাড়া এ আর কিছু হতে পারে না ।' গেরহার্ডের সামনে টেলিভিশনের মতো ভিশন স্ক্রিন । তার ওপর পরিষ্কার ফুটে উঠেছে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবি । ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি ঘূর্ণিঝড় দানা বাঁধছে, বঙ্গোপসাগরের বুকে । ঝড়ের কেন্দ্রস্থল, যাকে বলা হয় 'চোখ'—সেটি দ্রুত বড় হয়ে উঠছে ।

বলতে কী, ঘণ্টাতিনেকের মধ্যেই আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল প্রবল এক ঘূর্ণিঝড় ।

'তাহলে সাহেব ? ভুল বলিনি তো ?' কাদেরের মুখে নায়কের হাসি ।

আমরা সবাই অবাক ! জানতাম পশুপাখিরা ঝড়, জল, ভূমিকম্পের খবর অনেক আগে থেকেই বুঝতে পারে । কিন্তু তা যে মানুষও পারে, তাও তো প্রমাণ হয়ে গেল । অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত ! বাতাসের শব্দ শুনে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস ! এ তো কল্পনাই করা যায় না ! আবহাওয়া কি, মনে হল, কাদেরই এখন আমাদের কাছে বড়রকমের গবেষণার বস্তু । তার দুই কানের শ্রুতিক্ষমতা যেন এক বিরাট রহস্য হয়ে দাঁড়াল । আর সেই রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে আমরা এমন সাঙ্ঘাতিক বিপদে গিয়ে পড়ব, কখনও কি ভাবতেও পেরেছিলাম ? রীতিমত কেঁচো খুঁড়তে সাপ ? আমরা জানতাম হোসে কামিলো তাঁর দলবল নিয়ে বরফচাপায় মারা গেছেন । অনুসন্ধানকারীরা অনেক চেষ্টা

করেও তাঁদের চিহ্ন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু গত পাঁচ বছর তিনি এবং তাঁর দলবল যে বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছেন এবং তাবড়-তাবড় বিজ্ঞানীদের ওপর বাটপাড়ি করে বেড়াচ্ছেন, আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। শেষপর্যন্ত তাঁদের সন্ধান দিল কিনা কাদের মিয়ার কান ? বরফের ওপর নমাজ পড়তে গিয়ে সে যে এমন একটা সুখবরের সন্ধান দেবে, এ তো কল্পনাও করা যায় না ! শেষপর্যন্ত কুমেরু মহাদেশে এসে এমন একটা জবর খেল !

ব্যাপারটা যে এইভাবে মোড় নেবে, আমরা ভাবতেও পারিনি।

আর্জেন্টিনায় তিয়েরা ডেল ফুয়োগো থেকে অতিকায় একটি মালবাহী বিমান হারকিউলিস-এ চড়ে আন্টার্কটিকার একটি সমভূমি অঞ্চলে এসেছি ঠিক দশদিন আগে। যাত্রার সময় আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানী ডঃ সামুয়েল পেরালেজ আমার হাতে একটি ফাইল দিয়ে বলেছিলেন, 'এই ফাইলেই আপনি প্রয়োজনীয় সব নথিপত্রই পাবেন, ডঃ মিত্র। জায়গাটার সাঙ্কেতিক নাম "পয়েন্ট এম"। ভারতীয় আন্টার্কটিক স্টেশন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী থেকে সরাসরি দক্ষিণে, প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে। এলাকাটা সমভূমি। যেখানে আস্তানা ফেলবেন সেখান থেকে দু-কিলোমিটার দূরে পাবেন একটি হ্রদ। অতএব পানীয় জলের অভাব হবে না। আবহাওয়াজ্ঞাপক উপগ্রহটি ঠিক আপনাদের মাথার ওপর থাকবে। তার মাধ্যমে আমরা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। জরুরি প্রয়োজনে দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর বিজ্ঞানীরা আপনাদের সাহায্য করবেন। সে-কথা তাঁদের জানিয়েও দিয়েছি। গুড লাক।'

হারকিউলিস বিমানটি মালপত্রসহ আমাদের পয়েন্ট এম-এ নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। লক্ষ করলাম, ডঃ পেরালেজ যা বলেছিলেন, একেবারে খাঁটি কথা। বিরাট এলাকা। বরফঢাকা সমভূমি। মসৃণ আয়নার মতো। কিছু দূরে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটি পাহাড়। মানচিত্র দেখে বুঝতে পারলাম, ওই পাহাড়ের কোলেই রয়েছে হ্রদ। এখন ডিসেম্বর। মাথার ওপর সূর্য। সর্বক্ষণ। আমাদের বলা হয়েছে আগামী পঁচিশ দিন সূর্যে নিয়মিত বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটবে। এর ফলে সেখান থেকে বিকীর্ণ হবে অতিরিক্ত পরিমাণ অতিবেগুনি রশ্মি। পয়েন্ট এমের ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তর খুব ফাঁকা হয়ে এসেছে। ওজোন গ্যাস অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ওই স্তর ফাঁকা হয়ে আসায়, সূর্য থেকে আসা ওই প্রাণঘাতী রশ্মি আর তেমন শোষিত হতে পারবে না। এর ফলে পয়েন্ট এমের ভূপৃষ্ঠে অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা দারুণভাবে বেড়ে যাবে। কতটা বাড়ল সেটা মাপাই আমাদের কাজ।

এই কাজের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, দিন দুইয়ের মধ্যেই আমরা সেসব বসিয়ে ফেলেছি। আবহাওয়া ভাল। ঝোড়ো বাতাস নেই। তবে আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনেকটা কম, শূন্যের নীচে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তাই এসব কাজ সারতে খুব অসুবিধে হল। আমাদের কর্মীরা পুরু বরফের স্তর খুঁড়ে তৈরি করল বর্গাকার পাঁচটি খাদ। এক-একটি খাদ তিন মিটারের মতো গভীর। সেগুলির মধ্যে তৈরি হল তাঁবু। তাঁবুগুলি থেকে দুশো মিটার দূরে পরস্পর কিছুটা দূরত্ব রেখে বসানো হল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ "এম ও"-র সঙ্গে সংযোগকারী ডিশ অ্যানটেনা, একটি বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্র, অতিবেগুনি রশ্মি মাপার যন্ত্র, একটি ম্যাগনেটোমিটার এবং একটি পারটিক্‌ল ডিটেকটার বা পারমাণবিক কণা মাপার যন্ত্র।

সমস্ত ব্যবস্থাই নিখুঁত। হিসেবমতো তৃতীয় দিন থেকেই শুরু হল আসল খেলার পালা। চঞ্চল হয়ে উঠল ম্যাগনেটোমিটার। তার মানে, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এখানকার ভূচৌম্বক ক্ষেত্র। পারটিক্‌ল ডিটেকটারে ধরা পড়তে লাগল অতিরিক্ত পরিমাণ প্রোটন কণা এবং ভারি আয়ন। বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রে অবলোহিত রশ্মি ধরা পড়ছে বেশি। যার অর্থ সূর্য আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এবং সর্বনেশে কাণ্ড! এ যে দেখছি অতিবেগুনি রশ্মির ঝড়! ওজোন স্তর হালকা হওয়ায় অতিবেগুনি রশ্মি মাপার যন্ত্রটিতে যে এত বেশি অতিবেগুনি রশ্মি এসে পড়বে, এ তো কল্পনাই করা যায় না! বরফের গর্তে তাঁবুর মধ্যে বসে কম্পিউটারে সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

'প্রচণ্ড সৌরঝড় চলছে।' ম্যাগনেটোমিটারের তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করছিল ফ্রাঙ্ক গেরহার্ড। বিড়বিড় করে মন্তব্য করল সে।

'ভেরি বিগ ফ্লেয়ার। সৌরঝড়ে প্রচুর পরিমাণ প্রোটন কণা এবং ভারি আয়ন। মনে হচ্ছে লোহার আয়নও রয়েছে।' জেম্‌স ওয়েল্‌চের কণ্ঠে আশঙ্কা।

কুলকার্নি, রাঘবন এবং মহাবীর পাণ্ডে কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্যের ফলাফল খতিয়ে দেখছে।

নাওয়া-খাওয়া শেষ। ব্যস্ততার মধ্যে সময় যেন ছুটে চলেছে আলোর গতিতে।

'কিছু নাস্তা করুন, হুজুর। আপনাদের কি ভুখ পায়নি?' দেখি ট্রে-র ওপর একগাদা খাবার নিয়ে কখন কাদের এসে হাজির : 'এমন শুখা জায়গায় কী আর খাওয়াব! বন্দুক দিয়ে যে একটা পাখি মারব তার জো কোথায়? কানুনে মানা। এইসব শুখা বিস্কুট, রুটি আর টিনের খাবার কি দিতে ইচ্ছে করে?'

শুরু হল কাদের মিয়ার বক্তৃতা।

'কী বিপদ! কাজের সময় ঘ্যান-ঘ্যান।' বললাম, 'থামো, কাদের। খাবার রেখে কেটে পড়ো দেখি।' কিছুটা রেগেমেগেই কথা বললাম আমি।

'ব্যস্ত, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই বলে পেট কি সে-কথা শুনবে?' বলেই চলে গেল কাদের।

ঘড়িতে তখন দুপুর বারোটা। তা ঘড়ি দেখেই তো এখানে হিসেব করতে হয়—রাত না দিন। সূর্য তো সব সময় মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। সব সময়ই

আলো। ঠিক তিনটের সময় আমাদের মাথার ওপরকার আকাশপথে আবহাওয়া উপগ্রহ এসে হাজির হবে। হাতে মাত্র তিন ঘণ্টা সময়। সকাল থেকে যা কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি সেগুলো চটপট গুছিয়ে নিয়ে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে লাগলাম। ব্যস্ততা ! প্রচণ্ড ব্যস্ততা !

ঠিক এমন সময়। ঘড়িতে তখন দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

'আরজেন্ট মেসেজ, ডঃ মিত্র। এইমাত্র ফ্যাক্স-এ এল। ডঃ বাসু পাঠিয়েছেন।' বলেই একটুকরো ছাপা কাগজ এগিয়ে দিল জেম্‌স।

'ডঃ বাসু ?' চমকে উঠলাম আমি। 'ডঃ বাসু তো বাতের ব্যথায় ভুগছেন ! তিনি তো জানি জার্মানির বাদেন-বাদেন-এ, সেখানে একটি স্পা-এর জলে রোগ সারাচ্ছেন।'

জেম্‌সের হাত থেকে মেসেজটি নিয়ে—অবাক কাণ্ড ! এ তো দেখছি বুয়েনস আইরেসের ঠিকানা ! মাত্র দুটি বাক্য : 'শঙ্কর, তোমাদের তাঁবুর কাছে কোনও পেঙ্গুইন এলে আটকে রাখবে। ডঃ জোহান হ্যামারশিল্ডকে নিয়ে আমি পরশু আসছি। —ডঃ বাসু।'

বুদ্ধি লোপ পাওয়ার মতো অবস্থা। ডঃ বাসু যে বেপরোয়া মানুষ, সে তো তাঁর কাছে গবেষণা করার সময় থেকেই জেনে আসছি।

'লাগামহীন কল্পনা ! বুঝলে কিনা, লাগামহীন কল্পনা। এ না হলে গবেষণা হয় না।' আমাদের ছাত্র অবস্থা থেকেই এই কথাটি শুনিয়ে আসছেন তিনি। নিজেও কি পরিশ্রম কম করেন ? আর শরীরও যেন ইস্পাত। এই ষাট বছর বয়েসে প্রথম তিনি রোগশয্যায়। বাদেন-বাদেন থেকে এ-খবরটি পাঠিয়েছিল আমার এক বন্ধু দিন কুড়ি আগে।

'পেঙ্গুইন এলে আটকে রাখবে।' কী বলতে চান তিনি ? এ-অঞ্চলে যে পেঙ্গুইন আসে না, এখানে পা রাখার পর সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তবু পেঙ্গুইন নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন ? হঠাৎ ডঃ বাসুই বা এখানে আসছেন কেন ? কোনও গোলমেলে ব্যাপার কি ? কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না ছাই !

গবেষণাগারে কাজকর্ম সেরে আমাদের আস্তানায় যেতেই 'কী ব্যাপার, কাদের মিয়া ? এত মজলিসী মেজাজ যে ?' খোলা দরজার সামনে কাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম আমি। তার চোখমুখ দেখে মনে হল খুব একটা মজার কিছু ঘটেছে যেন।

'ওই দেখুন, হুজুর। দূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন কোট-প্যান্টালুন পরা দুটি মানুষ। এতক্ষণ এই তাঁবুতে এসে কী হুটোপুটিই না করছিল। দুই কৌটো মাছ দিয়েছিলাম। সবটাই সাবাড় করেছে।' কাদের রীতিমত উত্তেজিত।

'এ যে পেঙ্গুইন !' উত্তেজনায় প্রায় চিৎকারই করে উঠল কুলকার্নি।

হ্যাঁ, পেঙ্গুইনই তো ! কেমন পাশাপাশি হেলে-দুলে দুটিতে ছুটে চলেছে।

'ধরো, ধরো, ওদের ধরতেই হবে।' বলেই দৌড়তে শুরু করলাম। আমার পেছনে আর সবাই।

আমাদের ধাওয়া করতে দেখে পেঙ্গুইন দুটিও দৌড়তে শুরু করল। ততক্ষণে বেশ কিছুটা দূরেও চলে গেছে। সেই হ্রদের দিকে। পায়ের নীচে মসৃণ বরফ। ক্ষণে-ক্ষণে আমরা পিছলে পড়ছি। আর সেই সুযোগে—ঠিক। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম, চোখের পলকে পাখি দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আশ্চর্য ! একেবারে বরফের মধ্যে গায়েব ? পুরো এলাকাটা আমরা আঁতিপাতি করে খুঁজলাম। পেঙ্গুইনের একটা পালকও চোখে পড়ল না। যেখান থেকে তারা অদৃশ্য হল সেখান থেকে হ্রদটি খুব কাছে।

হতাশ হয়ে ফিরে এলাম আমরা। কোনও কাজে আর মন লাগল না। বিচিত্র এক দুর্ভাবনা নিয়ে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে সবাই আমরা শুয়ে পড়লাম। কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব। তারপর গভীর নিদ্রা।

অদ্ভুত কাণ্ড ! একই সঙ্গে সবাই এতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি, এমন তো হয়নি !

পরদিন আমাদের সবারই ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। পরক্ষণেই আমাদের মনের ওপর যেন বিস্ফোরণ ঘটল।

তাঁবুর পরদা হাট করে খোলা !

আর তার পরক্ষণেই কাদেরের আবির্ভাব : 'তাজ্জব ব্যাপার, হুজুর। আপনাদের আস্তানার বাইরে বরফের ওপর যেন মানুষজনের জুতোর ছাপ। এ ছাপ তো কাল ছিল না ! মনে হচ্ছে কারা যেন এখান থেকে ওই হ্রদের দিকে হেঁটে গেছে। সকালে বাইরে নমাজ পড়তে গিয়েছিলাম, চোখে পড়ল।' বেশ হন্তদন্ত হয়েই কথাগুলো বলল কাদের।

ঠিক। জুতোর ছাপই তো বটে ! এক জোড়া নয়, একেবারে পাঁচ জোড়া। ছাপগুলোও অদ্ভুত। আকারে অনেকটা বড়। দেখলে মনে হয়, নীচে মোটা-মোটা কাঁটা লাগানো।

'গোলমাল মনে হচ্ছে।' ছাপগুলো পরীক্ষা করে মন্তব্য করল ওয়েল্‌চ।

'কী মনে হচ্ছে, রাঘবন ?' ছাপগুলোর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'বরফের গা বেয়ে ওঠার জন্যেই জুতোর নীচে ওই কাঁটা।' ছাপ পরীক্ষা করে মন্তব্য করল রাঘবন।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুটলাম আমরা ওই ছাপ অনুসরণ করে। ডেরায় রইল কুলকার্নি এবং কাদের। এক ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া উপগ্রহটি আমাদের মাথার আকাশে আসবে। তার মাধ্যমে গতকালের তথ্যগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করতেই থেকে গেল কুলকার্নি।

পায়ের নীচে জমাট বরফ। মসৃণ। পরিষ্কার আকাশ। বাদামী রোদ। প্রাণী বলতে এ-অঞ্চলে এখন শুধু আমরাই কয়েকজন। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমরা ছুটে চলেছি। কিন্তু আশ্চর্য ! আস্তানা থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে এসে—এ কী কাণ্ড ! পায়ের ছাপ এক জায়গায় এসে অদৃশ্য !

'মনে হচ্ছে পেঙ্গুইন দুটিও এখানে এসেই অদৃশ্য হয়েছে।' অস্ফুট কণ্ঠে মন্তব্য করল গেরহার্ড, 'এই দেখুন, পেঙ্গুইনেরও পায়ের ছাপ এখানে।'

গেরহার্ডের কথায় সবাই হুমড়ি খেয়ে জায়গাটি পরীক্ষা করলাম। ঠিক। গেরহার্ড ঠিকই ধরেছে।

কোথায় হাওয়া হয়ে গেল ওই মানুষগুলো আর দুই পেঙ্গুইন ? পেঙ্গুইন দুটি এখানে এলই-বা কোত্থেকে ! এখানে আসার পর থেকে এ-অঞ্চলে কোনও পাখিই তো চোখে পড়েনি। আর কোনও প্রাণীও না। এমনকি পোকামাকড়ও। অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় আমরা প্রমাদ গুনলাম।

আস্তানায় ফিরতেই— !

'ডাকাতি, ডঃ মিত্র ! ডাকাতি হয়ে গেছে।' উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে উঠল কুলকার্নি।

'কী ব্যাপার ?' পাগলের মতো প্রশ্ন করলাম আমি।

'লোপাট। অতিবেগুনি এবং অবলোহিত রশ্মির দুটি ক্যাসেটই লোপাট হয়েছে, ডঃ মিত্র।'

'তার মানে, যেসব তথ্য আজ পাঠানোর কথা ছিল, সব হাওয়া ?'

বুঝতে অসুবিধে হল না, ওই পায়ের যারা মালিক, রাতের দিকে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় তারাই ডাকাতি করেছে। কিন্তু কেন ? কারাই বা তারা ? ঠিক এই মুহূর্তে ব্যাপারটা কি বিশ্ব পরিবেশ দফতরকে জানানো উচিত হবে ? এখন আন্টার্কটিকায় গবেষণা নিয়ে বেশ কিছু দেশের মধ্যে যে-ধরনের মন-কষাকষি চলছে, তাতে এ-নিয়ে কারও সঙ্গে কথা না বলাই ভাল।

অতএব ঠিক এক ঘণ্টা পরে যখন আমাদের আকাশে উপগ্রহটি এল, আমি জানিয়ে দিলাম, 'যান্ত্রিক গোলযোগে গতকালের ক্যাসেটে তোলা তথ্যাবলী নষ্ট হয়ে গেছে।'

সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের তো পাগল হওয়ার অবস্থা ! বুঝতে পারলাম, আমরা জটিল একটি পরিস্থিতির শিকার হয়েছি। যতক্ষণ ডঃ বাসু না আসছেন, কিছুই করার নেই।

পরশু পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হল না। পরদিন দুপুরে অতিকায় একটি হারকিউলিস বিমান এসে নামল আমাদের আস্তানার কিছু দূরে। ডঃ বাসু এবং—ওই তো, ডঃ জোহান হ্যামারশিল্ড। তাঁদের পিছনে বিমান থেকে নামল আরও পঁচিশ জন।

আমরা প্রায় দৌড়তে-দৌড়তেই বিমানের কাছে হাজির হলাম।

'এই যে, শঙ্কর, খবর কী বলো।' একেবারে কাজের কথা পাড়লেন ডঃ বাসু। তাঁকে দেখলে কে বলবে তিনি রোগশয্যায় ছিলেন ! ঠিক আগের মতোই টগবগ করছেন।

'পরিচয় করো। ইনি হলেন ডঃ জোহান হ্যামারশিল্ড, স্নায়ু শারীরবিজ্ঞানী। মানে নিউরোফিজিওলজিস্ট। ইনি ডঃ কামাল মুস্তাফা, ইন্দোনেশিয়ার এক নম্বর

জীবপ্রযুক্তিবিজ্ঞানী, মানে বাইওটেকনোলজিস্ট। আর ইনি ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সিঁনাপনা। জীবপদার্থবিজ্ঞানী। এবং ইনি—'

একে-একে দলের সবার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিজ্ঞানী ছাড়াও কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার।

একেবারে মিলিটারি কাণ্ড। ইঞ্জিনিয়াররা নতুন তাঁবু খাটাতে লাগলেন। আর উন্মুক্ত বরফের ওপর বসে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিটিং করতে বসলেন ডঃ বাসু। তাঁকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতেই তিনি মন্তব্য করলেন, 'জানতাম, পেঙ্গুইন দুটি তোমরা ধরতে পারবে না। হোসে কামিলো তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি চতুর। আর প্রতিভায় যে দড়, বলতেই হয়। বিপদ শুধু, সে কোনও আইনের ধার ধারে না।'

'সার, ডঃ কামিলো কি তা হলে...' বিস্ময়ে ফেটে পড়লাম যেন।

'বেঁচে আছে হে। দলবল নিয়ে বহাল তবিয়তেই আছে। একগুঁয়ে ওই পাগলটার জন্যে হাজারপাঁচেক লোক এখন উন্মাদ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাথায় হাত। ডঃ নিগুচির মেসেজ না পেলে তার রহস্য কি কোনওদিন ধরা পড়ত?'

মনের মধ্যে ঝড়, তবু নিজের রাশ টেনে ধরতে পারেন বটে ডঃ বাসু। কোনও জটিল সমস্যাই তাঁর মাথা খারাপ করতে পারে না। ডঃ নিগুচি যখন এর মধ্যে এসে পড়েছেন, বুঝতে অসুবিধে হল না, এবার সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে। শুনেছিলাম এই আন্টার্কটিকাতে আমাদের কাছাকাছি কোথাও তিনি পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন। বিকিরণপদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের কথা কে না জানে!

ডিনারের পর বৈঠকে বসলাম আমরা। আর সেই সময়, যে-কথাটা এতক্ষণ ভয়ে-ভয়ে চেপে রেখেছিলাম, সেটা প্রকাশ করলাম। বললাম, 'গতকাল রাতে আমরা সবাই একটানা এত ঘুমিয়েছি, যা কখনও হয়নি। আজ ভোরে কুলকার্নি আবিষ্কার করেছে, গতকাল যে-ক্যাসেট দুটিতে আমরা অতিবেগুনি এবং অবলোহিত রশ্মি সংক্রান্ত তথ্য ধরে রেখেছিলাম, সে-দুটি চুরি হয়েছে। পাঁচজন মানুষের পায়ের ছাপও বরফের ওপর দেখেছি।'

'চমৎকার! তা হলে দেখছি, সবই মিলে যাচ্ছে। কী বলেন, ডঃ হ্যামারশিল্ড?' ডঃ বাসুর চোখে অর্থপূর্ণ চাহনি।

'ওসলোতেও তো এমনই ঘটনাই ঘটেছিল। আমার সহকারী ক্রিস্ট এবং লোকটি আমার কাছে এসেছিল।' বললেন ডঃ হ্যামারশিল্ড, 'লোকটি পণ্ডিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বছর চল্লিশ বয়েস। কিছু-কিছু প্রোটিন অণু নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। আলোচনা করার সময়, হঠাৎ মনে হল ক্রিস্ট এবং আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। কী বলব ডঃ বাসু, সত্যিই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘণ্টা দুই পর ঘুম ভাঙলে আমরা আবিষ্কার করলাম, লোকটি চলে গেছে। আর সেইসঙ্গে আমার টেবিলের ওপর থেকে একটি টেস্ট টিউব হাওয়া। কয়েকদিন আগে আমরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি এনজাইম

আবিষ্কার করেছি। তার নমুনাই ওই টেস্ট টিউবে ছিল।'

'আর পাখি ?

'হ্যাঁ, সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। তার সঙ্গে ছিল প্লাস্টিকের তৈরি ছোট্ট একটি খাঁচা। তার ভেতর একটি সমুদ্র-চিল। প্রশ্ন করলে বলে, এই চিলটির ওপর রোগ প্রতিরোধ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে।' ডঃ হ্যামারশিল্ড বললেন।

'দেখছ, শঙ্কর। ওঁদের বেলায় ছিল চিল। তোমাদের বেলায় দুটি পেঙ্গুইন। ওঁদের ক্ষেত্রেও সেই ঘুমিয়ে পড়া। তারপর চুরি। ভাগ্য ভাল, ডঃ হ্যামারশিল্ডের গবেষণাগারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব আঁটো। বাইরের লোক এলেই গোপন টেলিক্যামেরায় তার ছবি উঠে যায়। সেই ছবি দেখেই তো ধরলাম, সেই লোকটি আসলে সাইমন। বুঝলাম, তার এবং তার দলবলের মৃত্যুসংবাদ ভুয়ো।'

সত্যিই, এবার যেন মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার। এসেছি আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করতে, অথচ তার মাঝে এল সাইমন। কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। ডঃ বাসুও যা বললেন, সবই যেন খাপছাড়া। সব কেমন জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ ডঃ নিগুচির হেলিকপ্টার এসে নামল।

'ছবিটা এনেছেন, ডঃ নিগুচি ?' কোনওরকম ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ বাসু।

'এই নিন, ছবি।' প্লাস্টিকের ফাইল থেকে একটি রঙিন ছবি বার করে সেটা ডঃ বাসুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন ডঃ নিগুচি। বললেন, 'পাহাড়ের কোলে ওই হ্রদের ছবি তুলতে গিয়ে, বলতে পারেন, আকস্মিকভাবেই এরা ছবিতে ধরা পড়ে।'

লক্ষ করলাম, ছবিতে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি।

'ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ। এই তো সাইমন, আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ। জলের ধারে করছে কী ওরা ?' ডঃ বাসু বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন : "আপনাকে টেলিফোনে সবই তো বলেছি, ডঃ নিগুচি। নতুন খবর হল, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং বলিভিয়ায় প্রায় পাঁচ হাজার রেড ইন্ডিয়ান হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেছে।'

'কী বলছেন, ডঃ বাসু !' ডঃ নিগুচির চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

অপেক্ষা না করে ডঃ বাসুর নেতৃত্বে বিকেল পর্যন্ত পুরো এলাকাটা আমরা চষে ফেললাম। হ্রদের পাশটাতেও খোঁজাখুঁজি চলল। ওপাশে বরফঢাকা উঁচু পাহাড়। তার পাদদেশে ছোটখাটো হ্রদটির জল বড়ই নিস্তরঙ্গ। সেখানে কাছেপিঠে যে মানুষ থাকতে পারে তার কোনও চিহ্নই নেই। দুপুরের দিকে কিছুটা তুষার পড়ায় ভোরে অজ্ঞাতপরিচয় যেসব মানুষের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম, সেগুলোও অদৃশ্য হয়েছে।

বিভ্রান্ত ! সত্যিই আমরা বিভ্রান্ত।

সেদিনের মতো আস্তানায় ফিরে এলাম আমরা। মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা। কিন্তু তখনও কি ভাবতে পেরেছিলাম, শেষপর্যন্ত কাদের মিয়ার কানই আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়াবে মুশকিল আসান ?

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সবে আস্তানার বাইরে পা রেখেছি, হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল কাদের মিয়া। হাঁটু অবধি বুট জুতো। সারা দেহ এবং মাথা পুরু ফারের পোশাকে ঢাকা। চোখেমুখে প্রচণ্ড উত্তেজনার ছাপ।

তাকে প্রশ্ন করব কী, তার আগেই হাত-পা নেড়ে সে নিজেই বলতে শুরু করল, 'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, হুজুর। ওই যে...যেখানটায় গিয়ে রোজ ভোরে নমাজ পড়ি...সেখানেই তো আওয়াজটা কানে ভেসে এল।'

কাদের মিয়া সদাচারী মানুষ। এই বরফের দেশে এসেও তার নিয়মিত নমাজ পড়া থামেনি।

'তা ব্যাপারটা কী ?' বেশ বিরক্তির সঙ্গেই আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী বলব, সাহেব। নমাজের শেষে বরফের ওপর কপাল ঠেকিয়েছি। তারপর বাঁ গাল। পরিষ্কার মনে হল, বরফের নীচে কিছু দূরে কিসের আওয়াজ। মাঝে-মাঝে মানুষের গলা। আওয়াজ শুনেই মাথা খারাপ। সঙ্গে-সঙ্গে বরফের ওপর ডান গাল ঠেসে ধরলাম। না, কোনও ভুল নেই। আওয়াজ একেবারে পরিষ্কার।'

আমি হাসব না কাঁদব ! বললাম, 'কাদের মিয়া, যা শুনেছ তা ভুল। বরফ সবসময় দানা বাঁধে। তাতে মাঝে-মাঝে পিটপিট শব্দ হয়।'

'কী বলছেন, হুজুর ! আমার ভুল হয়নি। আওয়াজটা অন্যরকম। মানুষের গলা শুনলাম।'

বাইরের কথাবার্তার শব্দ শুনে ইতিমধ্যে ডঃ বাসু সদলবলে আস্তানার বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। কাদেরের কথা বললাম তাঁকে। সেইসঙ্গে কাদেরের শ্রবণক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের আগের অভিজ্ঞতার কথাও বললাম।

'আশ্চর্য ! কই, চলো দেখি, আমরা শুনতে পাই কি না।' আমার কথা যে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছেন, ডঃ বাসুর কণ্ঠস্বরেই তা বুঝতে পারলাম।

কিন্তু কোথায় শব্দ ! আমরা সবাই বরফের বুকে কান চেপে রইলাম। কানের ভেতর ভোঁ-ভোঁ ছাড়া কিছুই শোনা গেল না।

কাদের কিন্তু নাছোড়বান্দা। বরফের ওপর কান ঠেসে রেখে নিশ্চুপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে 'আল্লার নামে বলছি, হুজুর, বরফের নীচে মানুষের শব্দ। তা এখান থেকে কিছুটা দূরেই মনে হচ্ছে।'

সবাই অবাক !

'একেবারে ভেলকির মতো মনে হচ্ছে।' মন্তব্য করলেন ডঃ বাসু।

ডঃ বাসুর চরিত্রের বড় একটা দিক, কোনও কিছুই তিনি হালকাভাবে নেন না। "বুঝলে কিনা, একবার কোনও কথা উঠলে তাকে যাচাই করা ভাল। অনেক সময় তাতে ফল ভাল হয়।" ছাত্রাবস্থায় তাঁর কাছ থেকে কতবার যে শুনেছি এ-কথা!

'তা হলে এখন আমাদের কী করা উচিত?' কাদের মিয়াকে প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

'আমার পিছু-পিছু আসুন, হুজুর।' কাদের বলল।

'বেশ, তাই চলো।' ডঃ বাসু এককথায় রাজি।

'একটু সবুর করুন, স্যার।' বলেই রাঘবন এবং ক্রিস্তোফার তাঁবুর মধ্যে গিয়ে নিয়ে এল তাদের সেই খুদে দুটি যন্ত্র—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমিটার।

অমন নিদারুণ অবস্থাতেও না হেসে পারলাম না। পাগল আর কাকে বলে! বাইরে বেরোলেই ও দুটি যন্ত্র তাদের সঙ্গে রাখা চাই। ঠিক ক্যামেরা-পাগলের মতো। যেখানেই যাবে সঙ্গে ক্যামেরা। যদি কোনও ভাল ছবি তোলার সুযোগ আসে। তাই ক্যামেরা ছাড়া তারা পা বাড়ায় না যেমন, ঠিক তেমনই, লক্ষ করছি, আন্টার্কটিকায় এসে ওই যন্ত্র দুটি রাঘবন এবং ক্রিস্ত কাছ-ছাড়া করে না। কে জানে, পথ চলতে গিয়ে আবহাওয়া বিষয়ক যদি কোনও নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

কাদের মিয়া কিছুদূর এগোয়, আর বরফে কান পাতে। আমরা নীরবে তাকে অনুসরণ করছি। দেখছি, পেঙ্গুইন দুটি যে-পথ বরাবর ছুটে গিয়েছিল, সেদিকেই এগোচ্ছে সে। প্রায় দু-কিলোমিটার পর এক জায়গায় এসে অনেকক্ষণ ধরে কান পাতল সে। আর তারপরেই 'এখানেই, হুজুর। নির্ঘাত এখানকার নীচে মানুষজন। তাদের গলার আওয়াজ পরিষ্কার মালুম করছি।' উত্তেজনায় তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে রাঘবনের চিৎকার, 'স্যার, এদিকে আসুন। এখানকার হাওয়াটা যেন গরম মনে হচ্ছে।'

ডঃ বাসুর সঙ্গে আমরা সবাই তার কাছে ছুটে গেলাম। ঠিক। ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমিটারে দেখা যাচ্ছে, এখানকার বাতাস থেকে বেশি পরিমাণ 'ইনফ্রারেড রে' অর্থাৎ 'অবলোহিত রশ্মি' বিকীর্ণ হচ্ছে। তার মানে এ-জায়গার বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি।

রহস্যটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানা গেল। দুজন ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের একজন চিৎকার করে ডাকল, 'ডঃ বাসু, দেখে যান কী কাণ্ড!'

সেখানে যেতেই আমাদের চোখ ছানাবড়া! এ কী দেখছি! অনেক নল। সাদা প্লাস্টিকের তৈরি। এক-একটির ব্যাস ইঞ্চি-ছ'য়ের মতো হবে। নলগুলো যে ভূগর্ভ থেকে উঠে এসেছে, বুঝতে অসুবিধে হল না। সাদা রঙ হওয়ায়

বরফের পরিমণ্ডলে চট করে তারা চোখে পড়ে না।

'কিন্তু এ আবার কী !' নলগুলোর প্রায় একশো মিটার দূরে ডঃ নিগুচি। মনে হল কিছু একটা দেখে তিনি লাফিয়ে উঠেছেন।

আবার দৌড়।

'এ যে দেখছি সিলিকন ফিল্ম !' বললেন ডঃ নিগুচি।

'তাই তো ! অনেকটা জায়গা জুড়ে বরফের বুকে সিলিকন ফিল্মের পাতলা চাদর। সাদা বরফের বুকে চট করে চেনাই যায় না। তার মানে সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাকা ব্যবস্থা। এমন আধুনিক সৌরবিদ্যুৎ-কোষের কথা তো ভাবাই যায় না ! চোখে ধাঁধা দেওয়ার কী সুচারু ব্যবস্থা।' আদর্শ নেতার মতো বেশ সংযত কণ্ঠেই মন্তব্য করলেন ডঃ বাসু।

আমাদের হতভম্ব ভাব কাটতে-না-কাটতেই মোক্ষম বোম-শেল ফাটাল ক্রিস্তোফার : 'এদিকে আসুন, স্যার ! রাস্তা পাওয়া গেছে।'

আমরা যখন সিলিকন বিদ্যুৎকোষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, সে-সময় কাদের মিয়া এবং ক্রিস্তোফার কাদের মিয়া যেখানটায় বরফের নীচে শব্দ শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সেখানে কী যেন করছিল। ক্রিস্তোফারের ডাকে আমরা ছুটে গেলাম সেখানে।

যেতেই 'এই দেখুন, স্যার—' বলেই হাতের লাঠি দিয়ে আয়তাকার একটি জায়গা দেখাল ক্রিস্তোফার। জায়গাটা লম্বায় প্রায় তিন মিটার, চওড়ায় দুই মিটার।

'দেখুন, স্যার, এখানকার বরফের কেলাস খুব নতুন—মানে, আয়তক্ষেত্রের পাশ-বরাবর লক্ষ করুন।'

ক্রিস্তোফারের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে সত্যিই দেখলাম আমরা, আয়তক্ষেত্রের সীমা বরাবর জমেছে বরফের কেলাস। মনে হচ্ছে, কয়েক ঘণ্টা আগেই জমেছে। অন্য জায়গার বরফের কেলাস পুরনো।

'যাক, হদিস তা হলে মিলল !' সেই একই সংযত ভাব ডঃ বাসুর কণ্ঠে।

সঙ্গে-সঙ্গে পরিকল্পনাটা ছকে ফেললেন তিনি। তাঁর কথামতো কুশলীরা আস্তানা থেকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসে কাজে লেগে গেল।

বেগ পেতে হল না। খননকারী যন্ত্রের চাপে ওই জায়গাটা থেকে উঠে এল বরফের একটা বিরাট চাঁই। ঠিক ঢাকনার মতো। বোঝা গেল, এটি বসানোর পর আশপাশের বরফের সঙ্গে এটি জুড়ে যায়। তারপর তার সীমা বরাবর সদ্য তৈরি বরফের কেলাসই আবিষ্কার করেছে ক্রিস্তোফার।

চাঁইটি সরাতেই সুড়ঙ্গপথ। ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে।

কালবিলম্ব না করে সেই সিঁড়িপথে আমরা নীচে নেমে এলাম। আর তারপর—কী দেখছি আমরা ! এ যে বিরাট একটি ঘর ! বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল। ঘরের এককোণে মাছ খাচ্ছে—ওই তো সেই দুই পেঙ্গুইন ! একটি বড় খাঁচায় অনেক সমুদ্র-চিলও তো ! অনেক টেবিল। টেবিলের ওপর বড়-বড়

ট্রে। নানারকম শ্যাওলায় ভরতি। অদ্ভুত ধরনের মাছও দেখছি। পাবদা মাছের মতো সাদা, রক্তশূন্য যেন। অজস্র টেস্ট টিউব, রঙবেরঙের তরলে ভর্তি। আর কতরকমই না যন্ত্র!

'এই যে, ডঃ কামিলো! কাজটা আপনি ভাল করেননি।' বেশ প্রভুত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে কতকটা চিৎকার করেই উঠলেন ডঃ বাসু, 'না না, পালানোর চেষ্টা করবেন না।'

দেখি জনাছয়েক মানুষ কখন সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গেছে। এবং ডঃ বাসুর কথা শেষ হতেই জনাদশেক ইঞ্জিনিয়ার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের কোমরে দড়ি পরাল।

'আটঘাট বেঁধেই আমি এসেছি, ডঃ কামিলো। আপনাদের সঙ্গে শিল্পপতি মঁসিয়ে পেত্রঁকেও দেখছি। তিনিই যে আপনাদের খরচ জোগাচ্ছেন, আমরা তা জানতাম। তাই ইঞ্জিনিয়ারের ছদ্মবেশে সঙ্গে কয়েকজন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পুলিশ এনেছি। তাঁরাই আপনাদের জিম্মা নিলেন।' বলেই আমাদের তিনি আদেশ দিলেন, 'জেন্টলমেন, জায়গাটা বিপজ্জনক। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।' তিনি দ্রুত পা বাড়ালেন সিঁড়ির দিকে। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম।

সবাই বেরিয়ে এলে কুশলীদের তিনি সুড়ঙ্গের মুখটি বরফচাপা দিতে বললেন।

'আপাতত এইভাবেই থাকুক। পরে এ-নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব।' তিনি মন্তব্য করলেন।

বন্দিদের নিয়ে গিয়ে রাখা হল আলাদা তাঁবুতে।

সেদিন রাতের ডিনারটি বেশ জমাটই হল। ক্রিলের কোপ্তা, ভেড়ার মাংস এবং পনিরের চাপ, এক ধরনের শৈবালের চাটনি এবং ফ্রুট স্যালাড। কাদের মিয়ার রান্না খেয়ে সবাই খুশি! আর ওই ডিনারের সময়ই মূল রহস্য ভাঙলেন ডঃ বাসু।

'জেন্টলমেন', কতকটা নাটকীয়ভাবে প্রসঙ্গটি তুললেন তিনি, 'শঙ্কর, প্রথমেই তোমাদের কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি—কারণ এই তিনদিন আমরা তোমাদের সময় কিছুটা নষ্ট করলাম। হ্যাঁ, যে-কথা বলতে চাই। বিষয়টি জরুরি, এবং আপনাদের জানা দরকার। অনিবার্য কারণে, কয়েকটি কথা আমাকে গোপন করতেই হচ্ছে। মাফ করবেন। অবশ্য, ডঃ হ্যামারশিল্ড সবই জানেন। তবে এ-ব্যাপারে আপাতত তাঁরও মুখ বন্ধ।' ডঃ হ্যামারশিল্ডের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন ডঃ বাসু। আমরা নিশ্চুপ।

'ব্যাপারটা এই।' বলে চললেন তিনি, 'আন্টার্কটিকার হিমশীতল পরিবেশে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবনধারাটা এমনই যে, আমরা যারা পৃথিবীর উষ্ণতর অঞ্চলে বাস করি, সে-সম্পর্কে তাদের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই! এখানকার বহু প্রাণীর রক্তে লোহিতকণিকা কম। তাদের শরীরে কয়েকটি বিশেষ ধরনের

এনজাইম এবং হরমোন তৈরি হয়, তা আন্টার্কটিকার প্রচণ্ড শীতে তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে প্রায় পাঁচ বছর আগে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এসেছিল এখানে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে সেই দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান ডঃ হোসে সাইমন এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। সবাই ধরে নিয়েছিল, তাঁরা মারা গেছেন। পরে একটি গোপন সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, সাইমন এবং তাঁর সঙ্গীরা বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচেই নেই, জিনপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাইরাস তৈরি করেছেন। ব্যাপারটা "মিউটেশন", অর্থাৎ জৈবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক প্রজাতির ভাইরাস থেকে সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি। এই মিউটেশনের জন্যে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন আন্টার্কটিকার প্রাণী-দেহ থেকে সংগৃহীত কয়েকটি এনজাইম এবং হরমোন। এছাড়া একধরনের বিশেষ প্রোটিন যৌগ, যা একমাত্র এখানকার দু-একটি প্রাণীর শরীরেই পাওয়া যায়, আর তার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন অতিবেগুনি রশ্মি।

'সেটা কীরকম, স্যার ?' বিষয়টি আমাদের বলে, জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'আন্টার্কটিকার আকাশে বড়-বড় ওজোন হোল তৈরি হওয়ায়, এখানে কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা বেশি। ওই রশ্মি মিউটেশনের কাজ দ্রুত চালিয়ে যায়। শঙ্কর, তোমাদের অতিবেগুনি রশ্মির ক্যাসেট এই কারণেই তারা চুরি করে। উদ্দেশ্য, যদি নতুন কোনও তথ্য পায়, তা মিউটেশনের কাজে লাগানো।'

ডঃ বাসু এবার ডঃ কামাল মুস্তাফার দিকে চাইলেন : 'আপনাকে দুটো বিশেষ খবর দিই, ডক্টর। এ-পর্যন্ত কামিলো এবং তাঁর দলবল দু-ধরনের ভাইরাস তৈরি করেছেন। এই দুটো ভাইরাস বহন করে পেঙ্গুইন এবং সমুদ্র-চিল। কোনও-কোনও রোগের ভাইরাস যেমন বিশেষ-বিশেষ প্রাণী বহন করে, ব্যাপারটা ঠিক তাই। এই দুটো ভাইরাস একমাত্র মানুষের শরীরকেই আক্রমণ করতে পারে। একটার আক্রমণে মানুষ তিন থেকে আট ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে থাকে। যেমন হয়েছিলেন ডঃ হ্যামারশিল্ড এবং তাঁর সহকারী। এবং শঙ্কর, তোমরাও। সেই অবসরে চুরির কাজ চালান কামিলো। শিক্ষিত পেঙ্গুইন তোমাদের আস্তানায় পাঠিয়ে তোমাদের ভাইরাসে আক্রান্ত করা হয়েছিল। ডঃ হ্যামারশিল্ডের ক্ষেত্রে এ-কাজটি সারে সমুদ্র-চিল। অন্য ভাইরাসটা আরও বিচিত্র এবং মারাত্মক। আপনারা নিশ্চয় জানেন, কোনও-কোনও ভাইরাস কুকুরের ক্ষতি করে না, কিন্তু তার আক্রমণে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। হোসে কামিলোর ওই দ্বিতীয় ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য, তারা কোনও-কোনও মানব সম্প্রদায়ের পক্ষে মারাত্মক রোগের কারণ হয়, অথচ অন্য সম্প্রদায়ের কোনও ক্ষতি করে না। এ-ধরনের ভাইরাস ছড়িয়েই মঁসিয়ে পেত্রঁ পাঁচ হাজার রেড ইন্ডিয়ানকে উন্মাদে পরিণত করেছেন আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং বলিভিয়ায়।

বুঝতেই পারছেন, এ-দুটো ভাইরাসের ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীরা ওঁর জবর খদ্দের হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ভাইরাস নিয়ে এ-ধরনের গবেষণা নিষিদ্ধ। তাই হোসে কামিলোর বিচার বিজ্ঞানীরাই করবেন। আর মঁসিয়ে পেত্রঁ? ওঁর কথা বাদ দিন। ব্যবসায়ীরা টাকাটাই বোঝেন বেশি। রাজনীতিবিদদের শুভবুদ্ধি না হলে মানবসমাজে ওঁদের দৌরাত্ম্য চিরকাল চলবে।'

আমরা নিশ্চুপ।

মৃদু হাসলেন ডঃ বাসু। বড়ই করুণ সে হাসি। পরক্ষণে কাদের মিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিষ্পলক চোখে দেখতে লাগলেন তার কান : 'তোমার কান নিয়েই আমাদের গবেষণা করা দরকার, কাদের মিয়া। সত্যিই তোমার কানের জবাব নেই!' মন্তব্য করলেন তিনি।

'সবই আল্লার দোয়া, হুজুর।' বলল কাদের মিয়া। তার কণ্ঠে সেই একই বিনয়। একই সঙ্কোচ।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মেঘ-চোর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



পুরন্দর চৌধুরি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেলে বললেন, 'অসীমা, এবার আমি তোমাকে এমন একটা দৃশ্য দেখাব, যা তোমার আগে পৃথিবীতে কেউ কখনও দেখেনি। এরকম দৃশ্য কেউ কল্পনাও করেনি।'

ছোট একটা রকেট আকাশের এক জায়গায় গোল হয়ে পাক খাচ্ছে। কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কম্পিউটারই রকেটটাকে ঘোরাচ্ছে।

দুটিমাত্র আসন। পাশাপাশি বসে আছেন পুরন্দর ও অসীমা। পুরন্দরের মুখখানা ফরসা ও একেবারে গোল, প্রায় চাঁদের মতন, তাঁর চোখের মণি দুটো নীল। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। বৃষ্টিবিজ্ঞানী হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাঁর নাম। সাহারা মরুভূমিতে এক মাসে একশো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে তিনি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন। এ-জন্য তাঁর প্রশংসা যত হয়েছে, নিন্দেও হয়েছে প্রায় ততটাই।

মেঘ থেকে ইচ্ছেমতন বৃষ্টিপাত ঘটানো এখন আর নতুন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি অন্য দেশ থেকে মেঘ তাড়িয়ে এনে সাহারায় বৃষ্টি ঝরিয়েছেন। সেই দেশে এবার বৃষ্টি কম হবে। একে মেঘ-চুরি বলা যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘে অনেকগুলি দেশ দাবি তুলেছে যে, মেঘ-চুরি আইন করে বদলানো দরকার।

অসীমার বয়েস সাতাশ। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে। পুরন্দর চৌধুরি বোস্টন শহরে আবহাওয়ার বিষয়ে একটি আলোচনায় যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখানে অসীমার সঙ্গে তাঁর হঠাৎ আলাপ হয়। অসীমা নিজেই পুরন্দর চৌধুরির সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

সেই আলোচনা-সভায় কারপভ নামে একজন বিজ্ঞানী পুরন্দরকে মেঘ-চোর বলে গালাগাল দেওয়ায় তিনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, চিৎকার করে কিছু বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান।

যখন তিনি চোখ মেললেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁর মাথার কাছে বসে আছে এই সুন্দরী মেয়েটি। সে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এই দুনিয়ায় পুরন্দর চৌধুরির আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। তিনি বিয়েও

করেননি। বিদেশে একটি অচেনা বাঙালি মেয়েকে তাঁর সেবা করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কে ?'

অসীমা বলেছিল, 'আপনি আমায় চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মেয়ে।'

পুরন্দর প্রথমে বিশ্বাস করেননি। তাঁর একটি ভাই ছিল ঠিকই, কিন্তু সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে পঁচিশ বছর আগে। সেই ভাইয়ের নাম ছিল দিক্‌বিজয়।

অসীমা বলেছিল, 'আমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাননি, তিনি দেশ ছেড়ে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত আলাস্কায় এসে সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একটি এস্কিমো মেয়েকে। তিনিই আমার মা। আমার বাবার বাঁ চোখের ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ ছিল, খুব ছোটবেলায় আপনিই তাঁকে একবার স্কেল দিয়ে ওইখানে মেরেছিলেন, তাই না ? আমার বাবা কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসতেন, মৃত্যুর আগেও আপনার কথা বলেছিলেন।'

বিদেশে এসে এমনভাবে একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়কে খুঁজে পেয়ে পুরন্দর চৌধুরি দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিলেন। তারপর তিনি আর অসীমাকে ছাড়তে চাননি। তাঁর নিজস্ব রকেটে তিনি অসীমাকে নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আবহাওয়ার নানারকম রহস্য দেখাচ্ছেন।

ঘুরতে-ঘুরতে এখন ওঁরা এসেছেন আলাস্কার আকাশে। অসীমা তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যেখানে থাকত, সে-জায়গাটাও দেখা হয়ে গেছে। সেখানে অবশ্য এস্কিমোদের ইগ্‌লুর বদলে এখন বড়-বড় এয়ারকন্ডিশান্‌ড বাড়ি উঠেছে। পুরন্দর চৌধুরি বললেন, 'নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, ওটা কী দেখছ বলতে পারো ?'

অসীমা বলল, 'দেখতে পাচ্ছি একটা সোনালি রঙের পাহাড়। চূড়ার বরফের ওপর রোদ পড়েছে বলে সত্যিই সোনার মতন ঝকঝক করছে।'

'ওই পাহাড়টার নাম জানো ?'

অসীমা ইতিহাসের ছাত্রী হলেও ভূগোলও বেশ ভালই জানে। সে বলল, 'আমি আলাস্কার এত দূরে কখনও আসিনি বটে, তবে এই পাহাড়টার নাম মাউন্ট চেম্বারলিন। তার পাশেই যে কুয়াশায় ঢাকা হ্রদ, তার নাম লেক শ্রেভার।'

পুরন্দর খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ ! এবার তোমাকে আমি যা দেখাব, তা কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে দারুণ হইচই হবে এই নিয়ে, কিন্তু তুমি মুখ খুলতে পারবে না। ব্যাটা কারপভ, কীরকম জব্দ হয় এবার দেখো।'

অসীমা মৃদুভাবে বলল, 'বিজ্ঞানীদের উচিত নয় কিন্তু একজন আর-একজনকে জব্দ করা।'

'বোকাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তাদের জ্ঞান কতটুকু ! আমাকে মেঘ-চোর বলে, এত সাহস ? আমি অন্যায়টা কী করেছি ? সাইবেরিয়া থেকে মেঘ এনেছি সাহারায়। সাইবেরিয়ায় অত বরফ, সেখানে বৃষ্টি না হলে ক্ষতি কী



সেই বলটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'এটা দেখছ, অসীমা। এটা আমার নিজের তৈরি। মার্কারির সঙ্গে আরও এগারোটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন অ্যালয়।...'

আছে ?’

অসীমা বলল, ‘কিন্তু একবার এ রকম শুরু করলে, তারপর যদি যে-কোনও দেশ অন্য দেশের মেঘ চুরি করতে শুরু করে ? মনে করুন, ইন্ডিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের ঝগড়া হল, তখন আপনি পাকিস্তান থেকে সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলে এলেন। তখন সে-দেশের মানুষের কী অবস্থা হবে ?’

‘আমি পৃথিবীর মানুষকে আর-একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাব। যাতে ও রকম মেঘ চুরি হলেও কোনও ক্ষতি হবে না। যাকগে, সে-কথা পরে। তুমি তো ইতিহাসের ছাত্রী, পৃথিবীতে শেষ তুষার-যুগ কবে এসেছিল জানো ?’

‘এটা ঠিক ইতিহাসের বিষয় নয়, প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। তবু আমি এটা জানি। শেষ হিমযুগ শেষ হয়েছিল তেরো হাজার বছর আগে।’

‘ঠিক বলেছ। এই লেক শ্রেভার তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে। মাউন্ট চেম্বারলিনের বরফগলা জল এই লেকে এসে জমে। আবার এই জল বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে মাউন্ট চেম্বারলিনের চূড়ায় গিয়ে আবার বরফ হয়ে যায়। এই সাইক্‌ল চলছে।’

‘যেমন সমুদ্রের জল মেঘ হয়ে উড়ে যায়। আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সমুদ্র ভরাট হয়।’

‘ওটা তো ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মতন হল। আসল বৃষ্টির হিসেবটা তোমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সারা বছর পৃথিবী থেকে কত জল বাষ্প হয়ে মেঘে উড়ে যায় জানো ? পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল। তার মধ্যে আশি হাজার কিউবিক মাইলই যায় সমুদ্র থেকে। আবার ঠিক আশি হাজার কিউবিক মাইলই বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রে ফিরে আসে। আর মাত্র পনেরো হাজার কিউবিক মাইল বৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর এত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সব বেঁচে আছে। প্রকৃতির হল এটাই নিখুঁত হিসেব। কিন্তু এবার মানুষের সংখ্যা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষের জন্যে বেশি বৃষ্টি দরকার।’

‘আপনি এখানে আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন ?’

‘হ্যাঁ। এই যে নীচে দেখছ লেক শ্রেভার, এখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। এখানে যতখানি জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে, ঠিক ততখানি বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে না। কিছুটা কম ফিরে আসছে। অর্থাৎ হ্রদটা একটু-একটু করে শুকোচ্ছে। আমি হিসেব করে দেখেছি, এই হ্রদটা পুরোপুরি শুকোতে আরও দশ হাজার বছর লাগবে।’

‘আপনি কী করে জানলেন ? ঠিক দশ হাজার বছর লাগবে ?’

‘অঙ্কের হিসেব ! তুমি পৃথিবীর যে-কোনও পাহাড়, নদী, পুকুর, খাল-বিলের কাছে আমায় নিয়ে যাও, আমি অঙ্ক কষে বলে দেব, সেখান থেকে কত জল বাষ্প হচ্ছে আর কত জল বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসছে। এই অঙ্ক আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। কারপভও কিছুটা জানে, তবে আমার চেয়ে কম।’

‘আমি তো ইতিহাস পড়ি, অঙ্ক আমার মাথায় বিশেষ ঢোকে না।’

'ইতিহাসেও তো অঙ্ক লাগে। অবশ্য সাধারণ যোগ-বিয়োগ। আচ্ছা ইতিহাসের ছাত্রী, তুমি আটলান্টিস নামে লুপ্ত সভ্যতার কথা জানো ? সেটা কোথায় ছিল বলো তো ?'

'এটাও কিন্তু ইতিহাসের বিষয় নয়। আটলান্টিসের ব্যাপারটা গ্রিক লেখকদের জল্পনা-কল্পনা। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি হয়েছে, এখনও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ঠিকঠাক।'

'আমি যদি বলি এই লেক শ্রেভারের তলাতেই চাপা পড়ে আছে ?'

'সেটা দশ হাজার বছর পরে জানা যাবে !'

পুরন্দর চৌধুরি হা-হা করে হেসে উঠলেন। ছোট্ট একটা মশলার কৌটো খুলে একটা লবঙ্গ খেয়ে বললেন, 'তুমি একটা নেবে নাকি ?'

অসীমাও একটা লবঙ্গ নিল।

পুরন্দর চৌধুরি বললেন, 'তুমি আর আমি কেউই তো দশ হাজার বছর বাঁচব না ! ততদিনে পৃথিবীতে মানুষই থাকবে কিনা সন্দেহ ! দশ হাজার বছর তো দূরের কথা, আমি দশ বছরও অপেক্ষা করতে রাজি নই।'

অসীমা চোখ বড়-বড় করে বলল, 'তা হলে কি আপনি এই লেকটা খুঁজে দেখতে চান ? এর তো প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা !'

পুরন্দর মাথা নেড়ে বললেন, 'খোঁড়াখুঁড়ি তো তোমাদের কাজ। আমি জল নিয়ে কারবার করি। জল কি খুঁড়তে হয় ? এই যে এতবড় একটা লেক পড়ে আছে এখানে, এটা অপ্রয়োজনীয়, তাই না ? কোনও মানুষ এখানে আসে না। দশ হাজার বছর ধরে লেকটা নিজে-নিজে শুকোতই—অতদিন অপেক্ষা না করে এখনই এটাকে শুকিয়ে ফেললে কেমন হয় ?'

'এতবড় লেকটা শুকোবেন কী করে ? সেই জল ফেলবেন কোথায় ?'

'মেঘ করে ছড়িয়ে দেব। সেই মেঘ কারপভের দেশে পাঠিয়ে দেব। ও খুব মেঘ-মেঘ বলে চ্যাঁচামেচি করছিল যে !'

'এই বিশাল হ্রদের জল যদি মেঘ হয়ে যায়, সেই মেঘ থেকে অন্য জায়গায় বৃষ্টি হবে। একসঙ্গে হঠাৎ বৃষ্টি বেড়ে গেলে পৃথিবীর দারুণ কোনও ক্ষতি হয়ে যাবে না !'

'কী আর হবে ! সাইবেরিয়ায় বড়জোর এক ইঞ্চি বেশি বরফ জমবে !'

অসীমা হেসে ফেলে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। এতবড় লেক কি শুকিয়ে ফেলা যায় ?'

পুরন্দর বললেন, 'বড়-বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন প্রথম হয়, তখন সবাই অবিশ্বাস করে। তোমাকে আর-একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। ঘটনাটা ছোট কিন্তু তার ফলটা হয়েছিল বিরাট। দশ লক্ষ বছরেরও কিছু বেশি আগে, এই পৃথিবীর উত্তাপ হঠাৎ একটু কমে গিয়েছিল। এ রকম হয়। পৃথিবীর উত্তাপ মাঝে-মাঝে কমে-বাড়ে। মাঝে-মাঝে—এই ধরো—দশ-পনেরো হাজার বছর পরে-পরে। আমি যেবারের কথা বলছি, সেবারে পৃথিবীর উত্তাপ কমেছিল মাত্র

তিন থেকে চার ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেলসিয়াসের হিসেবে খুব বেশি হলে দুই পয়েন্ট দুই। অতি সামান্য—তাতেই গোটা উত্তর আমেরিকাটা বরফে ঢেকে গিয়েছিল। কোথাও-কোথাও বরফ জমে গিয়েছিল এক হাজার ফিট উঁচু। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য !'

অসীমা বলল, 'আপনার কথা অবিশ্বাস করব কেন ? আমি ভাবছিলুম, আপনি আমাকে ছেলেমানুষ ভেবে ঠাট্টা করছেন !'

'না, এসব ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এবার বুঝলে তো, পৃথিবীর উত্তাপ একটুখানি কমে গেলেই কী কাণ্ড হয় ? সেইরকম পৃথিবীর উত্তাপ যদি খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই সব বরফ গলতে শুরু করবে। আগে এই তাপ কমা-বাড়াটা সূর্যের ওপর নির্ভর করত। এখন মানুষই তা পারে। যেসব পাগলগুলো অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা জমিয়ে রেখেছে, সেগুলো যদি একসঙ্গে ফাটাতে শুরু করে তা হলে পৃথিবীর সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে !'

'সে-কথা জানি ! এতবড় লেকটাকে বাষ্প করে দেওয়ার জন্যে আপনিও একটা অ্যাটম বোমা ফাটাবেন নাকি ?'

'আমি ওসব বোমা-টোমায় বিশ্বাস করি না ! আমি পুরন্দর চৌধুরি, আমার আবিষ্কার সব সময় মৌলিক। আলাস্কার এই চেম্বারলিন পাহাড়ের কাছে জনমনুষ্য নেই। এখানেই হবে আমার আবিষ্কারের পরীক্ষা। শুধু তুমি থাকবে তার সাক্ষী। তুমি আমার ভাইয়ের মেয়ে, তাই তোমাকে এই মহান দৃশ্য দেখার সুযোগও দিচ্ছি। দশ হাজার বছর পরে যে-হ্রদটার শুকিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব পাঁচ মিনিটে।'

'সত্যিই কি তা সম্ভব !'

'এক্ষুণি দেখতে পাবে !'

'এতবড় লেকটার জল বাষ্প হয়ে গেলে যে বিরাট মেঘ হবে, তার ধাক্কায় আমাদের রকেট টিকতে পারবে ?'

'আমরা মেঘলোকের অনেক উঁচুতে উঠে যাব ! মেঘ আর কতটা উঠতে পারে !'

'তারপর এতবড় মেঘকে আপনি সাইবেরিয়ায় পাঠাবেন ?'

'সবটা নাও পাঠাতে পারি, কিছু-কিছু বিক্রিও করতে পারি। যেসব দেশে বৃষ্টি কম, তাদের কয়েক টুকরো দেওয়া যেতে পারে।'

'ততদিন আপনি এই মেঘ জমিয়ে রাখবেন কোথায় ?'

'উড়িয়ে নিয়ে বেড়াব। এক দেশ থেকে আর-এক দেশে উড়ে যাবে। যে-কোনও দেশের ওপর দিয়েই মেঘ উড়ে যাওয়া তো বেআইনি নয় !'

'কিন্তু এই মেঘের সঙ্গে অন্য দেশের মেঘ উড়ে যেতে পারে না ?'

'তা পারে অবশ্য ! জানো অসীমা, এতবড় একটা জলভরা মেঘ যদি আমাদের অধিকারে থাকে, তাহলে সেই মেঘখানাকে উড়িয়ে-উড়িয়ে আমরা পৃথিবীর সব মেঘ একসঙ্গে জুড়ে নিতে পারি। তখন কোথায় কখন বৃষ্টি হবে,

তা আমি ঠিক করছি। আমি হব আকাশের দেবতা ইন্দ্র। আমার নাম পুরন্দর, তার মানে জানো তো ? যে-ক'জন বিজ্ঞানী আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে, আমার নামে নিন্দে রটিয়েছে, তাদের দেশে আমি ইচ্ছে করলে একফোঁটাও বৃষ্টি না দিতে পারি ! বিশেষ করে ওই কারপভকে আমি একবার শিক্ষা দিতে চাই !'

অসীমা হঠাৎ মুখ নিচু করে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

পুরন্দর একটু রেগে গিয়ে বললেন, 'এখনও বুঝি তোমার সন্দেহ হচ্ছে !'

অসীমা বলল, 'না, তা নয়। আপনি পঁচানব্বই হাজার কিউবিক মাইল আয়তনের এক বিশাল মেঘ নিয়ে আকাশে-আকাশে ফেরিওয়ালার মতন ঘুরছেন, আর সবক'টা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন, বৃষ্টি নেবে ? বৃষ্টি নেবে ? এটা ভাবতেই কীরকম মজা লাগছে।'

পুরন্দর বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মজারই ব্যাপার। আমি সত্যি-সত্যি অবশ্য সেরকম কিছু করব না। আমি তো মেঘের ব্যবসাদার নই। মানুষের ক্ষতি করতেও চাই না। শুধু ওই কারপভ আমাকে মেঘ-চোর বলেছে, ওর দেশে আমি এই প্রকাণ্ড মেঘটা পাঠিয়ে দিয়ে বলব, এই নাও ধার শোধ। সাইবেরিয়ায় কয়েক ইঞ্চি বরফ বেড়ে যাবে।'

অসীমা বলল, 'কিন্তু সাইবেরিয়ায় যাওয়ার আগেই যদি এই মেঘ কোথাও ভেঙে পড়ে ! কোনও দেশকে ভাসিয়ে দেয় ?'

পুরন্দর বললেন, 'সে রকম একটু ঝুঁকি আছে ঠিকই। কৃত্রিমভাবে তৈরি এই মেঘের চরিত্র কী হবে তা বলা যায় না। তবে নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সময় এ রকম একটু ঝুঁকি নিতেই হয়। অবশ্য আমার যতদূর ধারণা, আমি মেঘটাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব !'

'মনে করুন, সাইবেরিয়ার দিকে না গিয়ে এই মেঘটা আপনার দেশ কলকাতার আকাশের ওপর ভেঙে পড়ল, তা হলে সেই শহরের অবস্থা কী হবে ?'

'এ রকম জলভরা টলটলে মেঘ হঠাৎ ভেঙে পড়লে কলকাতার অর্ধেক বাড়ি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম অবস্থা আমি হতেই দেব না। মেঘটা এদিক-ওদিক গেলেই আমি ফাটিয়ে দেব কোনও নির্জন জায়গায়।'

এবারে তিনি নিচু হয়ে তাঁর বসবার জায়গার তলা থেকে একটি ফাইবার গ্লাসের বাক্স বার করলেন। সেই বাক্সের মধ্যে ফুটবলের সাইজের একটা ধাতুর বল।

সেই বলটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'এটা দেখছ, অসীমা। এটা আমার নিজের তৈরি। মার্কারির সঙ্গে আরও এগারোটি ধাতু মিশিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন অ্যালয়। এর গুণ হচ্ছে জলের ছোঁয়া লাগলেই এটা গরম হতে শুরু করে। তারপর উত্তাপ এমন বাড়বে যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দ্যাখো, হাত দিয়ে দ্যাখো, বাতাসে যে জলকণা আছে, তাতেই এটা গরম হতে শুরু করেছে। সেইজন্যেই এটাকে এয়ারটাইট অবস্থায় রাখতে হয়।'

অসীমা হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই বলটা বেশ গরম।

পুরন্দর বললেন, 'আমার হিসেব অনুযায়ী জলের মধ্যে মেশবার পর পাঁচ মিনিটেই এর উত্তাপ এত বাড়বে যে, গোটা লেকটারই বরফ গলে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে। তারপর আমরা দেখব ওর তলায় আটলান্টিস আছে কি না! দু রকম আবিষ্কারই হবে, কী বলো!'

অসীমা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা মেঘলোকের ওপরে উঠে গেলে মেঘের তলায় কী আছে তা দেখব কী করে?'

'দেখতে পেলে তো হল!'

'আপনার এই গোল ধাতুটা কি একবার গরম হয়েই নষ্ট হয়ে যাবে?'

'না, না, না, এর ধ্বংস নেই। এটা যতবার ইচ্ছে ব্যবহার করা যাবে। সব জল শুকিয়ে গেলেই এটা আস্তে-আস্তে আবার ঠাণ্ডা হতে শুরু করবে। এইবার তা হলে শুরু হোক।'

অসীমা তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলভার বার করে বলল, 'পুরন্দর চৌধুরি, ওই বলটাকে আপনি আবার ওই এয়ারটাইট বাক্সে ঢোকান। এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে।'

দারুণ অবাক হয়ে চোখ কপালে তুলে পুরন্দর বললেন, 'এ কী অসীমা! তুমি ওটা তুলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন?'

অসীমা বলল, 'আপনার দিকে অস্ত্র তুলতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু না হলে আপনি আমার কথা শুনতেন না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা একটা অপরাধ। আলাস্কার একটি লেক শুকিয়ে সাইবেরিয়ায় এতবড় একটা মেঘ পাঠালে প্রকৃতিতে মহাবিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে। ডঃ কারপভের ওপর রাগ করে আপনি পৃথিবীর ক্ষতি করতে চাইছেন!'

পুরন্দর এক ধমক দিয়ে বললেন, 'বোকা মেয়ে! ওটা সরিয়ে রাখো! পাঁচ মিনিটে এতবড় একটা মেঘ সৃষ্টি করার রেকর্ড করব আমি। তার সঙ্গে তোমার নামটাও থাকবে আমার ভাইঝি হিসেবে।'

'আমি আপনার ভাইঝি নই। আমি কারপভের মেয়ে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, আমার মা বাঙালি মেয়ে।'

'তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলে? তুমি একটা স্পাই।'

'ঠিক মিথ্যে বলিনি। আমার বাবা আপনাকে বড়ভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আপনি এক দেশের মেঘ অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে পাগলামি করছেন। সমুদ্র থেকে খাল কেটে সাহারায় জল আনা হচ্ছে, অন্য দেশের মেঘ আনার দরকার নেই।'

'তুমি, তুমি আমার এমন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার নষ্ট করে দিতে চাও? তুমি আমার ওপর গুলি চালাও, আমাকে মেরে ফ্যালো, তবু এই গোলাটা আমি হ্রদে ফেলবই। আমি মরে গেলেও পৃথিবীর লোক জানবে যে, পুরন্দর চৌধুরি

কতবড় বিজ্ঞানী ছিল।'

অসীমা একবার বাইরের দিকটা দেখে নিয়ে পুরন্দরের দিকে স্থির ভাবে চেয়ে রইল।

পুরন্দর রকেটের একটা অংশ খুলতে যেতেই অসীমা বলল, 'ওটা খুলবেন না। তাহলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাব।'

'আমি এটা বাইরে ছুঁড়বই!'

'ছুঁড়ুন তাহলে। কিন্তু জানলা-টানলা খুলবেন না। এই সকেটের মধ্যে ফেলুন, নীচের পরপর কয়েকটা ভাল্‌ভ খুলে গিয়ে এটাকে বাইরে বার করে দেবে।'

'তার মানে! তুমি কী বলছ? জানলা খুলব না কেন?'

'ডক্টর পুরন্দর চৌধুরি, আপনি আবহাওয়া-বিজ্ঞানী। আমি কিন্তু শুধু ইতিহাসের ছাত্রী নই, কম্পিউটারেই আমার বিশেষ আগ্রহ। আগে থেকে প্রোগ্রাম করে রেখেছিলাম। কম্পিউটার এখন রকেটটাকে বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে পৃথিবীর অনেক ওপরে নিয়ে এসেছে। লেকটাকে কি আর দেখতে পাচ্ছেন? এখান থেকে আপনার বলটা ছুঁড়লেও লেকে পড়বে না। বলটা আস্তে-আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে না?'

পুরন্দরের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। সেই সুন্দর চেহারার মেয়েটার মাথায় এতসব বুদ্ধি! বায়ুমণ্ডলের বাইরে তাঁর অ্যালয়টা অকেজো!

অসীমা বলটা পুরন্দরের হাত থেকে নিয়ে ফেলে দিল সকেটে। তারপর বলল, 'ওটা মহাশূন্যেই থাক। তাহলে কোনওদিন আর জলের ছোঁয়া পাবে না। পৃথিবীর জল যেমন আছে তেমনই থাকুক!'

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কলম্বাসের বাবা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়



ভবানীপুর স্পোর্টিং-এর সঙ্গে আমাদের ক্লাবের খেলা, কাল বিকেল তিনটেয়—খবরটা গৌতম আগেই দিয়ে গিয়েছিল। তারপর আধ ঘণ্টাও হয়নি— জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম সাইকেল থেকে কেষ্টাকে নামতে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পড়ার টেবিল ছেড়ে দৌড়েছি। খুব সময়ে পৌঁছে গেছি যা হোক। দেখি বাঁটুটা গোড়ালি উঁচু করে ঘণ্টি টেপার চেষ্টা করছে, হাত পৌঁছচ্ছে না।

'বাজাস না।' গম্ভীর গলায় বললাম। সকাল থেকে আমার বন্ধুদের ভাগাতে-ভাগাতে মা টায়ার্ড। আবার এখনই ঘণ্টি বাজলে মহা কেলেঙ্কারি হত।

'শোন, তোকে ভয়ঙ্কর দরকার।' কেষ্টা বলল।

'জানি। খেলা তো ? গৌতম বলে গেছে।'

'তুই আসবি। তোকে খেলতে হবে। পরীক্ষা-ফরিক্ষা দেখাস না।'

'পরীক্ষা-ফরিক্ষা মানে ? ইয়ার্কি পেয়েছিস ? পরীক্ষা দিতে হবে না ?'

'দিতে তো হবেই। পরীক্ষা সবসময়েই দিতে হবে। তবে কাল দুপুরে তুই খেলতে আসছিস। আমাদের ম্যান কম পড়েছে।'

'আমাকে বাদ দে।' কেষ্টার মতো আকাট মুখ্যুকে কিছু বোঝানো সম্ভব না। মাসের মধ্যে অন্তত পনেরো দিন যে ক্লাস কেটে সিনেমা দেখতে চলে যায়, সে কী করে বুঝবে পরীক্ষার মর্ম! স্কুল ফাইনালে পাশ-ফেলের ওপর সমস্ত ভবিষ্যৎ, চাকরি পাওয়া, ও তার কী জানতে পেল। আমিও অবশ্য খুব বেশি জানতাম না, তবে যেদিন থেকে বাবা বলেছেন চাকরি না পেলে না খেয়ে থাকতে হবে, সেদিন থেকে ব্যাপারটা বুঝতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু ম্যান কম পড়েছে শুনে থমকে যেতে হল। 'কে খেলছে না ?'

'পিকু গেছে মামার বাড়ি। দেবাশিসের জ্বর। শান্তনু বিশেষ কাজে ব্যস্ত।'

শান্তনুর বিশেষ কাজ কী, তা আমার ভালভাবেই জানা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, শান্তনুকে আমি রাজি করিয়ে দেব। তাহলে হচ্ছে তো এগারো জন ?'

★

দরজায় সাঙ্কেতিক টোকা মারতেই শান্তনু জানিয়ে দিল কেটে পড়তে। ওর নাকি কথা বলার সময় নেই। এখন কারও সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা। আমিও কি ছাড়বার পাত্র ! অনেক ধাক্কাধাক্কির পর যখন পুরো গ্যাং নিয়ে আসার ভয় দেখালাম, তখন ও এই এতটুকু ফাঁক করল। সেই সুযোগে দিয়েছি কাঁধটা ঢুকিয়ে। ঠেলাঠেলি, হুড়োমুড়ি, ধস্তাধস্তি— শেষপর্যন্ত আমার জিত। হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে হাত-পাগুলো সেট করে নিচ্ছি, এই ফাঁকে শান্তনু আর একটা ল্যাং মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হবি তো হ, নিজেরই টেব্‌ল-ল্যাম্পের লম্বা তারে পা জড়িয়ে সমস্ত এনার্জিসমেত নিজেই মাটিতে পড়েছে ধাঁই করে। তখন আমাকেই এগিয়ে এসে উদ্ধার করতে হল ওকে।

শান্তনু ইলেকট্রিক আলো নিয়ে সর্বদাই নানারকম পরীক্ষা করছে। ওর ঘরে নানারকম কায়দার আর পাওয়ারের আলোর ছড়াছড়ি। মেঝেয় এতরকম তার এদিক থেকে ওদিক গেছে যে, পাপোশ চাপা থাকা সত্ত্বেও হোঁচট না খেয়ে চলা শক্ত। কখন কোথায় কী সুইচ লাগাচ্ছে, কোন তার জুড়ছে ! ঘরটার একটা বিতিকিচ্ছি চেহারা। আজ নির্ঘাত কোনও নতুন রকম আলো লাগাবার চেষ্টা চলছে, তাই এত সাবধানতা। গত সপ্তাহে স্বপ্ন দেখার আলো বানাতে গিয়ে ফিউজ উড়িয়েছিল। তখন আবার বাইরের ঘরে মেসোমশাইয়ের অফিসের কয়েকজন জরুরি কথাবার্তা বলতে এসেছিলেন। তারপর থেকে শান্তনুর ইলেকট্রিকাল এক্সপেরিমেন্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে।

আমি উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বানালি দেখা।'

'আরে দাঁড়া, দাঁড়া। দেখানো কি অত সহজে যায় ?'

'পুরোটা হয়নি বুঝি ?'

'একটা বিরাট আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। ঢুকতে হবে।'

'আবিষ্কার ! হাসালি। তাও আবার তুই করেছিস ! কেন, ইলেকট্রিসিটি কি এর আগে কেউ আবিষ্কার করেনি নাকি ?'

'দ্যাখ বুবলু, তুই এক-একসময় কীরকম বোকা মেরে যাস। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানেই বুঝি ইলেকট্রিসিটি আর টেলিফোন ? ওসব তো পরীক্ষার খাতায় "এসে" লেখবার জন্যে— বিজ্ঞান কি আশীর্বাদ না অভিশাপ। আমার আবিষ্কারটা একেবারে নতুন না হলে—'

'নতুন না হলে আর আবিষ্কার কী ?'

'বুঝবি, বুঝবি, ক্রমে-ক্রমে বুঝবি। সব আবিষ্কারই নতুন হয় না !'

নাঃ, এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। একেবারে ইম্পসিবল। আর কোনও প্রশ্ন না করে খাটের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসলাম। একটু পরেই মনে পড়ে গেল জুতোটা খোলা হয়নি— কিন্তু শান্তনুর মনপ্রাণ তখন আবিষ্কারের উত্তেজনায় টগবগ করছে, ওসব দিকে নজর দেওয়ার তার সময় কোথায়। তাছাড়া ওর নিজেরই, চান করে বেরিয়ে আসার পরেও আমি দেখেছি,

গোড়ালিতে কাদার ছোপ লেগে থাকে।

বসে-বসে দেখতে লাগলাম ওর কাণ্ডকারখানা। ওর পড়ার টেবিলের পিছনের দেওয়ালে একটা বোর্ডের মতো জিনিস আছে— সেটা আসলে ঘষা কাচের পিছনে সবুজ পেইন্ট করা। তার এদিক থেকে ওদিক অনেকগুলো লাট্টু টাইপের ছবি আঁকা রয়েছে। চেহারাগুলো দেখে যেন চিনি-চিনি মনে হয়, কিন্তু ভাল করে মনে আসে না। টেবিলের ওপর গোটাদশেক বই খোলা অবস্থায়, চেয়ারে কিসের যেন মডেল, শান্তনু নিজে মাটিতে উপুড় হয়ে অঙ্ক কষছে।

দরজায় টোকা পড়ল। শান্তনু হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আবার এসেছ বিরক্ত করতে?'

'চা, দাদাবাবু।' খুদিরামের সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে ওকে আমি বরাবরই পছন্দ করি। শান্তনুর হুঙ্কার শুনে খুদিরাম মোটেই দমল না।

'চা-জলখাবারটা খেয়ে নিন, দাদাবাবু। তারপর লেখাপড়া করবেন।'

'দ্যাখো খুদিরাম, বেশি ফ্যাচফ্যাচ করেছ তো ওই গরম চা দেব তোমার মাথায় ঢেলে—'

আমি ততক্ষণে একলাফে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছি। খুদিরামের হাত থেকে খাবারের ট্রেটা তুলে নিয়ে বললাম, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই, খুদিরাম। দাদাবাবু না খায় আমি তো আছি।'

খুদিরাম আমাকে দেখে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে আমার হাতে ট্রে সমর্পণ করে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিল। সম্ভবত আরও কিছু কচুরি আর আলুর দম সাপ্লাই করার উদ্দেশ্যে।

আমি চটপট গোটা তিনেক আলু একটা কচুরিতে মুড়ে মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে ভরাট গলায় বললাম, 'এবার বুঝিয়ে বল।'

শান্তনুর দৃষ্টি তখন কচুরি ছাড়িয়ে আলুর দম পার হয়ে আরও সুদূরে প্রসারিত। সে কোনও উত্তর দিল না।

'ওইগুলো কিসের নকশা এঁকেছিস?' সেকেন্ড কচুরিটা কবজা করতে-করতে আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

'পরমাণু কাকে বলে খবর রাখিস?'

ও হরি! এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। ওগুলো হল নানা জাতের পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর তাদের চারপাশে ছুটন্ত ইলেকট্রনদের ছবি। মেসোমশাই, মানে শান্তনুর বাবা, একজন পরমাণু-বিজ্ঞানী। যেদিন থেকে উনি শান্তনুকে ওঁদের প্রোজেক্টের বিশাল ম্যাগনেট দেখিয়ে এনেছেন, তার পর থেকে পরমাণুর ভূত শান্তনুর মাথায় ভর করেছে। মেসোমশাইদের মেশিনে নাকি পরমাণুর গুঁড়ো প্রচণ্ড জোরে ঘোরানো হবে। এমন জোরে যে, তার থেকে ছিটকে-ছিটকে প্রোটন, নিউট্রন সব বেরিয়ে আসবে আর মোটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সুইচ টিপে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করা হবে। শান্তনু সর্বদাই আমাদের এই বিষয়ে এতরকম জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে যে, মনে হয় স্কুল



'...কলম্বাস তাঁদের একটি সেদ্ধ ডিম দেখিয়ে বললেন, এটা আপনারা কেউ দাঁড় করান তো দেখি। কিন্তু ডিম কি কখনও দাঁড় করানো যায়?...'

ফাইনাল দেওয়ার আগেই ও পিএইচ. ডি. থিসিসটা রেডি করে ফেলেছে। তবে ও যে ওই বোর্ডে ছবিগুলো এঁকেছে—নানারকম পরমাণু, কোনওটার নিউক্লিয়াস ঘিরে একটা ইলেকট্রন ঘুরছে, কোনওটার ষোলোটা, কোনওটার সাতানব্বই, সে তো ওই ইলেকট্রনের কক্ষপথ গুনেই বলা যাবে কোন্‌টা হিলিয়াম, কোন্‌টা হাইড্রোজেন, কোন্‌টা সোডিয়াম। এর মধ্যে আর নতুন কী আছে! এসব তো যে-কোনও ক্লাস টেনের ছেলের জানা।

শান্তনু কি তাহলে নতুন কোনও আইসোটোপ বার করার ফন্দি আঁটছে? আইসোটোপ কাকে বলে, আমরাও একটু-আধটু বুঝি। রেডিওঅ্যাকটিভ আইসোটোপ অনেক কাজে লাগে। সেবারে কোত্থেকে একদল হোমরাচোমরা এসেছিলেন মেসোমশাইদের প্রোজেক্ট দেখতে। তাঁদের মধ্যে একজন সবজান্তার মতো মন্তব্য করেছিলেন, 'এই যে আপনারা এখানে আইসোটোপ বানাচ্ছেন, এগুলো বিদেশ থেকে আনা মানে, ইম্পোর্টেড আইসোটোপের চেয়ে ভাল তো?' শুনে প্রোজেক্টসুদ্ধ লোকে বহু কষ্টে হাসি চেপেছিল।

শান্তনু খুব গম্ভীর মুখ করে খাতা থেকে চোখ তুলল। তারপর পেনসিল দিয়ে মাথার খুলিটা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, 'দ্যাখ বুবলু, সমস্ত আবিষ্কারই আসলে খুব সহজ। মাধ্যাকর্ষণ যেমন। গাছ থেকে আপেল নীচে পড়বে, এ তো সহজ কথা। সহজ বলেই তো শক্ত রে! তোর কি কোনওদিন মাথায় আসত যে, পৃথিবী আপেলকে টানছে? তোর মাথায় তো আসতই না। তবে আমার কথা আলাদা। কলম্বাসের ব্যাপারটা দ্যাখ। আমেরিকা আবিষ্কার—ফাটাফাটি কাণ্ড। কলম্বাসের খাতির দেখে দেশের সবাই জ্বলেপুড়ে মরছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কলম্বাস ভাবলেন, এদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। উনি একটা সেদ্ধ ডিম নিয়ে বললেন—'

'কথা নেই, বার্তা নেই, সেদ্ধ ডিম আবার কোথা থেকে এল?'

'আকাশ থেকে পড়ল। ওঁরা তখন খেতে বসেছেন রে গাধা। বিরাট ভোজসভা, অনেক মান্যগণ্য লোক। কলম্বাস তাঁদের একটি সেদ্ধ ডিম দেখিয়ে বললেন, এটা আপনারা কেউ দাঁড় করান তো দেখি। কিন্তু ডিম কি কখনও দাঁড় করানো যায়? কেউ পারছেন না দেখে কলম্বাস বললেন, তাহলে আমি করে দেখাই, আপনারা সব দেখুন। এই বলে উনি ছুরি দিয়ে ডিমের তলার খানিকটা উড়িয়ে দিলেন। তলাটা চ্যাপটা হয়ে গেল। তখন ডিম ঠিকই দাঁড়াল। সবাই বলে উঠলেন, এ আর কী, এ তো সকলেই পারে। কলম্বাস গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার আগে আর কেউ পেরেছিলেন কি?'

আমি বললাম, 'তুই নিজেকে কলম্বাসের সঙ্গে তুলনা করছিস! তা ভাল। কিন্তু আবিষ্কার না হতেই কলম্বাস। তুই তো দেখছি কলম্বাসের বাবা হয়ে গেলি।'

শান্তনু আমার কথায় কর্ণপাত না করে বলল, 'ওই কালো মোটা ফিজিক্স

বইটার একশো তেত্রিশ পাতা খোল। কী দেখছিস?'

'চিত্র নম্বর একুশ পয়েন্ট তিন। পর্যায় সারণি।'

'বুঝলি কিছু? ভাল করে পড়ে দ্যাখ। বোঝবার চেষ্টা কর।'

চেষ্টা করলাম। পাতা জুড়ে চৌখুপি ঘর কাটা, প্রত্যেকটা ঘরের মাঝখানে দুটো করে ইংরেজি অক্ষর, তাদের মাথার ওপরে, নীচে, ডান দিকে খুদি-খুদি করে লেখা কিছু সংখ্যা। ইংরেজি অক্ষরগুলো বুঝতে পারলাম মৌলের রাসায়নিক সঙ্কেত, যেমন এইচ মানে হাইড্রোজেন, এম জি মানে ম্যাগনেসিয়াম, কিন্তু সংখ্যাগুলো কী?

শান্তনু ততক্ষণে অঙ্কস্যারের কায়দায় বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে। 'তুই জিজ্ঞেস করছিলি কী এঁকেছি, তাই না?'

'জানি, জানি। এঁকেছিস পরমাণুর চেহারা। মাঝখানে নিউক্লিয়াস, বাইরে ইলেকট্রন ঘুরছে।'

'রাইট। এখন চার্টের দিকে তাকা, হিলিয়ামের পরমাণু কেন্দ্রে আছে দুটো প্রোটন, দুটো নিউট্রন, বাইরে দুটো ইলেকট্রন। চৌকো ঘরগুলোর নীচের বাঁদিকে দেওয়া আছে পরমাণু সংখ্যা, মানে ইলেকট্রন প্রোটন সংখ্যা। যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে, ততগুলো প্রোটন। চার্টের তলার দিকে চলে আয়। মাঝখানে এই "এ ইউ"টা কিসের সঙ্কেত জানিস?'

'জানি। সোনার।'

'বাঃ, কিছু জানিস তাহলে। সোনায় প্রোটন, ইলেকট্রন সংখ্যা কত দেখছিস?'

'উনআশি।'

'আচ্ছা। সীসে অর্থাৎ লেড-এর ইলেকট্রন প্রোটন কতগুলো?'

'সীসে মানে পি বি। কোথায় গেল? হ্যাঁ, এই তো, বিরাশি।'

'তাহলে তফাত কত?'

'কিসের তফাত?'

'বিরাশির সঙ্গে উনআশির?'

তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছি। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'শান্তনু, তুই যে সেকালের অ্যালকেমিস্ট হয়ে গেলি! তুই ভাবছিস সস্তা ধাতুর প্রোটন ইলেকট্রন কমিয়ে তাকে সোনায় পরিণত করবি?'

অ্যালকেমিস্ট বলাতে খেপে লাল হয়ে গেল শান্তনু। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'অ্যালকেমিস্ট! অ্যালকেমিস্টরা না-জানত ফিজিক্স, না-জানত কেমিস্ট্রি। ওরা কেবল বিশ্বাস করত, বস্তুর রূপান্তর ঘটানো যায়। আর কিছু জানত না। বিশ্বাসে ভেলকি দেখানো যায়, বিশ্বাস দিয়ে সায়েন্স হয় না, বুঝলি? ওরা মনে করত এলোপাতাড়ি পরীক্ষা করতে-করতে ওরা ঠিক বেস মেটালকে সোনায় বদলাতে পারবে। এই মনে করে তারা এটার সঙ্গে ওটা মেশাত, জলে গুলত, আগুনে ফোটাত, ঠাণ্ডা করত—পাথর, ধাতু, তরল, দ্রবণ, সবরকম জিনিস নিয়ে

দেখত কিসের সঙ্গে কী যোগ করলে সীসে বদলে হয়ে যাবে সোনা। কেউ কি করতে পেরেছিল ? পারেনি। তার কারণ ওরা পদার্থের আসল গঠনটাই জানত না—পারমাণবিক গঠন। এটা জানত না যে, আগুনে ফোটালে কিংবা জলে ভেজালে পারমাণবিক বিক্রিয়া হবে না। তার জন্যে চাই দারুণ পাওয়ারফুল অ্যাকসিলারেটর।'

'কত পাওয়ারফুল ?' আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ধরে নে একশো মিলিয়ন ভোল্ট। এটার জন্যে আর-একটু অঙ্ক কষতে হবে।'

আমি আস্তে-আস্তে বললাম, 'শান্তনু, তুই যা ভাবছিস, তা অসম্ভব! মেসোমশাইদের অ্যাকসিলারেটরে এইসব ছেলেখেলা তোকে করতে অ্যালাউ করবে ওরা ?'

'ছেলেখেলা নয়। আমি অনেক ভেবেছি। বাবার সঙ্গে অবশ্য এ-বিষয়ে এখনও কথা বলা হয়নি। কষে দেখতে হবে ঠিক কত জোরে হিট করলে তিনটে প্রোটন ছিটকে বেরিয়ে আসবে— তারপরে অবশ্য বেরিয়ে আসা প্রোটন নিয়ে অন্য সমস্যা আছে, সেটার একটা সমাধান বার করতে হবে।'

আমি বললাম, 'শান্তনু, সোনা বানানো যদি এতই সহজ, তাহলে এতদিন সব পরমাণু-বিজ্ঞানীরা করছিল কী ?'

'ওদের কি কোনও প্র্যাকটিকাল বুদ্ধি থাকে ? একমাত্র এডিসন ছাড়া আর কোনও প্র্যাকটিকাল বুদ্ধিওয়ালা সায়েন্টিস্ট দেখেছিস তুই ?'

'দুঃখের বিষয়, এডিসনকেও আমি দেখিনি।' আমি উঠে পড়লাম। কচুরিগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঙুল চাটতে-চাটতে বললাম, 'চা-টা তুই খেয়ে নে।'

চেয়ারে বসে-বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। তখন নিশ্চয়ই অনেক রাত। সবাই শুয়েটুয়ে পড়েছে। নিঝুম রাতে হঠাৎ শুনলাম দমকলের আওয়াজ, তারপরেই টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং, প্রায় একই সঙ্গে সাইরেনের ভোঁ। তারপরেই শুনলাম রেডিওতে খবর পড়া হচ্ছে— কাল মধ্যরাত্রে একটি বাড়ি রহস্যজনক বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। অনেক লোকের চলাফেরা, উত্তেজিত কথাবার্তা। ঘুমের মধ্যেই আমি ভাবলাম, আরও যাও সীসের প্রোটন আলাদা করতে। সোনা করার চেষ্টা! এখন হল তো ? খুব শিক্ষা হল শান্তনুচন্দ্রের।

স্বপ্নের কথা ঘুম ভেঙে গেলে মনে থাকে না, কিন্তু কাল রাত্রের ব্যাপারটা এত সত্যি বলে মনে হচ্ছিল যে, সকালবেলা ভয়-ভয় করতে লাগল। সত্যিই কিছু হল নাকি ? খবরের কাগজটা আসতে এত দেরি করে! এলেও কি সেটা আমার হাতে সহজে পৌঁছয় ? কী করি ?

একটা খাতা আনবার নাম করে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি মেসোমশাই অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছেন। এই সময়টা ভীষণ তাড়াহুড়ো, কোনও জিনিস সামনে থাকলেও খুঁজে পাওয়া যায় না, বাড়িসুদ্ধ সবাই ওঁর কাছে বিনা কারণে বকুনি খায়। আমি কোনওমতে অদৃশ্য থাকার চেষ্টা করতে-করতে সুট করে শান্তনুর ঘরে গিয়ে ঢুকেছি।

ঢুকে দেখি বোর্ড পরিষ্কার। টেবিল থেকে সব কালো মোটা বই উধাও। শান্তনু লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

'এ কী, তুই এখনও ঘুমোচ্ছিস ? এটা কি কলম্বাসের বাবার উপযুক্ত কাজ ?'

শান্তনু চোখ খুলল। খুলেই আবার ঘুমোবার জন্য পাশ ফিরল।

'তোর এক্সপেরিমেন্ট ফুটে গেল নাকি ?'

এতক্ষণে জেগে ওঠার লক্ষণ দেখা গেল। শান্তনু উঠে বসল। বলল, 'বাবা বললেন, আইডিয়াটা খুব নতুন। হিসেবেও কোনও ভুল নেই। কিন্তু অত জোরে হিট করার জন্যে যে অ্যাকসিলারেটর চাই সেটা হতে হবে অন্তত দেড় কিলোমিটার লম্বা। তাছাড়া তৈরি করতেও খরচ পড়বে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা। বানাতেও লাগবে কমসে কম দশ বছর। তার মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে-বাড়তে টোটাল খরচা চল্লিশ কোটিতে গিয়ে ঠেকতেও পারে। বাবা বললেন, অত কাণ্ড করে সস্তা মেটালকে সোনা বানাতে যা খরচ পড়বে, তাতে নকল সোনাই হয়ে যাবে আসল সোনার চেয়ে দামী।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।' আমি গম্ভীরভাবে বললাম !

শান্তনু বিছানা থেকে ওঠবার উপক্রম করতেই আমি একলাফে দরজার বাইরে। যাওয়ার আগে গলাটা বার করে ঘোষণা করে গেলাম, 'তাহলে আজ বিকেলে তুই খেলছিস। যাই, কেষ্টাদের বলে আসি।'

ছবি : দেবাশীষ দেব

উলট-পুরাণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



বাইরের জরুরি কাজ সেরে ফিরতে এবার একটু দেরিই হল বজ্রবাহুর। কাজটাও ছিল ঝামেলার আর দূরত্বটাও বড় কম নয়। তবে দেরি হলেও বাড়ির খবর নিয়মিতই পেয়েছেন। তাঁর মা, বাবা, স্ত্রী এবং খোকাখুকিরা ভালই আছে। আড়াই হাজার বছরে আর এমন কী-ই বা বিশেষ পরিবর্তন হবে!

এই আড়াই হাজার বছর শুনতে যতটা, কার্যত তো ততটা নয়। কারণ মহাকাশ পাড়ি দিয়ে ভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জে যেতে-যেতে আপেক্ষিক নিয়মে যতটা সময় লাগে, তার ঢের বেশি সময় পৃথিবীতে অতিক্রান্ত হয়। আর কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে সময় তো টেরও পাওয়া যায় না। বজ্রবাহু যে-নক্ষত্রের মণ্ডলে গিয়েছিলেন সে-নক্ষত্রটি সূর্যের চেয়ে দশগুণ বড়। আর তার মণ্ডলে রয়েছে অন্তত আড়াইশো সবুজ সজীব গ্রহ, যার প্রত্যেকটিই মানুষের পক্ষে বাসযোগ্য। তাদের মধ্যে অন্তত কুড়িটিতে অতি সুসভ্য সব জীবের বাস, যারা অনেকটাই মানুষের মতো। তবে বিজ্ঞানে তেমন উন্নতি করেনি। এইসব গ্রহে-গ্রহান্তরে ঘুরে-ঘুরে বিস্তর গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে বজ্রবাহু ও তাঁর দলকে। তাঁদের সফর খুবই সফল হয়েছে, পৃথিবীতে তাঁদের খুবই প্রশংসা হচ্ছে। আলোর চেয়েও বহু-বহুগুণ গতিবেগসম্পন্ন কণিকা তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের নিত্যই কথাবার্তা হত। নতুন এই মণ্ডলের সুসভ্য প্রাণীদের কয়েকজনকে নিয়ে আসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু জীবগুলি খুবই আদুরে। তাদের গ্রহগুলিতে এত খাদ্যশস্য, এত ভাল আবহাওয়া এবং এমনই আরামে তারা আছে যে, মাথা ঘামিয়ে বা খেটেখুটে কিছুই করতে হয় না। ফলে তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এসব নিয়ে খুব বেশি মাথাও ঘামায় না। খায়দায়, দিনরাত ফুর্তি করে। তবে মোটরগাড়ি বা এরোপ্লেনের মতো সেকেলে যানবাহন তাদের আছে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, বিজলি বাতি আছে। তার চেয়ে বেশিদূর আর এগোয়নি। এগোতে বিশেষ আগ্রহও নেই। বজ্রবাহু প্রায় এক হাজার বছর ধরে এইসব গ্রহে ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন বুদ্ধিমান জীবকে উন্নত প্রযুক্তিতে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তারা একটু শেখে, তারপর আর গা করে না। এমনকি

যে-বিজ্ঞানের বলে পৃথিবীর মানুষ অমরত্ব অর্জন করেছে তাও তারা একরকম প্রত্যাখ্যানই করেছে। তাদের ভাবখানা হল, প্রকৃতির নিয়মে যা হওয়ার হবে, আমাদের বেশি আস্থা নেই। ফলে তারা কেউই বজ্রবাহুর সঙ্গে পৃথিবীতে আসতে চায়নি। এই একটা ব্যর্থতা ছাড়া বজ্রবাহুর সফর খুবই সফল। তিনি নানা অদ্ভুত উদ্ভিদ ও মাটি, ধাতু ও শিলাখণ্ড এনেছেন। এনেছেন ওইসব গ্রহের নানা শিল্পের নমুনা। আরও অনেক কিছু।

পৃথিবীর মহাজাগতিক অবতরণ-কেন্দ্রে তাঁদের খুব জাঁকালো রকমের স্বাগত জানানো হয়েছে। বিশ্বরাষ্ট্রপতি স্বয়ং এসে তাঁদের অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানিয়েছেন। বজ্রবাহু ও তাঁর দলের পাঁচশোজন সদস্য পৃথিবীতে নেমে দেখলেন সবই সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার মতোই আছে। তেমন সাঙ্ঘাতিক কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিছু নতুন বাড়িঘর, রাস্তাঘাট হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর বিজ্ঞান এমন চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছে যে, নতুন কিছু আবিষ্কারও আর তেমন ঘটে না। মানুষ অমরত্ব অর্জন করায় আর নতুন মানুষ জন্মায় না। তবে কিছু মানুষ যখন অন্য গ্রহে স্থায়ীভাবে বাস করতে চলে যায় তখন কিছু মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে বজ্রবাহুর বাবা, মা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও ছিল। সকলেই একই রকম আছে। কারও বয়সই তিন-চার হাজারের কম নয়। শুধু ছোটরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে এছাড়া আর কোনও পরিবর্তন নেই। বজ্রবাহুকে দেখে তাঁরা সকলেই যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাড়িতে ফিরে বজ্রবাহু বহুদিন পরে পোস্তচচ্চড়ি আর চালতার অম্বল দিয়ে ভাত খেলেন। যেসব গ্রহে গিয়েছিলেন সেখানকার খাদ্যদ্রব্য অন্যরকম। পুরনো অভ্যস্ত খাবার খেয়ে বহুকাল পর ভারি খুশি হলেন বজ্রবাহু। সকলের সঙ্গে বসে গল্পটল্প করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বিভিন্ন মিটিং ও সংবর্ধনা সভায় যেতে হল।

এরকমই একটা মিটিঙে তাঁর সফরসঙ্গীদের অন্যতম পুণ্ডরীক বজ্রবাহুকে কানে-কানে বলল, 'ওহে বজ্রবাহু, মানুষের হাসিখুশির ভাবটা বেশ খানিকটা কমে গেছে, লক্ষ করেছ ?'

বজ্রবাহুর হঠাৎ মনে হল, পুণ্ডরীক মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যিই, ওপর-ওপর সবাই একটা খুশিয়াল ভাব দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন। নিজের স্ত্রী, ছেলেমেয়ের মধ্যেও যেন এটাই আজ লক্ষ করেছেন তিনি, কিন্তু ধরতে পারেননি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলো তো পুণ্ডরীক! আড়াই হাজার বছরে এমন কী হল ?'

পুণ্ডরীক মাথা চুলকে বলে, 'কিছুই তো হওয়ার কথা নয়। পৃথিবীর কোনও পরিবর্তন দেখছি না। বিবর্তনও বহুকাল হল থেমে গেছে। মানুষের কোনও দুঃখ বা অভাব নেই। সুতরাং কী ঘটতে পারে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তবে একটা জিনিস লক্ষ করছি, পৃথিবীতে আগের তুলনায় গাছপালা কিছু বেড়ে

গেছে।'

বজ্রবাহু ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'গাছপালা বেড়ে গেছে? কিন্তু সে রকম তো কথা নয়! আবহমণ্ডলের জন্যে যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই গাছপালা পৃথিবীতে থাকার কথা।'

পুণ্ডরীক মাথা সামান্য নেড়ে বলে, 'উদ্ভিদ-উপদেষ্টার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি এ-ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাইছেন না। শুধু বললেন, গাছ বাড়লে শেষ অবধি মানুষের উপকারই হবে। কথাটা হেঁয়ালির মতো ঠেকল। কিন্তু উনি আর ভাঙলেন না।'

বজ্রবাহু নিজে আবহাওয়া ও উদ্ভিদের একজন বিশেষজ্ঞ। কথাটা তাঁরও হেঁয়ালির মতো ঠেকল। মানুষজন, জন্তু-জানোয়ার এবং আবহাওয়ার একটা অনুপাত হিসেব করেই গাছপালার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গাছ বাড়লে মানুষের কী উপকার হবে তা বজ্রবাহুর মাথায় এল না।

পৃথিবীতে আড়াই হাজার বছরের মেলা বকেয়া কাজ জমে আছে। ফলে বজ্রবাহু ও তাঁর দলবল এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না। তাঁরা বকেয়া কাজ সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তবে আজকাল কাজকর্ম বেশিরভাগই যন্ত্রের মাধ্যমে সমাধা হয়ে যায় বলে তেমন গা ঘামাতে হয় না। বজ্রবাহুদের খাটতে হচ্ছিল অন্যান্য গ্রহ থেকে আনা তথ্যাবলী রেকর্ড করে রাখতে এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে।

বজ্রবাহুর বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাড়ির সবাই তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছেন। বজ্রবাহু সকলের মুখই খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। বাস্তবিকই, কারও মুখেই খুব একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভাব নেই। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবী থেকে রোগভোগ, মৃত্যু বিদায় নিয়েছে। অভাব, কষ্ট নেই, পরিশ্রম নেই। তাহলে চাপা বিষণ্ণতা দেখা যাচ্ছে কেন?

খাওয়ার টেবিলে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মস্ত টেবিল ঘিরে সবাই খেতে বসেছেন। বজ্রবাহুর দু-ধারে তাঁর স্ত্রী এবং বোন। হঠাৎ পিঠে একটু সুড়সুড়ি লাগায় বজ্রবাহু চমকে উঠে পিছনে হাত বাড়িয়ে খপ করে একটা সাপকে ধরে ফেললেন। তারপর সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাপ! সাপ! বাবা রে!'

তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বললেন, 'সাপ নয়। ছেড়ে দাও।'

'সাপ নয় মানে!' বলে লাফিয়ে উঠলেন বজ্রবাহু। টেবিলে সবাই নিঃশব্দে নতমুখে বসে আছেন। বজ্রবাহু সবিস্ময়ে দেখলেন, তিনি যা ধরেছেন তা সত্যিই সাপ নয়।

'কী এটা!' বলে ফের বজ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন বজ্রবাহু।

তাঁর নতমুখী স্ত্রী বললেন, 'ছেড়ে দাও। ওটা আমার লেজ।'

'লেজ!' বলে হাঁ করে রইলেন বজ্রবাহু। তাঁর শিথিল হাত থেকে সর্পিল জিনিসটা খসে পড়ল।

বজ্রবাহুর বাবা মৈনাক গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তুমি পৃথিবীতে ছিলে না,



এতক্ষণ যেটা লক্ষ করেননি, তা পরদিন সকালেই লক্ষ করলেন বজ্রবাহু। গাছে-গাছে প্রচুর মানুষ দোল খাচ্ছে, লাফালাফি করছে, আনন্দে চেঁচাচ্ছেও কেউ-কেউ।

এর মধ্যেই এই একটা অঘটন ঘটতে শুরু করেছে। দু-হাজার বছর আগে হাঠৎ ক্রমে-ক্রমে মানুষের লেজ হতে শুরু করেছে। প্রথমে একটা গ্যাঁজের মতো বেরোয়। তারপর ধীরে-ধীরে বড় হতে থাকে। লেজ খসানোর অনেক প্রক্রিয়া করেও লাভ হয়নি। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই এক হাত, দেড় হাত, দু-হাত লম্বা লেজ হয়েছে। কাপড়চোপড়ে ঢাকা থাকে বটে, কিন্তু সত্যটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।'

বজ্রবাহু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'লেজ! লেজ হচ্ছে কেন? একটা কারণ তো থাকবে!'

মৈনাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'লেজ গজানোর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের স্বভাবও একটু-একটু পালটাচ্ছে। ঘরে থাকার চেয়ে আজকাল কেন যেন আমাদের গাছের ডালে উঠে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। তুমি জানো না, আমরা সবাই এখন খুব ভাল গাছ বাইতে পারি, এ-ডাল থেকে ও-ডাল লাফিয়ে-ল্যাফিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াই। আমাদের স্বভাবে বেশ একটা পরিবর্তন এসেছে।'

বজ্রবাহু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'কই, আমার তো হয়নি!'

মৈনাক বললেন, 'তোমরা এই বিবর্তনের সময়টায় পৃথিবীতে ছিলে না, তাই বেঁচে গেছ।'

বজ্রবাহু খাওয়া ফেলে উঠে রাষ্ট্রপতিকে ফোন করলেন, 'আপনার কি লেজ আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি?'

'আছে বজ্রবাহু।'

উপরাষ্ট্রপতি বললেন, 'আছে হে, আছে।'

অন্তত পঞ্চাশজনকে ফোন করে নিঃসংশয় হলেন বজ্রবাহু। মাথা গরম হয়ে গেল। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন, 'এর মানে কী? কারণই বা কী?'

মৈনাক ছেলের অস্থিরতা দেখে তাঁর কাছে এসে নরম গলায় সান্ত্বনা দিলেন, 'অত অস্থির হোয়ো না। মানুষের কোনও কাজ নেই, সব কাজ যন্ত্র করে দিচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করছে না, যন্ত্রই তার হয়ে ভাবছে। মানুষের মৃত্যুও নেই, হাজার-হাজার বছর সে খামোখা বেঁচে থাকছে। তাই বিবর্তন থেমে গেছে। কিন্তু প্রকৃতি তো থেমে নেই। সে তাই মানুষের বিবর্তনের প্রগতি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকে উলটো বিবর্তনের পাল্লায় ফেলে দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে।'

বজ্রবাহু রেগে যেতে গিয়েও রাগলেন না। রেগে লাভ নেই। কারণ, কথাটা মিথ্যে নয়।

এতক্ষণ যেটা লক্ষ করেননি, তা পরদিন সকালেই লক্ষ করলেন বজ্রবাহু। গাছে-গাছে প্রচুর মানুষ দোল খাচ্ছে, লাফালাফি করছে, আনন্দে চেঁচাচ্ছেও কেউ-কেউ। লক্ষ করলেন, অনেকেই আবার নিজেদের লেজ নির্লজ্জভাবেই প্রদর্শনও করছে। এও লক্ষ করলেন, মানুষের গায়ে বেশ ঘন ও বড়-বড় লোম গজাচ্ছে আজকাল।

উত্তেজিত বজ্রবাহু গিয়ে পুণ্ডরীককে ধরলেন, 'এসব কী হচ্ছে, বলবে ?'

পুণ্ডরীক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আবার গোড়া থেকে আমাদের সব শুরু করতে হবে মনে হচ্ছে। মানুষ বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেলে ফের উলটো পথে বিবর্তন যদি আবর্তিত হয় তাহলে দূর ভবিষ্যতে আবার মানুষ দেখা দেবে পৃথিবীতে। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই বজ্রবাহু।'

'আর আমাদের কী হবে ?'

'আমরা অন্য গ্রহে পালিয়ে যেতে পারি বটে, কিন্তু তাতে লাভ কী ? আমাদের আপনজনেরা তো বানর হয়ে যাবেই।'

'তা হলে ?'

আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুণ্ডরীক বলল, 'আমরা অপেক্ষা করব। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদেরও...'

বাস্তবিক, মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যেই বজ্রবাহু, মৈনাক এবং তাঁদের দলবলের লেজ গজাতে লাগল। আর অন্যদিকে, পৃথিবীতে গাছে-গাছে বানরের ভিড়। হুপহাপ, দুপদাপ শব্দ। গাছপালায় সভ্যতা ঢেকে যেতে লাগল।

ছবি : দেবাশীষ দেব

স্বপ্নসম্ভব

সমরেশ মজুমদার



সত্যদেব খুব চিন্তায় পড়েছেন। আজ সকালে তাঁর হঠাৎ খেয়াল হল গত দশ বছরে তিনি একরাত্রেও কোনও স্বপ্ন দ্যাখেননি। একটা মানুষ রোজ রাত্রে ঘুমোচ্ছে অথচ স্বপ্ন দেখছে না, এ কেমন কথা! কতরকমের স্বপ্ন তো লোকে দ্যাখে। মজার, দুঃখের, ভয়ের, সুখের। সত্যদেব স্বপ্ন সম্পর্কে জানবার জন্য একটি বইও কিনেছেন। বইটির নাম 'স্বপ্নফল কল্পদ্রুম'। তাতে স্বপ্নের মজার-মজার ব্যাখ্যা আছে! কিন্তু তা তো হল, যার জন্য এত, সেই স্বপ্নটাই তাঁর দেখা হচ্ছে না। মানুষ তো ইচ্ছে করলেই স্বপ্ন দেখতে পারে না।

সত্যদেববাবুর বন্ধু সুধাময় পণ্ডিত লোক। তিনি ভেবেচিন্তে পরামর্শ দিলেন বাড়ির বিছানায় শুয়ে যখন সত্যদেব স্বপ্ন দেখছেন না তখন অন্য উপায় করতে হবে। লোকে ট্রামে-বাসে বসার জায়গা পেলে ঘুমোয়। সেই ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন আসতে পারে। সত্যদেব সেই চেষ্টা করলেন। ডিপো থেকে ট্রামে উঠে বসলেন। জানলার পাশে সিট পেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। একটু ঢুলুনি এল, ওই পর্যন্ত। বাস এত লাফায় কলকাতার গর্তে পড়ে, ঘুমের দেখাই পাওয়া গেল না। সুধাময় তাঁকে উপদেশ দিলেন পাতাল রেলে চেষ্টা করতে। মসৃণ লাইনে চলে, গতিও খুব। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। ঘুম আসার সম্ভাবনা প্রবল। প্রস্তাবটা মনে ধরল সত্যদেবের।

তবে তিনি ভেবে দেখলেন দিনের বেলা নয়, রাতের খাওয়া সেরে পাতাল রেলে চড়বেন। সেইমতো রাত আটটায় পেটভরে খেলেন তিনি। কালীঘাট স্টেশনে মাটির নীচে নামলেন। তিনি মাত্র দু-বার এর আগে পাতালে নেমেছিলেন। চমকে গিয়েছিলেন দেখে। আজও খুব ভাল লাগল। ঝকঝকে আলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বিদেশি ছবির মতো। রিটার্ন টিকিট কেটে নিলেন তিনি। এক পিঠ তো অল্প সময়েই ফুরিয়ে যাবে। তার মধ্যে যদি ঘুম এলেও স্বপ্ন না আসে! রাত বলেই প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। কত রাত পর্যন্ত পাতাল রেল চলে তা জিজ্ঞেস করা হল না। ট্রেন এসে গেল।

কামরার এককোণে বসার জায়গা পেলেন তিনি। ট্রেনেও লোক কম।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। শরীর ঠিক রাখাই দায়, ঘুম আসবে কী করে ? তার ওপর মাইক্রোফোনে স্টেশনগুলোর নাম নামতার মতো পড়ে যাচ্ছে কানের কাছে। সুধাময়ের ওপর বিরক্ত হচ্ছিলেন তিনি। সেন্ট্রাল স্টেশন এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। লাইন ঘুরে ট্রেনটি আবার যখন ফেরত চলল তখন তিনি কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছেন।

বাল্যকালে ট্রেনে চাপলে চাকার সঙ্গে লাইনের যে সংলাপ চলত তা সত্যদেব শুনতে পেতেন। নিজের ইচ্ছেমতো সেই সংলাপগুলো ওই আওয়াজের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া যেত। পাতাল রেলে সেই সুযোগ নেই। এত দ্রুত, গতি বাড়িয়ে-বাড়িয়ে মনকে কোথায় যেন ছিটকে ফেলে দেয়। আর ছিটকে পড়ে মন তা থেকে গতি কুড়িয়ে নিয়ে নিজেই ছুটে চলে। এই ছোটাছুটি সত্যদেবের মনও করতে লাগল। ফলে তিনি তাঁর চারপাশ, এমনকি নিজের কথাও বিস্মরিত হলেন।

কতক্ষণ এইরকম চলল জানা নেই। সত্যদেব যখন চোখ খুললেন তখন চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। খুব ঘাবড়ে গেলেন সত্যদেব। তারপর বুঝতে পারলেন ট্রেন চলছে না।

ধাতস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল। ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। এখন তাঁর ঘড়িতে রাত একটা। পাতাল রেল চলাচল অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা কোন স্টেশন তাও তাঁর জানা নেই। রেলের কর্মচারীরা সব বন্ধ করে দিয়ে আলো নিভিয়ে চলে গিয়েছে আজ রাতের জন্য। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যেহেতু এককোণে বসে ঘুমোচ্ছিলেন তাই কর্মচারীরা তাঁকে দেখতে পায়নি। এখন একটা, মানে অনেকক্ষণ তিনি এই সিটে বসে ঘুমিয়েছেন অথচ কোনও স্বপ্ন দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না। কী আশ্চর্য ! আজ কিন্তু তাঁর মন খুব খারাপ হল না। কারণ, তৎক্ষণাৎ তিনি আতঙ্কিত হলেন।

এখন ট্রেন চলছে না, আলো নেভানো। মাটির নীচের সব যন্ত্রপাতি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তো তিনি অক্সিজেন পাবেন না। তার ওপর এই বন্ধ কামরার মধ্যে বসে থাকা। প্রায় অন্ধের মতো এগিয়ে গিয়ে ট্রেনের দরজা হাতড়াতে-হাতড়াতে বুঝতে পারলেন ওগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কাল সকালে ড্রাইভার এসে খোলার আগে বার হওয়ার কোনও উপায় নেই। মাথার ওপর সেন্ট্রাল না এসপ্লানেড, ঈশ্বর জানেন।

ছটফট করতে লাগলেন তিনি। তারপর মরিয়া হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে-দিতে চিৎকার করলেন, 'কেউ আছ ! দরজা খুলে দাও। আমি ভেতরে বন্ধ হয়ে আছি।'

শব্দটা খুব জোরে বাজল, গলার স্বর গমগম করে উঠল, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কয়েকবার চেষ্টার পর স্থির হলেন সত্যদেব। মাটির এত নীচে

চিৎকার করলে ওপরে গেটের বাইরে যে-দরোয়ানরা আছে তারা শুনতে পাবে কী করে ?

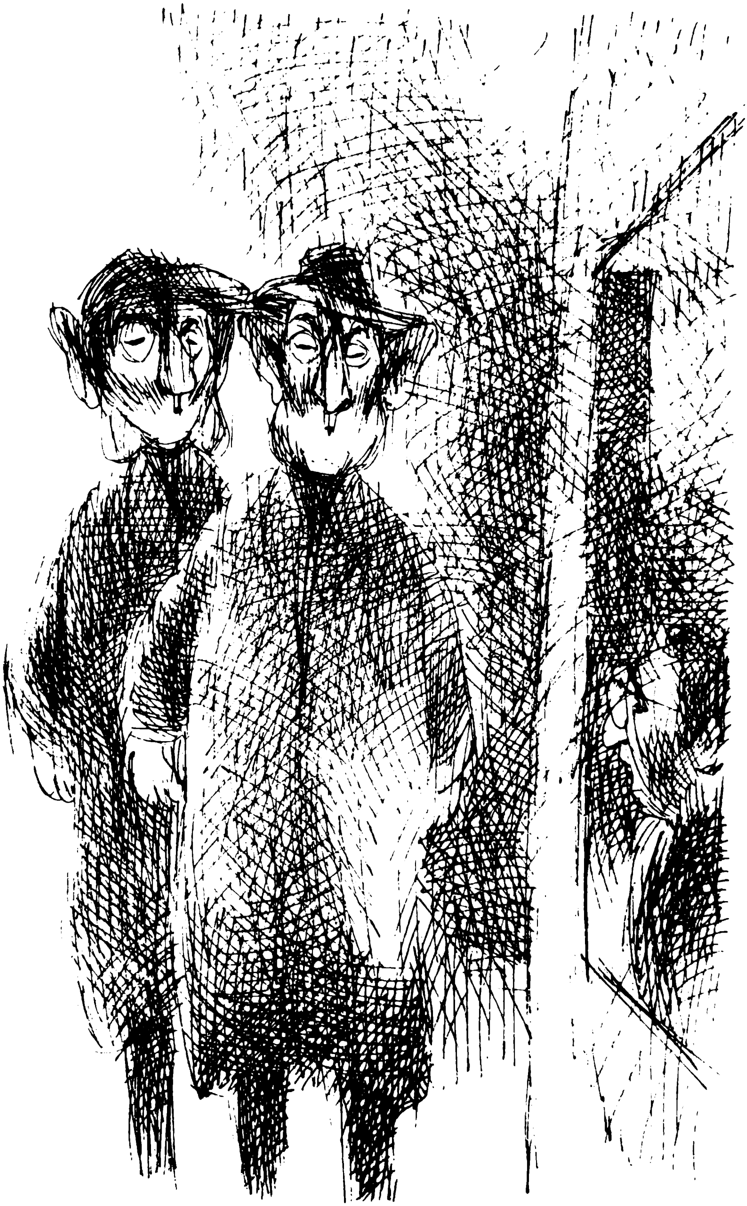
সত্যদেব কামরার ঠিক মাঝখানে চলে এলেন। হাঁটি-হাঁটি করে চলতে-চলতে বুঝলেন, সোজা যাওয়া যায়। ধাক্কা লাগছে না। ভুল করে অন্য কোনও কামরার দরজা খোলা থাকলেও থাকতে পারে। পুরো ট্রেনটার এপাশ-ওপাশ হেঁটে যাওয়া যায়—এ-কথা মনে পড়তেই একটু স্বস্তি হল। পুরো ট্রেনটাই তিনি হাঁটলেন। এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে চোখ বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সবক'টা কামরার দরজা টাইট করে বন্ধ। বার হওয়ার কোনও উপায় নেই। এখন এই ট্রেনে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু ট্রেন কেন, পাতালের এই স্টেশনে দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। তা ধরতে গেলে এক অর্থে তিনি এখন ট্রেনটার মালিক। কর্মচারীরা সকাল আটটার আগে নিশ্চয়ই আসবে না। বাতাসে যে-পরিমাণ অক্সিজেন আছে তা কি একটা লোকের পক্ষে ততক্ষণ যথেষ্ট নয় ?

এসব ভেবে তিনি বেশ সাহসী হলেন। বেড়াতে-বেড়াতে ইঞ্জিনের কাছে চলে এলেন। ট্রেন যখন চলে তখন দরজাটা বন্ধ থাকে। এখন জোরে চাপ দিতে আচমকা সেটা খুলে গেল। সত্যদেব ইঞ্জিনঘরে ঢুকলেন। এর আগে যে-দু-বার এসেছেন সে-দু-বার এত অবাক ছিলেন যে, ড্রাইভারের কাজকর্ম লক্ষ করেননি। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগে ড্রাইভারই সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করত এবং থামবার পরে খুলত, এটা তাঁর মনে আছে। কোন সুইচ টিপলে দরজা খুলে যাবে তা তাঁর জানা নেই। অথচ অন্ধকারে তিনি সবক'টা যন্ত্রপাতি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। এটা কী করে সম্ভব হল ? তাঁর চশমার পাওয়ার এমনিতেই খুব বেশি। দিনের আলোয় খালি চোখে দূরের লোক দেখতে পান না, অথচ এই অন্ধকারে চমৎকার দেখতে পাচ্ছেন।

এসবই খুব আনন্দের কথা। সত্যদেব ইঞ্জিনের সুইচগুলো ভাল করে দেখতে লাগলেন। এটা-ওটা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। হঠাৎ একটা সুইচ টিপতে পট্‌পট্‌ করে আলো জ্বলতে আরম্ভ করল। সত্যদেব মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সমস্ত ট্রেন ঝকমক করছে। করিডোরের সোজাপথটা সিনেমার মতো দেখাচ্ছে।

আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। এবার দরজা খোলার সুইচটা খুঁজতে লাগলেন তিনি। ঠিক করলেন দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নামবেন না। ট্রেনের বেঞ্চিতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সুইচটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। জীবনে যে-মানুষ কোনও যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়নি—। হঠাৎ দুপ্‌ করে সব আলো নিভে গেল। সত্যদেব বুঝলেন আলোর সুইচে হাত চলে গিয়েছিল তাঁর। সেটা খোঁজার চেষ্টা করলেন কিন্তু জ্বলে-ওঠা আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার যেন তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। তিনি হাতড়াতে লাগলেন।

হঠাৎই প্ল্যাটফর্মে আলো জ্বলে উঠল। ইঞ্জিনঘরে সুইচ টিপলে প্ল্যাটফর্মের



এরা মানুষ নয়। সমস্ত শরীর ওইরকম লোমহীন পোড়া চামড়ায় ঢাকা। কান দুটো বিশাল বড়, চোখ ফোলা-ফোলা। হাত বলতে যা, তা কিন্তু বেশ ছোট। এরা কারা?

আলো নিশ্চয়ই জ্বলবে না। সত্যদেব অবাক হয়ে সরে এসে দেখলেন দুজন অদ্ভুত চেহারার লোক এগিয়ে আসছে ইঞ্জিনের দিকে। খুব ব্যস্ত পদক্ষেপ। প্ল্যাটফর্ম জনশূন্য। এরা কারা ? তিনি বেশ ভয় পেয়ে গিয়ে ইঞ্জিনঘরের এককোণে বসে পড়লেন।

দরজায় শব্দ হচ্ছিল। তারপর সেটা খুলে গেল। সত্যদেব পিটপিট করে তাকালেন। যদি ওরা সন্দেহ করে খোঁজ নিতে আসে তাহলে নির্ঘাত পুলিশের হাতে তুলে দেবে। স্বপ্ন দেখতে এসে থানায় বাস করা নিশ্চয়ই আরামদায়ক হবে না। তিনি চারটে পোড়া চামড়ার পা দেখতে পেলেন। পায়ে কোনও পাতা নেই। অনেকটা হাতির মতো গোল কিন্তু বেশ সরু। মুখ তুললেন তিনি। এরা মানুষ নয়। সমস্ত শরীর ওইরকম লোমহীন পোড়া চামড়ায় ঢাকা। কান দুটো বিশাল বড়, চোখ ফোলা-ফোলা। হাত বলতে যা, তা কিন্তু বেশ ছোট। এরা কারা ? দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ইঞ্জিন নিয়ে। নিজেদের মধ্যে কথাও বলছে না ওরা। ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন সত্যদেব। ভয় পেলে তাঁর পেটে খুব ব্যথা হয়। সেটা শুরু হল।

হঠাৎ ঘটাং করে আওয়াজ হল। ট্রেনটা চলতে শুরু করল। ওরা ট্রেনটাকে চালাচ্ছে। কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব হল ? নিশ্চয়ই ট্রেন চালানোর বিদ্যুৎ এখন অফ করে রাখা হয়েছে। বিনা বিদ্যুতে কি ট্রেন চালানো সম্ভব ? তারপর খেয়াল হল এই ট্রেনের আলো সুইচ টিপতে জ্বলেছিল। সেটা অবশ্য ব্যাটারি থাকলে জ্বলতে পারে। কিন্তু ট্রেন যে চলছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছে না। পাতাল রেল চললে যে বীভৎস শব্দ হয় তা এখন হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পিছনের কামরাগুলো সঙ্গে নেই। এরা কি কোনও তস্কর দলের সদস্য ? ইঞ্জিন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ? কিন্তু যাবেই বা কোথায় ? লাইন ঠিক থাকলে বড়জোর দমদম পর্যন্ত। সেখানেও তো মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে হবে। প্লেন, বাস, মায় ট্রেন পর্যন্ত হাইজ্যাক করা হয়েছে কিন্তু পাতাল রেল, কোনওমতে সম্ভব নয়।

ট্রেনটা চলছে খুব দ্রুত। এত জোর গতিতে সাধারণ সময়ে চলে না। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হল। মনে হল ইঞ্জিনটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরনাম জপ করার সুযোগ পেলেন না সত্যদেব। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরলে অবাক হয়ে দেখলেন ট্রেনটা চলছে। এবার খুব ধীরে, চারপাশে ঘর্ষণের শব্দ। যেন কোনও স্তর ভেদ করে-করে ইঞ্জিন এগোচ্ছে। প্রাণী দুটোর পা নড়ছে। তিনি স্পষ্ট শিস্-এর আওয়াজ পেলেন। ওরা কি শিস্ দিয়ে গান গাইছে ?

এত বড় সঙ্ঘর্ষেও ইঞ্জিনটা চুরমার হয়ে গেল না, একদম আস্ত থেকে কী করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিলেন না সত্যদেব। তিনি উঠে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। এখানে তিনি আছেন জানতে পারলে ওরা কী করবে কে জানে!

কতক্ষণ ওইভাবে ট্রেনটা চলেছিল, জানেন না সত্যদেব। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে একটার সময়। কী করে বন্ধ হল? ব্যাটারি নতুন লাগিয়েছেন তিনি। কিন্তু সামনে এত বিস্ময় যে, ঘড়ি নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ পেলেন না। ট্রেন চলছে তো চলছেই। হঠাৎ ঘষটানির আওয়াজ থেমে গেল। যেন কোনও প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে, এমন শব্দ লাগল। প্রাণী দুটো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ট্রেন থেমে গেল।

দরজা খুলে ওরা নেমে যেতে সত্যদেব ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। এটা কোন স্টেশন? বাইরে বেশ আলো। তার মানে দমদম কিংবা টালিগঞ্জ। সেখানে ট্রেন মাটির ওপরে উঠে আসে। এইরকম একটা ভুতুড়ে ট্রেনে বসে না থেকে চুপচাপ কেটে পড়াই ভাল। তিনি পায়ে-পায়ে দরজার কাছে চলে এলেন।

কিন্তু এ কী? এটা কোন জায়গা! প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু নেই। কোথাও কোনও মানুষ দেখতে পাচ্ছেন না। সেই প্রাণী দুটো গেল কোথায়? চারধারে স্যাঁতসেঁতে জল। কিন্তু বাড়িঘর আছে। এইসব বাড়িঘর এখন কেউ বানায় না। ইতিহাসের পাতায় মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার যেসব ছবি ছাপা হয়, তার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে।

ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে হল। এবার দ্বিতীয় বিস্ময়। ইঞ্জিনের বগি ছাড়া বাকি ট্রেনটা পিছনে নেই। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে কাদামাটিতে। কোনও লাইন নেই। ইলেকট্রিক ট্রেন লাইন ছাড়া, ইলেকট্রিক ছাড়া চলে এল? তাজ্জব ব্যাপার!

তিনি ঝুঁকে পড়ে মাটি দেখলেন। নরম কাদা-কাদা, কালচে রঙের মাটি। এরকম মাটি আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। সেই মাটিতে সদ্য পড়া চারটে প্রায়-পায়ের চিহ্ন রয়েছে। সত্যদেব সেই চিহ্ন অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন এটা একটা মৃত শহর। হয়তো সিন্ধু বা তার আগের কোনও সভ্যতার নিদর্শন এই শহর একসময় মাটির ওপর ছিল, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় তা মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে কয়েক হাজার বছর আগে। মাঝে-মাঝে পৃথিবীর এখানে-ওখানে মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এমন শহরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই শহর প্রায় নিটোল। তবে মাথার ওপর আকাশ নেই। নেই বলেই সূর্যের আলো পাওয়া যাচ্ছে না। তার বদলে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে আলো বসানো হয়েছে। সেই আলো পরিচিত আলোর মতো নয়। পাথরের মতো বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সত্যদেব মুখ উঁচু করে দেখলেন খানিকটা দূরে আকাশের বদলে কালো ছাদ রয়েছে সমস্ত শহরের ওপরে। এসব কী করে হল?

হঠাৎ দ্রিমি-দ্রিমি আওয়াজ ভেসে এল। সত্যদেব দ্রুত আড়াল খুঁজলেন। একটা বাড়ির ঢাকা বারান্দায় উঠে পড়লেন তিনি। এখানে দাঁড়িয়ে পাতাল রেলের ইঞ্জিনটাকে দেখা যাচ্ছে না। ওটা থেকে বেশি দূরে যাওয়া বুদ্ধিমানের

কাজ হবে না। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার একমাত্র সূত্র ওটা। কলকাতা মানে উনিশশো পঁচানব্বই সাল। সায়েন্স সিটি হয়েছে বাইপাসের ধারে। সত্যদেব অবশ্য এখনও সেটা দেখতে যাওয়ার সময় পাননি। আর এই জায়গাটা ঠিক স্বপ্নের মতো। খ্রিস্টপূর্ব দু-হাজার বা তার আগের সময়ে যেন চলে এসেছেন।

চারটে প্রাণী ব্যান্ড বাজাতে-বাজাতে চলে গেল। কোথায় গেল ? এরা কি অন্য কোনও গ্রহের জীব ? মনে পড়ল স্পিলবার্গের ছবিতে এর কাছাকাছি চেহারার জীবকে তিনি দেখেছিলেন। অবশ্য স্পিলবার্গ অন্য গ্রহে গিয়ে তাদের দেখে আসেননি যে, ঠিকঠাক সিনেমায় তুলবেন। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে, কিছু মানুষ বাস্তবের কাছাকাছি কল্পনাকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, ওই স্পিলবার্গ।

আবার শব্দহীন চারপাশ। পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি হাঁটতে লাগলেন। ট্রেন থেকে নেমে দু-জোড়া পা যেদিকে গিয়েছিল সেই দিকটায় যাওয়াই ভাল। ফেরার সময় অসুবিধে হবে না। কিছুক্ষণ পরে সত্যদেবের পা কাদামাটিতে বসে যেতে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন ওই প্রাণী যথেষ্ট হালকা বলে সহজে এই কাদার স্তর পেরিয়ে যেতে পেরেছে, যা তাঁর ভারি শরীর পারবে না।

তিনি একটা বিশাল বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। চাতালে বড়-বড় চৌবাচ্চা। একেই কি হামাম বলা হত ? ইতিহাসে ফাঁকি দিয়েছিলেন বলে এখন মনখারাপ হল। দেওয়ালে অদ্ভুত-অদ্ভুত লেখা। এগুলো কখনও তিনি দেখেননি। এর পাঠ উদ্ধার করতে পারলে পৃথিবীতে হইচই পড়ে যেত। একটা দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকা হয়েছে। শিকারের ছবি, জন্তুর ছবি, মেয়েদের ছবি। সব ছবিই লাইন টেনে আঁকা।

তিনি আরও এগিয়ে গেলেন। গাফিলতির জন্য কলকাতার মিউজিয়ামে কোনওদিন যাওয়া হয়নি। তা শুধু মিউজিয়াম কেন, চিড়িয়াখানায় শেষ কতদিন আগে গিয়েছেন মনে নেই। বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরটা আজও দেখা হয়নি। আজ এই বিশাল বাড়ির বিভিন্ন ঘরে ঘুরতে-ঘুরতে তাঁর মনে হল ফিরে গিয়েই সেসব দেখে নিতে হবে।

সত্যদেব প্রথমে খেয়াল করেননি। এসব যখন তিনি ভাবছেন তখন যে একটা চাপা গুঞ্জন চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা টের পেতে সামান্য দেরি হল। পেতেই তিনি শক্ত হয়ে গেলেন। কেউ কথা বলছে। তারপরেই বুঝলেন, একজন নয়, অনেকগুলো গলা। কিন্তু সেইসব বাক্যাবলী তিনি বুঝতে পারছেন না।

তিনি চিৎকার করলেন, 'কে ? কে কথা বলছে ?'

শব্দটা একটু থামল। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, আবার প্রবলভাবে ফিরে এল।

সত্যদেব আবার চিৎকার করলেন। একই প্রতিক্রিয়া হল। কিন্তু থেমে

যাওয়ার পর শব্দগুলো আরও জোরে হচ্ছিল। যেন তাঁর গলার স্বর শুনে ওদের সাহস বেড়ে চলেছে অথচ চোখের সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

চিৎকার করতে-করতে এ-ঘর ও-ঘরে ছোটাছুটি শুরু করলেন সত্যদেব। শব্দগুলো আর থামছে না, বরং তাঁকে যেন তাড়া করে ফিরছে। হঠাৎ তিনি ভূত দেখলেন। চারটে সেই বিকটদর্শন প্রাণী তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে। এদের দুই জাতভাই পাতাল রেল চালিয়ে এখানে এসেছে। তিনি খেয়াল করলেন সেই শব্দগুলো আর নেই। চারপাশ আবার শান্ত।

চারটে প্রাণী চলতে শুরু করা মাত্র সত্যদেব দেখলেন তিনিও চলছেন। তাঁর নিজের কোনও ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই, ওরা যেমন চলছে তাঁর শরীর তাই অনুসরণ করছে। হঠাৎ তাঁর কানে বিপবিপ আওয়াজ পৌঁছল। বাঁক পার হতে তিনি দৃশ্যটা দেখতে পেলেন। প্রায় আটখানা ফুটবল মাঠের সাইজের একটা ধাতব বস্তু পড়ে আছে সামনে। শব্দটা ভেসে আসছে ওখান থেকেই। বস্তুটির মাথার ওপর একটি উজ্জ্বল আলো ঘুরছে।

তাঁরা কাছে যাওয়ামাত্রই একটা দরজা খুলে গেল। সত্যদেব গুনে দেখলেন ঠিক সাতজন প্রাণী বেরিয়ে এল বাইরে। এই চারজনের দুজন এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে কিছু বলতে ওরা সামনে এসে দাঁড়াল। সত্যদেব হঠাৎ অসাড় হয়ে গেলেন। কে যেন তাঁর মনের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে এখানে এলে ? তিনি জবাব দিলেন, পাতাল রেলের ইঞ্জিনের কোনায় বসে। প্রশ্ন হল, যারা ইঞ্জিন চালাচ্ছিল তারা তোমায় দ্যাখেনি ? তিনি উত্তর দিলেন, না। ওরা খেয়ালই করেনি।

সঙ্গে-সঙ্গে দুটো প্রাণী বসে পড়ল। ভাল করে দেখেও বুঝতে পারলেন না সত্যদেব, এরাই পাতাল রেলের চালক কিনা। তাঁকে নিয়ে আসার জন্য কি ওদের শাস্তি হচ্ছে ? খারাপ লাগল তাঁর।

'তুমি পৃথিবীর মানুষ। তোমাদের তো অনেক ভাগ। তুমি কী ?'

'আমি ভারতীয়। বাঙালি। তোমরা কে ?'

'আমাদের পরিচয় দিলে তুমি বুঝবে না। এই হল আমাদের বাহন। এটা খারাপ হওয়ায় আমরা পৃথিবীর নীচে আশ্রয় নিয়েছি। সাহায্যের জন্যে ওই দুজনকে ওপরে পাঠিয়েছিলাম। ওরা ফিরে এসে বলল তোমরা এত নির্বোধ যে, কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। আমাদের মেকানিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিপদে পড়েছি।'

'তার কী হয়েছে ?'

'পৃথিবীর বায়ুসীমায় আসার পর থেকে তার মনখারাপ হচ্ছিল। এখন সে শুধু স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখলে কেউ কাজ করতে পারে না।'

সত্যদেব উত্তেজিত হলেন, 'স্বপ্ন দেখছে ? ভগবান ! কী করে স্বপ্ন দেখছে, ভাই ? আমি অনেক চেষ্টার পরেও এক টুকরো স্বপ্ন দেখতে পাইনি।'

'স্বপ্ন দেখা আমরা পছন্দ করি না। খুব খারাপ রোগ। এটা পৃথিবীতেই হয়।'

'তা হোক, ওর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে ? আমি কায়দাটা জানতে চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে সেই যানের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। সত্যদেব দেখলেন একটি ওই ধরনের প্রাণী শুয়ে আছে। কখনও সে হাসছে, কখনও রাগ করছে, কখনও মাথা নাড়ছে। পাশে দাঁড়ানো ওদের নেতা বলল, 'কী মারাত্মক অসুখ ! ও ঠিক না হলে এখান থেকে আমরা বার হব কী করে ?'

'ওকে চিমটি কাটব ?'

'কেন ?'

'আমার খুব হিংসে হচ্ছে। তাছাড়া চিমটি কাটলে ঘুম ভেঙে যায়।'

'বেশ, কাটো।'

সত্যদেব এগিয়ে গিয়ে প্রাণীটির পোড়া চামড়ায় চিমটি কাটলেন। সঙ্গে-সঙ্গে স্থির হয়ে গেল প্রাণীটি। দ্বিতীয়বার চিমটি কাটতেই তড়াক করে উঠে বসল। সত্যদেব মিনতি করলেন, 'সরি টু ডিস্টার্ব ইউ। কোনও উপায় ছিল না। কী করে তুমি হঠাৎ এত্ত-এত্ত স্বপ্ন দেখা শুরু করলে, বলবে ?'

'এ মাল কে ?' লোকটা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল।

'আমি একজন বাঙালি। মাটির ওপরে থাকি।'

'কেটে পড়ো। আমার ঘুম আসছে।'

'অসম্ভব ! ঘুমোলেই তুমি স্বপ্ন দেখবে। সেটা হতে দিচ্ছি না। আচ্ছা, বলো তো, ওই দূরের বাড়িটায় কারা অত চিৎকার করছিল ?'

'কারা আবার ? একসময় এখানে যে শহর ছিল, তার মানুষের আত্মা।'

'ওরা কারা ?'

'দুর ? আমি কি জানি ! তবে এদের বংশধররা ওপরে থাকে।'

'তার মানে বাঙালির পূর্বপুরুষ মাটির তলায় চিৎকার করে বেড়াচ্ছে।'

'বাঙালির পূর্বপুরুষ ?' এবার নেতা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ। আমাদের কেউ মারা গেলে চিতায় পুড়িয়ে অথবা কবরের ব্যবস্থা করলে নিশ্চিন্ত হই তাঁদের আত্মা শান্তি পাচ্ছে ভেবে। আচ্ছা, এটা কত বছর আগের শহর ?'

'দু-হাজার। খালি পেয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি।'

'বেশ করেছেন। তখন তো হিন্দু-মুসলমান বলে আলাদা সম্প্রদায় ছিল না। বাঙালি বাঙালিই ছিল কিনা তাও জানি না। ইস্, তাদের আত্মারা এখনও চিৎকার করে বেড়াচ্ছে আর তুমি স্বপ্ন দেখছ ? এটা অপমান, অপমান করছ ওদের।'

'কিন্তু আমি কী করব ? তোমাদের মহাকাশে আসামাত্র আমার ঘুম পেতে লাগল। আর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।'

'কী স্বপ্ন ?' সত্যদেবের গলা কাঁপল।

'মনে নেই। একটাও মনে নেই।'

সত্যদেব নেতাকে বললেন, 'ওকে এক্ষুণি ওই বাড়িতে নিয়ে যান। বাঙালির চিৎকার শুনলেই ওর মন, ঘুম এবং স্বপ্নশূন্য হয়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি।'

নেতা বলল, 'যদি তোমার প্রেসক্রিপশন সত্যি হয় তাহলে তোমাকে ফিরে যেতে আমি সাহায্য করব। চলো।'

'না। আমি একটু গড়িয়ে নিই। খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনারা ঘুরে আসুন।'

ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে গেল অনিচ্ছুক মেকানিককে সামনে রেখে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এত বড় মহাকাশযানে সত্যদেব একা। তাও আবার অন্য গ্রহের মহাকাশযান। তাঁর মনে হল ঘুরে-ঘুরে সব নোট করে রাখলে কেমন হয় ? ফিরে গিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের জানিয়ে দিলে বিরাট উপকার করা হবে।

কিন্তু মেকানিকের ছেড়ে যাওয়া শোয়ার জায়গা তাঁকে বেশি টানতে লাগল। ওসব দেখার আগে যদি একচিলতে স্বপ্ন দেখে নেওয়া যায় ! তিনি ধীরে-ধীরে শুয়ে পড়লেন। প্রাণীটি খাটো ছিল বলে তাঁকে পা মুড়ে শুতে হল। শোয়ামাত্র বিছানাটা দুলতে লাগল। ঠিক দোলনার মতো।

'এই যে দাদা, শুনছেন ! এই যে ! আচ্ছা মুশকিল হল !'

কানে অস্পষ্ট শব্দগুলো আসছিল। গায়ে ঠেলা পড়তে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন সত্যদেব। অবাক হয়ে দেখলেন লোকটাকে।

'আর কত এখানে ঘুমোবেন ? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। এখনই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ভাগ্যিস আমি দেখলাম, নইলে হোল নাইট অন্ধকারে পড়ে থাকতে হত আপনাকে। যান।' পাতাল-রেলের একজন কর্মী কথাগুলো বললেন।

সত্যদেব প্ল্যাটফর্মে নামলেন। চারপাশ জনশূন্য, কিন্তু তখনও আলো জ্বলছে। তিনি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন ? হঠাৎ আবেগে আক্রান্ত সত্যদেব লাফ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কোমরে লাগল। 'উঃ' করে উঠতেই পিছন থেকে রেলের কর্মচারী বললেন, 'আপনি কী বোকা, ওভাবে লাফালেন ?'

সত্যদেব মনে-মনে বললেন, একটু আগেও একই কথা শুনলাম। বাঙালি নির্বোধ। কিন্তু তখনও গায়ে লাগেনি, এখনও লাগল না।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

আর মনখারাপ হবে না

শেখর বসু



উনিশশো নিরানব্বুই সাল। সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের একধারে একটা আকাশছোঁয়া বাড়ির সাতাশ তলার সতেরো নম্বর ঘরে মনখারাপ করে বসে ছিল একটি ছেলে। মুখ ভার হয়েই ছিল ছেলেটির, এবার চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর ওর গাল গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল ফ্লোরের লাল-টুকটুকে কার্পেটের ওপর। আর ঠিক তক্ষুণি ডোর-বেল বেজে উঠল।

জামার হাতায় কোনওমতে চোখের জল মুছে দরজা খুলল ছেলেটি। দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন বেঁটেখাটো চেহারার মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মাথায় চকচকে টাক, কিন্তু থুতনিতে ঘন ছাগলদাড়ি। ভদ্রলোক বিখ্যাত এক সুইস কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, আর স্থানীয় বেঙ্গলি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। নাম সুনন্দ মিত্র। চাকরি নিয়ে ট্রেনিং নিতে বার্নে কোনও বাঙালি ছেলে এলেই মিস্টার মিত্রের প্রথম কাজ হল তাকে ক্লাবের মেম্বার করে নেওয়া। তার পরের কাজ তাকে দিয়ে অবসর সময়ে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করানো। এর ফাঁকে-ফাঁকে তিনি তাকে খাঁটি সুইস-জার্মান ভাষাশিক্ষার তালিম দিয়ে থাকেন।

যে-ছেলেটি এইমাত্র ঘরের দরজা খুলে দিল তার নাম শৌভিক বসু। শৌভিকের চেহারা রোগা-পাতলা, তবে কিছুক্ষণ ধরে কেঁদে-কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে বসে আছে। দরজা খোলার সময় শৌভিক চোখমুখ আড়াল করে রেখেছিল। এবার সেদিকে চোখ পড়তেই মিস্টার মিত্র অবাক হয়ে বললেন, 'আরে! কী ব্যাপার? কী হয়েছে তোমার?'

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে উত্তর দিল শৌভিক, 'না, কিছু না।'

'কিছু না মানে? কিছু না হলে কেউ কি...কারও সঙ্গে কি তোমার কোনও গোলমাল হয়েছে?'

'না।'

'ন্‌না, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি লুকোচ্ছ আমাকে!'

শৌভিক আরও কয়েকবার 'না-না' করল, কিন্তু মিস্টার মিত্র নাছোড়।

শেষকালে সত্যি কথাটা বলতেই হল শৌভিককে, আর তাই শুনে সুনন্দ মিত্রের সে কী হাসি ! হাসি আর থামতেই চায় না। হাসতে-হাসতে সোফার ওপর প্রায় গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

কারও দুঃখের কথা শুনে কেউ এমন অসভ্যের মতো হাসতে পারে, কল্পনার বাইরে ছিল শৌভিকের। অত হাসি দেখে ও প্রথমে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন ওর রাগ হয়ে গেল।

মিস্টার মিত্র কোনওমতে হাসি থামিয়ে ছাগলদাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, 'শৌভিক, এটা ১৯৯৯ সাল। ওটা কি এখন আর কোনও সমস্যা হতে পারে ?'

কথাটার মানে বুঝতে পারল না শৌভিক।

মিস্টার মিত্র একটা ছোট্ট চেহারার সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'বার্নে ঠিক কতদিন হল তুমি এসেছ ?'

'আজ নিয়ে সাতদিন।' থতমত খেয়ে উত্তর দিল শৌভিক।

'তোমার বয়েস কত হল ?'

'আঠেরো বছর।'

'আজকের দিনে আঠেরো বছর বয়েসেও তুমি হোমসিক হয়ে পড়ছ ?'

'হ্যাঁ, মা-র কথা ভীষণ মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে ছোট বোনটার কথা। এগারো বছর বয়েস। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতাম, ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরত।' বলতে-বলতে শৌভিকের গলা ধরে এল।

ওর কথা শুনে মিস্টার মিত্র আবার অসভ্যের মতো খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠলেন, তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠে টেনে নিলেন টেলিফোনটা। টেলিফোনে ঝড়ের গতিতে সুইস-জার্মান ভাষায় কার সঙ্গে কথা বলার পরে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর মিনিট-দশেক বাড়ির জন্যে মনখারাপ করো, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না শৌভিক।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় আবার ডোর-বেল বাজল। এবার দরজা খুললেন মিস্টার মিত্র ! ঘরে ঢুকল দুজন সাহেব, ওদের হাতে অদ্ভুত চেহারার সব যন্ত্রপাতি। শৌভিককে দেখিয়ে মিস্টার মিত্র কীসব বলতেই এক সাহেব এসে ওর মাথায় একটা হেলমেট পরিয়ে দিল।

শৌভিক আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিস্টার মিত্র ওকে ইঙ্গিতে চুপ করে বসে থাকতে বললেন। হেলমেট পরবার পরে সাহেব ওর চোখে একটা সবুজ চশমা পরিয়ে দিল। চশমার সঙ্গে অনেকগুলো তার, তারের প্রান্তগুলো বিদঘুটে চেহারার একটা মেশিনের সঙ্গে আটকানো। মেশিনের একটা বোতাম টিপতেই নানা ধরনের আলো জ্বলতে-নিভতে লাগল শৌভিকের চোখের সামনে।

মিস্টার মিত্র শৌভিকের কাঁধে হাত রেখে আস্তে-আস্তে বললেন, 'তুমি এবার বাড়ির কথা ভাবো।'

'মানে ?' থতমত খেয়ে বলে উঠল শৌভিক।

মিস্টার মিত্র শাসনের গলায় বললেন, 'তুমি একটু আগে বাড়ির কথা ভেবে-ভেবে মনখারাপ করছিলে না ? হ্যাঁ কি না বলো ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ভাবছিলে ?'

'ভাবছিলাম...।'

'যা ভাবছিলে তাই ভেবে যাও।'

মিনিটখানেকের মধ্যে আনন্দে ঝলমল করে উঠল শৌভিকের মুখ।

ঠিক আট মিনিট পরে লালমুখো সাহেব দুজনের একজন বিদঘুটে চেহারার ওই মেশিনটার আর-একটা বোতাম টিপতেই শৌভিকের চোখের সামনের আলোগুলো নিভে গেল।

মাথা থেকে হেলমেট আর চোখ থেকে চশমা খুলে নেওয়ার পরেও শৌভিকের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা একটুও কাটল না। ও অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল মিস্টার মিত্রের মুখের দিকে।

মিস্টার মিত্র শৌভিকের কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'শৌভিক, তুমি এখন কোথায় ? কলকাতার ষষ্ঠীতলা রোডে ? না, সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে ?'

শৌভিক দু-হাত দিয়ে চোখ মুছে অবাক গলায় বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু আগে আমি বোধহয় ষষ্ঠীতলা রোডে আমাদের বাড়িতেই ছিলাম। আমার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে ছিল আমার মা, সামনে ছোট বোন মিনু...কিন্তু, সেটাই বা কী করে সম্ভব ?'

ওর কথা শুনে মিস্টার মিত্র আবার গলা ফাটিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন, কিন্তু ভদ্রলোকের হাসিটা এবার আর শৌভিকের একটুও অসভ্যের মতো বলে মনে হল না।

লালমুখো সাহেব-দুজন কখন যেন চলে গেছে। সেন্টার-টেবিলের ওপর পড়ে আছে সেই হেলমেট, সবুজ চশমা আর অসংখ্য বোতাম বসানো সাবানের মতো ছোট্ট একটা মেশিন।

হাসি থামিয়ে সেই মেশিনটার দিকে আঙুল তুলে মিস্টার মিত্র বললেন, 'এটা এখন তোমার। বাড়ির জন্যে আর কখনও তোমার মন কেমন করবে না।'

'কী এটা ?' বাচ্চাদের মতো কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করল শৌভিক।

'আরে এটাই তো আসল জিনিস। এর নাম মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট। এর সাহায্যে তোমার মেমরিতে যা আছে তার একটা অংশ তুমি ভিশুয়ালাইজ করতে পারবে। এই হেলমেট আর চশমা আঁটলেই স্মৃতির ছবি তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মনে হবে, ওই ছবির মধ্যেই আছ তুমি। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে মন ভাল হয়ে যাবে তোমার।'

মিস্টার মিত্রের কথাগুলো অবিশ্বাস্য ঠেকছিল শৌভিকের, কিন্তু বিশ্বাস না



হেলমেট পরবার পরে সাহেব ওর চোখে একটা সবুজ চশমা পরিয়ে দিল। চশমার সঙ্গে অনেকগুলো তার, তারের প্রান্তগুলো বিদঘুটে চেহারার একটা মেশিনের সঙ্গে আটকানো। মেশিনের একটা বোতাম টিপতেই নানা ধরনের আলো জ্বলতে-নিভতে লাগল... ।

করে উপায় নেই। একটু আগে বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। মনে হচ্ছিল কলকাতায় বাড়ির লোকদের মধ্যে বসে-বসে গল্প করছে ও। মিনুর কথাগুলো এখনও তো ওর কানের ওপর বাজছে।

মিস্টার মিত্র ছোট্ট মাপের আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'জুরিখের একজন বিজ্ঞানী কিছুদিন হল এটা আবিষ্কার করেছেন। কীভাবে আবিষ্কার করেছেন জানো?'

'না।' সুবোধ বালকের মতো দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল শৌভিক।

মিস্টার মিত্র ছোট্ট সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'এই বিজ্ঞানীর নাম ফ্রেডরিখ উইস। আবিষ্কারের পিছনে এঁর ছোট ছেলের বিরাট একটা ভূমিকা আছে। ছেলেটা ছিল রাম-কাঁদুনে। উইস আর তাঁর বউ সকালবেলায় ল্যাবরেটরিতে যাওয়ার আগে ছোট ছেলেকে একটা ক্রেশে দিয়ে যেতেন। ক্রেশে ছেলেটার সমবয়েসী আরও অনেক বাচ্চা ছিল, কিন্তু ছেলেটা কারও সঙ্গে খেলবে না। কত খেলনা, কিন্তু একটাও ছুঁয়ে দেখবে না। খালি "মা-মা" করে কাঁদবে। নার্সারির প্রিন্সিপাল নিরুপায় হয়ে একদিন ডক্টর উইসকে বললেন: "আপনি বাচ্চাকে অন্য কোথাও দিন, একে শান্ত করার সাধ্য নেই আমাদের।" শুধু ওখানেই নয়, সব ক্রেশের টিচারদেরই এক কথা— "আপনার ছেলেকে আমরা রাখতে পারি না।" মহা মুশকিলে পড়লেন উইস-দম্পতি। দুজনেই বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানচর্চা শিকেয় তুলে ছেলে মানুষ করা কি সম্ভব! এখন উপায়?' মিস্টার মিত্র প্রশ্নটা এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন, যেন সমস্যার সমাধান বার করার দায়িত্ব শৌভিকের।

কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল শৌভিক। মিস্টার মিত্র ছোট সিগারেটে ছোট্ট একটা টান মেরে বললেন, 'এখন উপায়? উপায় একটা বার করতেই হবে। মাথা খাটাতে শুরু করে দিলেন ডক্টর উইস, তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললেন মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট। ব্যস, সব সমস্যা মিটে গেল ম্যাজিকের মতো। ছেলে কাঁদলেই ক্রেশের টিচাররা বাচ্চার মাথায় হেলমেট আর চোখে চশমা এঁটে দিতেন। অমনই কান্না বন্ধ। বাচ্চা হাসিমুখে হাততালি দিতে-দিতে "মা-মা", "ডা-ডা" বলত।'

'দারুণ!' শৌভিক নিজেই হাততালি দিয়ে উঠল বাচ্চাদের মতো।

মিস্টার মিত্র সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আবিষ্কারের খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই হইহই পড়ে গেল সারা দেশে। ছিচকাঁদুনে বাচ্চাদের সংখ্যা তো আর কম নয়! সবাই ছুটে এল ডক্টর উইসের কাছে। কিন্তু একা উইসের পক্ষে সবার আবদার সামলানো সম্ভব নয়। তাল বুঝে একটা আন্তর্জাতিক কোম্পানি এগিয়ে এসে বলল, আমরা মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট বানাতে চাই, আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আসুন। ব্যস, রাতারাতি বিলিওনিয়ার হয়ে গেলেন ডক্টর উইস। তবে মজাটা কী জানো—' মজাটা কী, বলার আগেই একটু হেসে নিলেন মিস্টার মিত্র।

তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'বাচ্চারাই শুধু ছিচকাঁদুনে হয় না, অনেক বাচ্চার মায়েরাও একটু ছিচকাঁদুনে স্বভাবের হয়। কিন্ডারগার্টেনে বাচ্চারা হয়তো দিব্যি খেলাধুলো করছে, কিন্তু অফিসে গিয়ে বাচ্চাদের কথা ভেবে কিছু-কিছু মায়ের খুব মনখারাপ হয়ে যায়। তারাও তখন কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেট ব্যবহার করে মন ভাল করে নিতে শুরু করল। তারপর আছে তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা। দূরদেশে গেলেই বাড়ির কথা ভেবে-ভেবে মনখারাপ করে ফেলে। তোমাদের হোমসিকনেস কাটাবার কাজেও এই ক্যাসেটটা অব্যর্থ।'

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে মিস্টার মিত্র চলে গেলেন। আর চলে যেতেই হেলমেট আর চশমা এঁটে বোতাম টিপে দিল শৌভিক। সঙ্গে-সঙ্গে সবকিছু অদ্ভুতভাবে পালটে গেল।

ষষ্ঠীতলার দোতলার ঘরে বেতের চেয়ারে বসে-বসে গল্পের বই পড়ছে শৌভিক। মিনু খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ড্রয়িং খাতায় একটা মজাদার চেহারার ভূতের ছবি আঁকতে-আঁকতে নিজের মনেই হেসে উঠছে। মায়ের একসঙ্গে তিনটে ঘরের কাজ করা স্বভাব, তাই প্রতি তিন মিনিট অন্তর একবার করে এ-ঘরে ঢুকে কী যেন একটা করে যাচ্ছে। হঠাৎ মিনু লাফ দিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল একটু পরে। তারপর পা টিপে-টিপে দাদার কাছে এসে বলল, 'দাদা, কোনও কিছুর গন্ধ পাচ্ছিস ?' অনেকটা বাতাস নাকের মধ্যে টেনে নিয়ে দাদা মাথা নাড়ল দুদিকে। মিনু চোখ বড়-বড় করে বলল, 'পাচ্ছিস না ? আমি কিন্তু ঠিক পেয়েছি।' তারপরেই হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'মা চাইনিজ খাবার বানাচ্ছে।'

ঠিক আট মিনিট পরে শৌভিকের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল বাড়ির ছবিটা। হেলমেট আর চশমাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার পরেও অবাক ভাবটা কাটছিল না ওর। সত্যি-সত্যি কোথায় এখন ও ? ষষ্ঠীতলায়, না বার্নে ? তারপরেই তারিফ করার চোখে তাকাল ক্যাসেটটার দিকে। বাড়ির জন্য সেই মন-কেমন-করাটা এখন আর একদম নেই।

সুইজারল্যান্ডে পাক্কা দু-বছর ছিল শৌভিক, কিন্তু বাড়ির কথা ভেবে আর একদিনও ও কাঁদেনি। একটু মনখারাপ করলেই ও হেলমেট আর চশমা এঁটে নিত। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে মন-মেজাজ দারুণ ভাল হয়ে যেত।

দু-বছর একদিনের মাথায় সুইজারল্যান্ড থেকে দেশে ফেরার প্লেনে উঠল শৌভিক। বাড়ির জন্য ওর আর এখন একটুও মনখারাপ করছে না, কিন্তু সমানে ছটফট করছিল কখন বাড়ি পৌঁছবে ভেবে। তারপরেই মনে হল, আরে ! মিনুর যা লম্বাটে গড়ন, এই দু-বছরে ও নির্ঘাত আরও অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। হয়তো এখন শখ করে শাড়ি পরে মাঝে-মধ্যে।

শাড়ি-পরা লম্বা মিনুর ছবিটা মনে-মনে ভেবে নিয়ে হেলমেট আর চশমা এঁটে মেমরো-ভিশুয়াল ক্যাসেটের বোতাম টিপে দিল শৌভিক। ওই তো

মিনু। এই দু-বছরে ও মাথায় বেড়ে গেছে কিছুটা, তার ওপর শাড়ি পরে দিব্যি বড়সড় দেখাচ্ছে ওকে। ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামার আগে আরও অনেকবার ক্যাসেট চালিয়েছিল শৌভিক।

মা, বাবা আর মিনু তিনজনেই এসেছিল এয়ারপোর্টে। পাক্কা দু-বছর বাদে ওদের দেখে শৌভিকের সে কী আনন্দ! কিন্তু ও সবচাইতে অবাক হয়ে গিয়েছিল মিনুকে দেখে। মেমরো-ভিশুয়ালে মিনুকে যেমন দেখাচ্ছিল, মিনু অবিকল সেইরকম। শাড়ি পরে ও যেন এখন রীতিমত একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলা আবার একটু লাজুক প্রকৃতির।

এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরার পথে শৌভিক বলল, 'মিনু একটু আগে প্লেনের মধ্যে তোকে আমি যেমন দেখেছিলাম, তুই ঠিক সেইরকমই দেখতে।'

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে মিনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

উত্তরে রহস্যময় হাসি হাসল ওর দাদা, তারপর বলল, 'বাড়ি চল, বলছি।'

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

মায়াবী

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়



সমীরদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে ছেলেটিকে দেখে অবাক হল বিষ্ণু। দশ-বারো বছর বয়েসের ছেলে। গায়ের রঙ তামাটে। ঠোঁট দুটো পুরু। তবে বয়েস অনুপাতে চেহারাটা বেঁটেখাটোই। হয়তো একটু মোটাসোটা বলেই ওকে এ রকম দেখায়।

ওর চেহারা দেখে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিষ্ণুর অবাক হওয়ার কারণ অন্য।

সমীর ওর বি. ই. কলেজের বন্ধু। দুজনে হস্টেলের একই ঘরে থাকে। পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছে সমীরদের গ্রামে। বীরভূমের ময়ূরাক্ষীর ধারে গ্রাম। বিকেলে নদীর ধারে লাল মোরাম-ছড়ানো পথে হাঁটতে-হাঁটতে সমীরই বলল কথাটা।

'রামুকে দেখলি?'

'রামু? কেন বল তো?'

'বাবা যখন মধ্যপ্রদেশের চিরিমিরির চুনাপাথরের খনিতে কাজ করতেন, তখন ওকে পেয়েছিলেন।'

'রামু তোদের গ্রামের ছেলে নয়?'

'ও যে কোথাকার ছেলে, বাড়ি কোথায়, মা-বাবাই বা কে, তা আমরাও জানি না। জঙ্গলের পথে জিপে কোয়ার্টারে ফেরার সময় হঠাৎ বাবা ওকে দেখতে পান। তখন সন্ধেবেলা। বাবা দেখতে পেলেন, একটা ছোট্ট ছেলে রাস্তার ধারে বসে আছে। প্রথমে ভেবেছিলেন, আশপাশের কোনও সাঁওতালি গ্রামের ছেলে। অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পেরেছিলেন, ছেলেটিকে ওখানে কেউ ফেলে রেখে গেছে। বাবা ওকে কোয়ার্টারে এনেছিলেন। রিটায়ার করার পর বাবা ওকে এখানে নিজের কাছেই রেখেছেন।'

'ওর মা-বাবার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'না।'

'রামুও কিছু বলতে পারেনি?'

'তখন ওর বয়েস বছর দেড়েক। মুখ ফুটে ভাল করে কথাও বলতে পারত না।'

কিন্তু এখন রামু শুধু কথাই বলে না, ওর চিন্তাভাবনাও অন্যদের থেকে আলাদা। আর সেটা দেখেই অবাক হল বিষ্ণু।

সন্ধেবেলা লণ্ঠনের আলোয় দুই বন্ধু অঙ্ক নিয়ে বসেছে। চা নিয়ে ঘরে ঢুকল রামু। অঙ্কের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকল।

'সহজ জিনিসটা তোমরা এত কঠিন করে নিয়েছ কেন?'

'অঙ্ক অনেকেরই কঠিন মনে হয়।' সমীর বলল।

বিষ্ণু রামুর দিকে তাকিয়ে দেখল, সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের হলুদ তেরছা আলোয় কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে ওকে। ওই যে রামু এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ওর মন যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছে।

'রামু, এই রামু।'

সমীরও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক!

কোনও-কোনও ঘুমন্ত মানুষ যেমন নিজের মনে কথা বলে, রামু ঠিক সেই গলাতেই কাকে যেন বলছে, 'আমরাও তো অঙ্ক কষতাম। কিন্তু এমন জটিল নয়। এত সংখ্যাই বা কেন।'

রামুর গায়ে একটু ঠেলা দিতেই ওর সংবিৎ ফিরে এল। বিষ্ণু ওর হাতে ডট পেন দিয়ে বলল, 'তুমি দেখাও না, কেমন ছিল তোমাদের অঙ্ক।'

খাতার পাতায় ডট পেনটা একবার ঠুকে দিয়েই রামু জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো এটা কী?'

'এটা তো কালির একটা বিন্দু।'

'এটা আমরা বলতাম এক। দুটো বিন্দু মানে দুই। তিনটে বিন্দু মানে তিন। চারটে বিন্দু মানে চার।'

'পাঁচটা বিন্দু মানে পাঁচ? ফুটকি বা বিন্দু দিয়ে কি বড়-বড় অঙ্ক কষা যায়।'

'চার পর্যন্ত আমরা ফুটকি দিতাম। পাঁচ বোঝাতে আমরা আলাদা চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করতাম। ভাবো তো, কত সহজ ছিল ব্যাপারটা?'

'আলাদা চিহ্নটা এঁকে দেখাবে?'

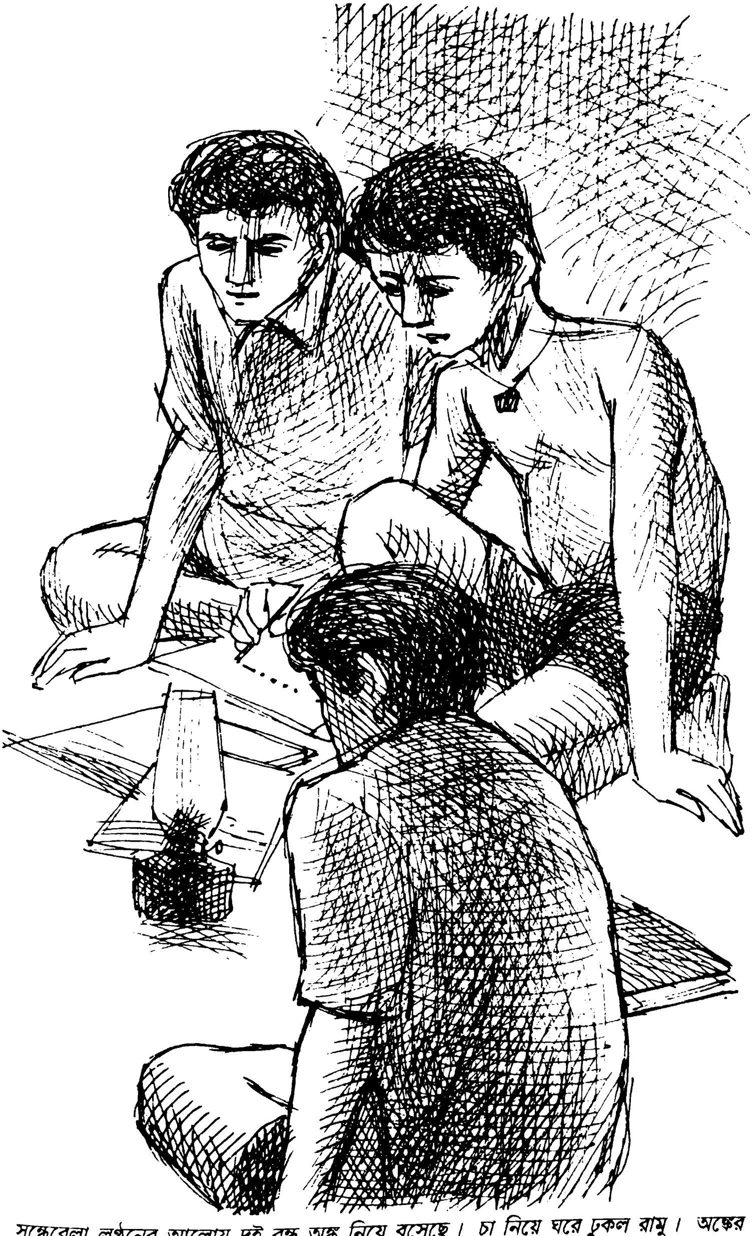
'এই তো।' খাতায় একটা 'ড্যাশ' চিহ্ন দিল রামু, 'বলো তো এটা কী?' সে ড্যাশের ওপর, ঠিক মাঝ-বরাবর একটা ফুটকি দিল।

'ছয়।' সমীর ও বিষ্ণু একসঙ্গে উত্তর দিল।

'দেখলে তো কত সহজ ব্যাপারটা! আর তোমরা কত মাথা খাটিয়ে আলাদা-আলাদা সংখ্যা বার করেছ। আমাদের একটা শূন্যও ছিল। সব মিলে মাত্র তিনটে চিহ্ন।'

রামু খুব উৎসাহ নিয়ে কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর বলল, 'দাও, তোমাদের চা গরম করে আনি। জুড়িয়ে গেছে।'

কাপ দুটো নিয়ে রামু যেমন এসেছিল, ঠিক সেরকমই নিঃশব্দে বেরিয়ে



সন্ধেবেলা লণ্ঠনের আলোয় দুই বন্ধু অঙ্ক নিয়ে বসেছে। চা নিয়ে ঘরে ঢুকল রামু। অঙ্কের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে তন্ময় হয়ে দেখতে থাকল।

গেল। লণ্ঠন ঘিরে কয়েকটা পোকা উড়ছে। বিষ্ণু ডট পেন নিয়ে খাতায় ফুটকি বসাল কয়েকটা। এক, দুই, তিন, চার। পাশাপাশি চারটে ফুটকি। তার নীচে রেখা টানল।

তার মানে, নাইন বা নয়। এই তো ? হ্যাঁ, এভাবেই তো এক-একটা সংখ্যা বোঝানো হত। কিন্তু মনে পড়ছে না, ঠিক এখনই মনে পড়ছে না, কারা এভাবে অঙ্ক কষত।

'রামু, এই রামু ?' বিষ্ণুকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। রামু আবার চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

'কারা এভাবে অঙ্ক কষত, রামু ?'

'আমরা কষতাম।' ঠাণ্ডা গলায় রামু উত্তর দিল।

বিষ্ণু অস্থির হয়ে পড়েছে। রামু চায়ের কাপ দুটো রেখে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বিষ্ণু ভাবল ওকে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কারা ? কিন্তু ওর স্মৃতিই বা এমন দুর্বল হয়ে পড়ল কেন ? বিষ্ণু কোন বইয়ে যেন পড়েছে, তিনটি প্রতীকের কথা। তিনটি প্রতীক দিয়ে যারা এভাবে সংখ্যা বোঝাত, তারা আজ কোথায় ? না, ওর স্মৃতি আজ বড় বিশ্বাসঘাতকতা করছে ওর সঙ্গে। মনে পড়ছে না কিছুতেই। রামু ভাবিয়ে তুলল দেখছি !

বিষ্ণু ভাবল, কাল সকালে রামুকে ভালভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তার আগেই আবার চমকে দিল রামু।

সকালবেলা চায়ের টেবিলে সমীরের বাবা হরিহরবাবু তাঁর চিরিমিরির দিনগুলোর কথা বলছিলেন, 'বনেজঙ্গলে সময় বুঝতে পারতাম না। কুঁড়ে লোকদের ঠাট্টা করে বলা হয় না, ওদের আঠেরো মাসে বছর ? তা, আমারও ছিল তাই।'

কথাটা কানে গেছে রামুর। গোয়ালের এককোণে বসে খড় কাটছিল। ওখান থেকে উঠে এসে বলল, 'আমরা আঠেরো মাসেই বছর গুনতাম।'

'তুই আবার মাস, বছর, এসব হিসেব রাখলি কবে ?' হাসতে-হাসতে বললেন হরিহরবাবু।

'কুড়ি দিনে আমরা এক-একটা মাস ধরতাম। বছরে আঠেরো মাস।'

'আরও পাঁচটা দিন গেল কোথায় ?'

'আঠেরো মাসের পর, ওই পাঁচটা দিন আমরা যোগ করে দিতাম। তবে সেই পাঁচটা ছিল ভয়ঙ্কর দিন। শালুকপুকুরের কুমির তার পিঠটা নাড়ত। কত কিছু ওলটপালট হয়ে যেত।'

জাতিস্মর নিয়ে কিছু গল্প পড়েছিল বিষ্ণু। কিন্তু রামুকে ওর কোনওভাবেই জাতিস্মর মনে হচ্ছে না। সে হয়তো পূর্বজন্মেরই কথা বলছে। কিন্তু তফাত একটা আছেই। বিষ্ণু কিছুতেই তফাতটা ধরতে পারছে না। আঠেরো মাসে কারা বছর গুনত ? বিশেষ একটা বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় নয়। পুরো একটা গোষ্ঠী বা সমাজ। তারা কারা ? বিষ্ণু অঙ্কের ভাল ছাত্র। রামুর কথার মধ্যেও

সে একটা অঙ্কের আভাস পাচ্ছে। পাচ্ছে কিছু সূত্র। জট সে খুলবেই।

'সেই কুমিরটা কোথায় রামু ? লালশালুক-ফোটা পুকুরটাই বা কোথায় ?'

দুম করে পাহাড়গুলোর দিকে রামু আঙুল তুলে দেখাল : 'ওই তো কুমিরের পিঠ।'

'ওগুলো পাহাড়। তুমি তো পাহাড় চেনো।'

হলুদ-সবুজ ধানমাঠগুলো দেখাল রামু : 'ওই যে কুমির।'

বিষ্ণু কী বলবে এখন ? বললে এরকমই উত্তর পাবে।

দুপুরবেলা দেখল, রামু উঠোনে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছে। কিছু সবুজ ডালপালা ভেঙে মাঝখানে রেখে তার চারপাশে কয়েকটা জিনিস দিয়ে সাজিয়েছে। একদিকে রেখেছে নুন। আর ঠিক তার উলটো দিকে হলুদগুঁড়ো। আর একদিকে লঙ্কাগুঁড়ো। রান্নাঘর থেকে এসব এনেছে। যেদিকে লঙ্কাগুঁড়ো রেখেছে, ঠিক তার উলটোদিকেই সাজিয়েছে কয়েক টুকরো কাঠকয়লা।

এসবের মানে নেই ? নিজের মনে সমস্ত জিনিসটা এঁকে রাখল বিষ্ণু। রামুর সব কিছুই এখন বিষ্ণুর গবেষণার বিষয়।

'মেসোমশাই, রামুর পরিবারের কোনও খোঁজখবর পাননি ?'

'কম চেষ্টা করিনি। আমাদের খনির সব কুলিকামিনকে বলে রেখেছিলাম। থানায় খবর দিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। তারপর চিরিমিরিতে যে ক'বছর ছিলাম, হাল ছাড়িনি। ভেবেছিলাম, ছেলেটাকে ওর মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেব। তা আর হল কোথায় ?'

'ওরও কিছু মনে নেই।'

'ওর তখন কতটুকুই বা বয়েস ? এখন সেই সন্ধেবেলার কথা ভাবলেই মনে হয়, রামু যেন সেদিন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছিল।'

'কেউ হয়তো ওকে ফেলে রেখে গিয়েছিল।'

'সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওকে ফেলে রেখে সে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল কী করে ! এমন নয় যে, হাজার-হাজার লোকের ভিড়ে মিশে গিয়েছে ! মাইলের পর মাইল তো ওখানে কোনও বসতিই নেই। ভাবতেও অবাক লাগে ! রামুকে যেখানে পেয়েছিলাম, সেই জঙ্গলের ভেতরে আছে একটা বিশাল ধ্বংসস্তূপ।'

'রামুর কথাবার্তাও অদ্ভুত !'

'ছেলেমানুষ, ওরকম বলেই। অত গুরুত্ব দিতে নেই। তবে ছেলেটা বড় ভাল। ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। ওকে আর ছাড়তে পারব না।'

ব্যাপারটাকে অবশ্য হালকাভাবে নেয়নি বিষ্ণু। বীরভূম থেকে কলকাতার বাসায় ফিরে এসেই লাইব্রেরিতে দৌড়ল। পুজোর ছুটি শেষ হতে তখনও কয়েকদিন বাকি। কলেজ খুললে সমীর ফিরবে। তার আগেই বিষ্ণুকে জানতে হবে, সংখ্যা বোঝাতে কারা মাত্র তিনটি প্রতীক ব্যবহার করত। সে জানত,

কোথায় যেন পড়েছিল। আবার তোলপাড় করে দেখতে হবে।

দেখতে-দেখতে দেড় মাস কেটে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত জানার সুযোগটাও এসে গেল হঠাৎ। যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, সে ব্যর্থ হয় না। কোনও না কোনওভাবে সে সফল হয়ই। আর বিষ্ণুর ক্ষেত্রে এটা ঘটল, নেহাত আকস্মিকভাবেই।

রাত্রে হস্টেলে শুয়ে রামুর প্রতিটি কথা সে আগাগোড়া ভাবছিল। মেসোমশাইয়ের শেষদিনের কথাও মনে পড়ে গেল : 'ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। ওকে আর ছাড়তে পারব না।'

বিষ্ণু লাফ দিয়ে উঠল বিছানায়। পাশের খাটে সমীর ঘুমোচ্ছে। ওকে ঠেলেঠুলে ঘুম থেকে ওঠাল।

'কাল সকালেই যেতে হবে তোদের গ্রামে। কী সাঙ্ঘাতিক ভুলই না করেছি!'

'কী হল তোর?'

'রামু, তোদের রামু। মায়া, সবটাই মায়া। ছি ছি, কী বোকামিই না করেছি!'

'মাথাখারাপ হয়ে গেল নাকি তোর?'

'মনে পড়ছে, রামু সেদিন উঠোনে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করেছিল? মাঝখানে সবুজ ডালপালা, আর চারদিকে কোথাও লঙ্কাগুঁড়ো, কোথাও বা হলুদগুঁড়ো, কাঠকয়লা, কিংবা নুন। জানিস, আজ থেকে তিন সাড়ে-তিন হাজার বছর আগে মেসো-আমেরিকানদের একটা শ্রেণী আমাদের এই পৃথিবীকে এভাবে কল্পনা করত। এক-একটা দিক বোঝাতে রঙ ব্যবহার করত এভাবে। ছি ছি, রামুর এসব দেখেও আমার মনে পড়েনি? এত সময় লাগল কেন? এত যে ইতিহাসের বই পড়লাম, তাও কিনা ঠিক সময়ে মনে পড়ল না? আচ্ছা, বল তো, রামু লঙ্কাগুঁড়ো কোন দিকে রেখেছিল? পুব দিকে না? আর পশ্চিমে কাঠকয়লা, তাই না?'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ঠিক তাই। উত্তরে রেখেছিল নুন, দক্ষিণে হলুদগুঁড়ো।'

'উত্তরেই তো তুষারতারা। সব অঙ্ক মিলে যাচ্ছে। ওই যে সংখ্যা বোঝাতে তিনটি প্রতীক? কারা ব্যবহার করত জানিস? মায়াবীরা।'

'মায়াবীরা?'

'যারা মায়া-সভ্যতার মানুষ। সেই মেক্সিকোর তাবাস্কো, চিয়াপাস রাজ্য, হণ্ডুরাস, এল সালভাদোর, ইউকাতান পেনিনসুলা।'

'তোর সত্যিই মাথাখারাপ হয়ে গেছে। তুই বলতে চাস রামু সেই মায়া-সভ্যতার লোক, হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে জন্মেছে। তারপর ওর পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে।'

'আমি এই মুহূর্তে কিছুই বলতে চাই না। তোদের গ্রামে গিয়ে কালই ওকে

একবার দেখতে চাই।'

'কাল কত তারিখ ?'

'ডিসেম্বরের উনত্রিশ।'

'বাবা প্রতি বছর এই সময় চিরিমিরিতে থাকেন। রামুকে সঙ্গে নিয়ে যান।'

'আবার চিরিমিরিতে কেন ?'

'বাবার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এখনও ওখানে আছেন। বাবা ওঁদের কাছেই যান। ছুটিছাটায় ওঁরাও আমাদের গ্রামে আসেন।'

'তার মানে আমাকে এখন চিরিমিরি যেতে হবে ? ঠিক আছে।'

বিলাসপুর থেকে জিপ নিল ওরা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে এঁকেবেঁকে।

'রামু যে কুমিরের কথা বলেছিল, মনে আছে ?'

'কুমিরের পিঠ নাড়ানোর কথা বলেছিল। এই জায়গাটা দেখছি কুমিরের পিঠের মতোই।'

'হয়তো ওটা ওদের কিংবদন্তি। পৃথিবীকে কুমিরের সঙ্গে তুলনা করে। হয়তো ভূমিকম্পের রূপক।'

'আর লালশালুকের পুকুর ? রূপকথা, না কিংবদন্তি ?'

'রামুকে আমি কলকাতায় নিয়ে আসব। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ফেরার আগে সেই ধ্বংসস্তূপটাও দেখে আসব, মেসোমশাই যার কথা বলেছিলেন। ভালই হল, তোদের গ্রাম থেকে রামুকে নিয়ে আমাকে এখানে আসতেই হত।'

'কিন্তু বাবার সঙ্গে যদি দেখা না হয় ! যদি বাবা এখন গ্রামে ফিরে গিয়ে থাকেন ?'

'দেখাই যাক না !'

দূর থেকে একটি জিপ আসছে দেখা গেল। কাকতালীয় ঘটনা, তবু হ্যাঁ, হরিহরবাবুরই জিপ। উনি নিজেই জিপ থামালেন। ক্লান্ত, বিভ্রান্ত চেহারা।

'এ কী, তোমরা ?'

'আপনি এখানে এসেছেন শুনে চলে এলাম।'

'রামুকে পাচ্ছি না। ওর খোঁজেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'আমরা তো রামুর জন্যেই এসেছি।'

'যাওয়ার সময় এই জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ আমার জিপ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অয়েল পাম্প ট্রাব্‌ল দিচ্ছিল। বনেট খুলে কোনওরকমে সামাল দিয়ে ফিরে এসেই দেখি, রামু নেই। নিঃশব্দে কখন চলে গিয়েছে। সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে গিয়ে দেখে এসেছি। যতটা পুরনো শুনেছিলাম, তা নয়। ওটা একসময় ছিল আদিবাসী গ্রাম। এখন সবাই ছেড়েছুড়ে চলে গেছে।'

বিষ্ণু ও সমীর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল। আগেই ওরা জিপ থেকে নেমে এসেছিল। ওদের পাশেই এখন হরিহরবাবু। দুটি জিপের দুজন ড্রাইভার। আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া মাথায় নিয়ে পাঁচটি পুরুষ জঙ্গলের মধ্যে একা।

বিষ্ণুর মনে পড়ল, বছর শেষ হতে আর দু-দিন মাত্র বাকি। কুড়ি দিনে মাস ও আঠেরো মাসে বছর গোনার পর যে পাঁচদিন থাকে, ভয়ঙ্কর সেই পাঁচটি দিন। উত্তর থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। উত্তরের ধূসর ম্লান দিগন্তের ওপর একটা মরা তারা। ওরা বলত, তুষারতারা।

দুটি জিপ একই দিকে ফিরে চলল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

টাইম মেশিনের টোপ

সিদ্ধার্থ ঘোষ



সাত কি সতেরো হাত ফেরত বলা যাবে না। তবে এই পালিশ-চটা পুরনো টেবিলটা নিঃসন্দেহেই ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চলেছে। রাসেল এক্সচেঞ্জ থেকে রবিবারের অকশনে কেনা টেবিলটা কোনও আহামরি বস্তু নয়। নয় বলেই অবশ্য রিসার্চ স্কলার সায়ন্তন মুখার্জি প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অ্যান্টিক বিশেষজ্ঞদের চোখের সামনে থেকে মাত্র ন'শো টাকায় রাইটিং ডেস্কটা হস্তগত করতে পেরেছে।

পরের দিনই টেবিলটা ডেলিভারি নিল সায়ন্তন। সস্তায় ভাড়া করা নড়বড়ে টেম্পো। টায়ারে পটি বা তালি মারা। তার ওপর সায়ন্তন থাকে শিবপুরে। লক্ষ-লক্ষ ঝাঁকানি খেয়েছে টেবিলটা। এই ঘটনারও গুরুত্ব কম নয়। না হলে, ডেস্কের ডান দিকের ড্রয়ারটা খসে পড়ত না এবং ওই গুপ্তকক্ষটা এতকালের মতো সায়ন্তনেরও অগোচরেই থেকে যেত।

সোম থেকে বুধ বাড়ি থেকে বেরোয়নি সায়ন্তন। টেবিলের পিছনে ছোট্ট একটা খুপরির মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছে বিয়াল্লিশ পাতার একটি ইংরেজি পাণ্ডুলিপি। এইটাই তাকে বিভোর করে রেখেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, এটি এক টাইম মেশিন নির্মাতার নোটবই। নোটবইয়ের শেষ পাতায় লেখক পুরো নাম লেখেননি, শুধু আদ্যক্ষর— এইচ. জি. ডব্লিউ.। আদ্যক্ষরের নীচে সম্ভবত লেখা শেষ হওয়ার তারিখ, ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৩।

সায়েন্স কলেজ ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পরবর্তী দু-দিন বৃথা নষ্ট করল সায়ন্তন। ওই আদ্যক্ষরের সূত্র ধরে এমন কোনও বিজ্ঞানীর সন্ধান মেলেনি, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফোর্থ ডাইমেনশন নিয়ে কাজ করেছিলেন। এর পরে আবিরকে ফোন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

'এ তো দুরূহ প্রবলেম রে! তা, ধর, যদি বলি এইচ. জি. ওয়েল্‌স— চলবে? এই ভদ্রলোক 'টাইম মেশিন' নামে একটা ছোট্ট উপন্যাস লিখেছিলেন। তাতে ফোর্থ ডাইমেনশনেরও উল্লেখ আছে।' কোনও কথা সোজা করে বলা আবিরের ধাতে নেই।

একটু দোটানায় পড়ে সায়ন্তন। আবির তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠিকই, কিন্তু তা হোক, এখনই কি সবটা খুলে বলা উচিত ? আবার এটাও ঠিক যে, আবিরকে বাদ দিয়ে একা তার পক্ষে এগনোও সম্ভব নয়।

'শোন, আবির, ব্যাপারটা জরুরি। ওই টাইম মেশিন বইটা একবার পড়াতে পারবি ?'

'জরুর। ওটা কিন্তু সায়েন্স নয়, সায়েন্স ফিকশন।'

'বুঝেছি, বুঝেছি।'

'শুধু বইটা পেলেই হবে ? না কি ফিল্মেরও একটা ক্যাসেট দরকার ?'

'ফিল্ম হয়েছে টাইম মেশিন ?'

'জি হুজুর। অবশ্য বই প্রকাশের কমপক্ষে ছ' দশক বাদে।'

১৮৯৩। পাণ্ডুলিপি রচনার সালটা আচমকা মনে পড়ে গেল সায়ন্তনের। 'আচ্ছা আবির', সায়ন্তন রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে, 'ওয়েল্‌সের উপন্যাসটা কবে লেখা হয়েছিল জানিস ?'

'কবে লেখা বলতে পারব না, ১৮৯৫-এ ছাপা হয়।'

বই এবং দু-দুটো ক্যাসেট হাতে পরের দিনই হাজির আবির। প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত 'ব্যাক টু দ্য ফিউচার' নামে একটা ফিল্মের ক্যাসেট সংগ্রহ করেছে। এটা ওয়েল্‌সের গল্প অবলম্বনে তৈরি না হলেও, কারবারটা টাইম মেশিন নিয়েই।

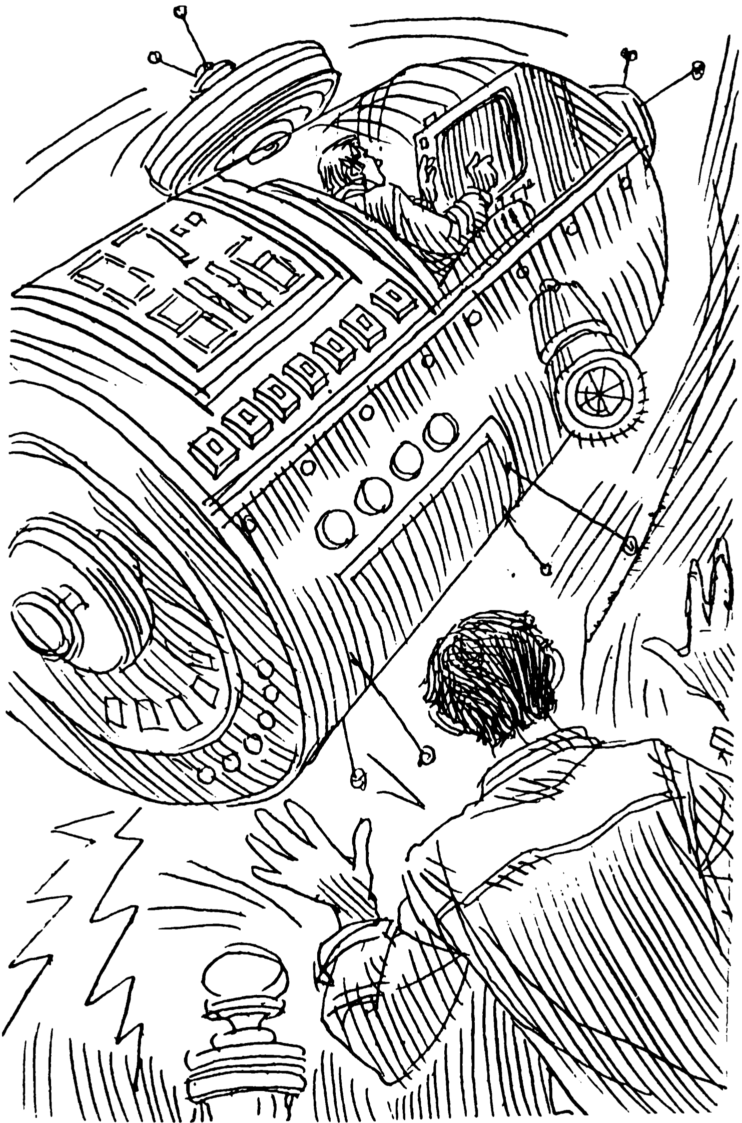
প্রয়োজনমতো ফাস্ট-ফরওয়ার্ড করে ক্যাসেটে ভরা টাইম মেশিন দুটোকে ভাল করেই পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছে সায়ন্তন। এবং বেজায় হতাশ হয়েছে : 'রাবিশ ! যেমন রড টেলরের টাইম মেশিন, তেমনই লয়েডের ডি-লরিয়ান গাড়ি। বোগাস !'

হতাশাব্যঞ্জক নতুন এক-আধটা সমার্থক শব্দের সন্ধান লাভের এমন সুযোগ খারিজ করে দিল আবির। টাইম মেশিন বইটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চূড়ান্ত অভিমত পেশ করার আগে দেখা দরকার স্বয়ং ওয়েল্‌স তোকে সন্তুষ্ট করতে পারেন কি না।'

দ্রুত পাতা উলটে টাইম মেশিনের মডেলের বিবরণে পৌঁছে থমকে যায় সায়ন্তন। আপনমনে বলে, 'ক্লক ওয়ার্ক ? ঘড়ির যন্ত্রাংশ ? বেশ, বেশ। কিন্তু শক্তি জোগাচ্ছে কে ? শুধু স্প্রিংয়ের ভরসায় তো হবে না।'

আরও কয়েক পাতা উলটে মূল টাইম মেশিনের বর্ণনার অংশে পৌঁছেছে সায়ন্তন।

'দুর্দান্ত !' 'অসাধারণ।' 'ওয়ান্ডারফুল !'—এক-একটা লাইন পেরোয় আর একটি করে বিশেষণ প্রয়োগ করে। বইটা নামিয়ে রেখে আবিরের দিকে তাকাল সায়ন্তন : 'অসাধারণ। ওসব ফিল্ম-টিল্ম কিচ্ছু নয়। আসল জিনিস এখানেই আছে। কোয়ার্ৎজ। শুধু এই একটি ক্লু ছাড়া আর কিচ্ছু ভেঙে বলেননি ওয়েল্‌স। কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট। আর কোনও সন্দেহ নেই যে, স্বয়ং



গহন বনে সন্ধে নামার মুখে ঝিঁঝি পোকাদের ঐকতানের মতো ধারালো গুঞ্জন তুলে ও রঙের রামধনু ছিটিয়ে টাইম মেশিন তার যাত্রা শুরুর পর্বে দশ-পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই উধাও হয়ে গিয়েছিল।

ওয়েল্সের লেখা টাইম মেশিন তৈরির অপ্রকাশিত কারিগরি-বৃত্তান্ত এখন আমার পকেটে। বুঝলি আবির, উপন্যাসে উনি আসল কথাটা কায়দা করে এড়িয়ে গেছেন, অথচ মিথ্যেও লেখেননি। সিঙ্গল ক্রিস্টাল— এই বিশেষণটা বর্জন করে শুধু কোয়ার্ৎজ। না হলে এতদিনে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় অসিলেটর সার্কিটের গন্ধ পেয়ে যেত।'

'এইসব অশ্বত্থামা হত ইতি উক্তিকে আমি সত্যভাষণের মর্যাদা দিতে রাজি নই।' আবিরের আবেগবিহীন মন্তব্য।

আবির সাহিত্যের ছাত্র। কিন্তু তা হলেও গত এক সপ্তাহ তাকে সায়ন্তনকে সঙ্গ দিতে হয়েছে। কিছু বুঝুক বা না বুঝুক, ঘাড় নেড়ে উৎসাহিত করেছে বন্ধুকে। নানাদিক থেকে সায়ন্তন ওয়েল্সের থিয়োরিগুলো বাজিয়ে দেখেছে। তত্ত্বগতভাবে ওয়েল্স টাইম মেশিন নির্মাণের কৌশল পুরোপুরি আয়ত্ত করেছিলেন, এ-কথা মানতে দ্বিধা নেই সায়ন্তনের। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে, সে-যুগে ওই তত্ত্বকে কার্যকর করার মতো অগ্রগতি ঘটেনি ইলেকট্রনিক্স বিদ্যার। টেকনিক্যাল দিক থেকে আবিরের কোনও ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ নেই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা ওয়েল্স কেন তাঁর লেখার টেবিলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সে-সম্বন্ধে তার অভিমত খুবই যুক্তিপূর্ণ। টাইম মেশিনের উদ্ভাবন মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলে নিশ্চয় দুর্ভাবনা ছিল তাঁর। তাই টাইম মেশিন নিয়ে শুধু সাহিত্য রচনার ভান করেছেন।

টাইম মেশিন তৈরির ব্যবস্থা করতে তিন মাস কেটে গেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, যন্ত্রটা তৈরি করার খরচ আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও প্রয়োজনীয় শক্তি-ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য জ্বালানি সংগ্রহ অত সহজ হবে না। বছর দুই-তিনের জন্যও ভবিষ্যতে পাড়ি জমাতে হলে যা খরচ হবে, সেটা চাঁদে রকেট পাঠানোর চেয়ে কম নয়। পরমাণু শক্তি ব্যবহার করতে পারলে অনেকটাই সুরাহা হবে, কিন্তু তখন ভারতীয় বিজ্ঞানী সায়ন্তনের আর প্রোজেক্টটার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

গণিতের হিসেব অনুসারে সায়ন্তন ভেবেছিল টাইম মেশিনে চড়ে প্রথমবার সে দিন-পনেরোর মতো ভবিষ্যতে পাড়ি দিতে পারবে। অর্থাৎ দু-সপ্তাহ বাদে পৃথিবীতে কী ঘটবে, তার খোঁজখবর সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু কার্যত সাতদিনের মাথায় তাকে ফিরে আসতে হয়েছে।

সায়ন্তন হতাশ হলেও আবির হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। পৃথিবীর ঘড়ির কাঁটার হিসেবে চার ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট আবিরকে একটা বন্ধ ঘরের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে। দুর্বিষহ সেই প্রতীক্ষা। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সায়ন্তন টাইম মেশিনে চড়ে সাতদিন এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সায়ন্তনের তখন কী ঘটছে, কিছুই জানতে পারেনি আবির। গহন বনে সন্ধে নামার মুখে ঝিঁঝি পোকাদের

ঐকতানের মতো ধারালো গুঞ্জন তুলে ও রঙের রামধনু ছিটিয়ে টাইম মেশিন তার যাত্রা শুরুর পূর্বে দশ-পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পরিকল্পনামতো সায়ন্তনের সঙ্গে তারপরে আর টেলিকমিউনিকেশন সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আবিরের বিজ্ঞানচেতনার অভাবকে তার জন্য দোষী সাব্যস্ত করলে ভুল করবে সায়ন্তন। প্রকৃতির এমন কিছু নির্দেশ আছে, যা আজ অবধি অমান্য করার সুযোগ পায়নি মানুষ।

সায়ন্তন একটা টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, যাত্রা শুরুর মুহূর্ত থেকেই ধারাবাহিক বিবরণ রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু ফিরে আসার পর দেখা গেল, উচ্চ বিদ্যুৎ-চৌম্বকক্ষেত্র টেপটাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

আবির বলল, 'তার মানে, ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে গেলেও তার একই হাল হত। ভবিষ্যতের কোনও ছবি বা শব্দ রেকর্ড করে আনা সম্ভব নয়।'

'এই মুহূর্তে হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু সে যাই হোক, আমার স্মৃতি ডিসটার্বড হয়নি। যা দেখেছি বা শুনেছি, সব মনে আছে।'

'তা হলে, ডিটেলগুলো ভুলে যাওয়ার আগেই তোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তটা রেকর্ড করে নেওয়া দরকার।'

টেপ রেকর্ডার ও আবিরকে সামনে বসিয়ে প্রায় নব্বই মিনিট স্মৃতিচারণা করেছে সায়ন্তন। হাওড়া ও কলকাতার চৌহদ্দির বাইরে যেতে পারেনি সায়ন্তন। এবং মাত্র সাতদিনের মধ্যে একটা শহরের ছবি কতটুকুই বা বদলায়! ভবিষ্যৎ থেকে উল্লেখ করার মতো খবর বলতে মাত্র দুটি সংগ্রহ করেছে সে। পরশু সারা কলকাতা এক ভয়াবহ যানজটে প্রায় সাত ঘণ্টা অচল হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, ছ'দিন পরে, আগামী শুক্রবার, ক্যালকাটা ল্যাম্প কোম্পানির বেকার শ্রমিক ডোমজুড়-নিবাসী রশিদ আলি লটারিতে কুড়ি লক্ষ টাকার প্রাইজ পাবে। আগামী শুক্রবার যে-আনন্দবাজার পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে সেটা দেখার সুযোগ পেয়েছে সায়ন্তন। সচিত্র প্রতিবেদন থেকে ও দেখেছে, রশিদের টিকিটের নম্বর ২০৭১৪৫।

রশিদের সংসারে আটটি মানুষ। তাদের মুখে অন্ন জোগাবার দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। দেনায় ডুবে গিয়েছিল সে। ঠিক এই সময়ে এই অভাবনীয় পুরস্কার। রশিদকে ঘিরে ক্যালকাটা ল্যাম্পের শ্রমিকদের এক করুণ বৃত্তান্ত দিয়েছেন সংবাদদাতা। কাগজের একটা কপিও হস্তগত করেছিল সায়ন্তন কিন্তু নিয়ে আসতে পারেনি। মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের কোনও বস্তুকে বর্তমানে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

টাইম মেশিনের দৌলতে সংগ্রহ করা তথ্য যাচাই করার প্রথম সুযোগ আজই পাবে ওরা। ভবিষ্যতে ভ্রমণের সময়ে অচল কলকাতার একঝলক মাত্র দেখেছিল সায়ন্তন। আজ সেই দিন। হাওড়া ব্রিজের পুব মুখে সকাল দশটা

থেকেই দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। এগারোটা নাগাদ একটা অয়েল ট্যাঙ্কারের ব্রেক ফেল করল। ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায়। একটা লরি ও ট্রামের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ছড়িয়ে পড়ল তেল। অগ্নিকাণ্ড। মুহূর্তের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড। সবাই পালাতে চায়। যানজটের সূচনা হয়ে গেছে।

'আচ্ছা সায়ন্তন, তুই যদি এই অয়েল ট্যাঙ্কারটার নাম্বার জেনে আসতিস, আর আমরা ওটাকে আজ ডিপো থেকে বেরোতে না দিতাম, তা হলে কী হত বলতে পারিস ?'

'কঠিন প্রশ্ন।'

'কিন্তু প্রশ্নটা ভাইটাল। ভবিষ্যৎ দুনিয়া থেকে খবর সংগ্রহ করে বর্তমানকে বদলে দেওয়া যায় কিনা, বা তার ফল কী হতে পারে—ভেবে দেখা দরকার।'

সায়ন্তনের ঘরে পা রেখেই থমকে দাঁড়াল আবির : 'এ কী !' ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সায়ন্তন লক্ষ করল টেপ রেকর্ডারটা মুখ হাঁ করে রয়েছে। এবং ক্যাসেটটা উধাও—যে-ক্যাসেটে সায়ন্তন তার অভিজ্ঞতা রেকর্ড করেছিল। দুজনেই একসঙ্গে ছুটে গেল পাশের ঘরে। না, টাইম মেশিন চুরি হয়নি। মিনিট দশ-বারো অনুসন্ধানের পর এখন বোঝা যাচ্ছে ক্যাসেট ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায়নি।

ক্যাসেট-চোরকে ধরার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগের দরকার হবে না। এটা সুনীল সেন ছাড়া আর কারও কীর্তি নয়। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিক সুনীল। নিজে-হাতে কাজ করে, জটিল যন্ত্রাংশ নির্মাণে খুবই দক্ষ। সুনীলের কারখানা থেকে টাইম মেশিনের কয়েকটা পার্টস তৈরি করা হয়েছিল। ফিটিংয়ের সময় কিছু অসুবিধে দেখা দেয়, তাই সুনীলকে কয়েকবার বাড়িতেও ডাকতে হয়েছে। তখনও টাইম মেশিন পুরোপুরি তৈরি হয়নি, তা সত্ত্বেও তার চেহারা দেখে সুনীল অবাক হয়েছিল। বারবার প্রশ্ন করেছে, জানতে চেয়েছে যে, এই মেশিনটা কী কাজে লাগবে। থিয়োরিটিক্যাল পদার্থবিদ্যার দোহাই দিয়ে সুনীলের কৌতূহলকে যে মেটানো যায়নি, আজ তার প্রমাণ মিলেছে।

সায়ন্তন বলল, 'ক্যাসেটটা হাতিয়েও কোনও লাভ হবে না সুনীলের। টাইম মেশিন তৈরির কোনও হদিস পাবে না।'

'টাইম মেশিন তৈরি করার চেষ্টা করবে না সুনীল। সে চাইবে লটারির টিকিটটা। যাতে রশিদের জায়গায় ওই কুড়ি লক্ষ টাকার পুরস্কারটা তার পকেটে আসে।'

সায়ন্তনের সুরে হতাশা, 'তা হলে, টাইম মেশিন তৈরি করার সুবাদে আমরা প্রাইজটা একটি দুস্থ মানুষের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সুনীলের হাতে তুলে দিলাম।'

'এখনই সে-কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। দেখাই যাক।'

ক্যালকাটা ল্যাম্পে আবিরই টেনে আনল সায়ন্তনকে। শুধু ডোমজুড় বললে তো হবে না, বাড়ির ঠিকানাটা চাই। কারখানার গেটে তালা, কিন্তু উলটো দিকেই শ্রমিক পঞ্চায়েতের অফিস। রশিদের নাম শুনেই বয়স্ক ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকালেন : 'হল কী বলুন তো, হঠাৎ জনে-জনে রশিদের খোঁজখবর শুরু করল কেন ? এই তো কালই এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। ঠিক আপনাদের মতোই...'

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে আবির বলল, 'ওহ্ হো, এসেছিল তাহলে ! আমরাই পাঠিয়েছিলাম। দেখুন তো, খবরটা নিয়ে গেল অথচ জানাল না। শুধু-শুধু আমাদের দৌড় করাল।

এর পর ভদ্রলোক আর রশিদের ঠিকানা দিতে দ্বিধা করেননি।

★

পরের দিন। সকাল সাড়ে ন'টায় ডোমজুড়ের বাস ধরেছে ওরা। রশিদের বাড়ি খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয়নি। থানার দু-স্টপ আগে বাসরাস্তা থেকে হাঁটাপথে মিনিটদশেক। একটা খোলা উঠোন ঘিরে ছ'-সাত ঘর মানুষের বাস। বাচ্চাদের ফৌজ তাদের রশিদের দরজা চিনিয়ে দিয়েছে। ইট বিছানো দাওয়ায় বসে রশিদের বউ ও দুই মেয়ে ঠোঙা তৈরি করছে। খালি গায়ে বেরিয়ে এল রশিদ। শরীরটা এককালে মজবুত ছিল। হাড়ের খাঁচাটা তার সাক্ষী।

নমস্কারের পর আর এগোতে দেয়নি রশিদ : 'আপনারাও আবার লটারির টিকিট গছাতে এসেছেন নাকি ? কী ব্যাপার বলুন তো ! কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না। কবে এক-আধবার লটারির টিকিট কেটেছি আর আমার কাছেই যত...কাল একজন...আজ আপনারা। তাও আবার অষ্টগণ্ডা প্রশ্ন। টিকিট কাটলে কোত্থেকে কাটি, কোন লটারি পছন্দ করি !'

রশিদের বউ মাথা না তুলেই বলল, 'চাকরি থাকতে তাও একরকম। এখন দু-তিন টাকাও অমন জলে ঢালা পোষাবে না।'

গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল, রশিদ টিকিট কাটলে বউকে লুকিয়েই কাটবে।

রশিদ যতই রাগ করুক, আসল কথাটা বার করে নেওয়া গেছে। যার খোঁজে সুনীলও কাল হানা দিয়েছিল। ডোমজুড় বাজারের কাছে 'লক্ষ্মী লটারি সেন্টার' থেকে টিকিট কাটে রশিদ।

লক্ষ্মী লটারি সেন্টার থেকে জানা গেল গতকালই এই কাউন্টার থেকে ২০৭১৪৫ নম্বর টিকিট বিক্রি হয়েছে। খরিদ্দার নিজে বেছে নিয়েছিল টিকিটটা। টিকিট বইয়েও দেখা গেল ওই নম্বরের আগে ও পরে অনেক টিকিট এখনও বিক্রি হয়নি।

সুনীল পুরোপুরি গা-ঢাকা দিয়েছে। বাড়িতেও বলে যায়নি কোথায় যাচ্ছে।

দিনকয়েক বাদে ফিরবে, এছাড়া কেউ কিছু বলতে পারেনি। মনে হচ্ছে পুরস্কারের টাকা পকেটে না ভরে আর মুখ দেখাবে না।

সায়ন্তন বলল, 'টিকিট যখন হাতিয়েছে, প্রাইজও পাচ্ছে।'

আবির তবু হাল ছাড়েনি। রোজ সকালে একবার সুনীলের কারখানায় যায় খবর নিতে। পুরস্কার ঘোষণার আর একদিন বাকি যখন, সকাল সাড়ে দশটায় সুনীলের কারখানার কারিগরদের কাছ থেকে সুনীলের দুর্ঘটনার খবর শুনল আবির। দু-দিন সে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে কাটিয়েছে। বড়গাছিয়ার কাছে বাস-রাস্তার ধারে তাকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে ফেলে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় অধিবাসীরা পরের দিন সকালে তাকে অচৈতন্য অবস্থাতেই হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। পকেটে কোনও পরিচয়মূলক কাগজপত্র ছিল না, তাই বাড়িতেও খবর দেওয়া যায়নি। জ্ঞান ফেরার পর সুনীল নাম-ঠিকানা জানিয়েছে। প্রাণের ভয় আর নেই, কিন্তু আংশিকভাবে স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা একটুও মনে নেই। বারবার শুধু একই কথা বলছে, বড়গাছিয়ায় গিয়েছিল সস্তায় উড স্ক্রু কিনতে।

সায়ন্তনকে নিয়ে সুনীলের বাড়িতে হাজির হল আবির। ডাক্তারের কাছ থেকে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহ করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। ওদের চিনতেই পারছে না সুনীল। রশিদ, ক্যালকাটা ল্যাম্প বা লক্ষ্মী লটারির নাম করে নানাভাবে ওরা চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই অধ্যায়টা পুরোপুরি বিস্মৃত সুনীল।

ফেরার আগে ওরা বাড়ির লোকেদের মুখে শুনল, পুলিশের সন্দেহ সুনীল ডাকাতদের হাতে পড়েছিল। মানিব্যাগ, ঘড়ি, আংটি—সব খোয়া গেছে।

পরদিন সাত-সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সায়ন্তনের। কখন খবরের কাগজ দিয়ে যাবে তার জন্য ধৈর্য ধরতে পারেনি। কাগজের গাড়ি আসে বাজারের কাছে। সেখান থেকেই কিনে এনেছে আনন্দবাজার। প্রায় ছুটে বাড়ি চলে এসেছে সায়ন্তন। কাগজে চোখ গুঁজেই ও নিঃসন্দেহ যে, টাইম মেশিন অব্যর্থ। ঠিক এই ছবি আর সংবাদই ও দেখেছিল ভবিষ্যৎ ভ্রমণের সময়ে। বলা বাহুল্য, রশিদই শেষপর্যন্ত পুরস্কার পেয়েছে, আর তার টিকিটের নম্বর ২০৭১৪৫। সায়ন্তন অবশ্য এত খুঁটিয়ে খবরটা তখন পড়েনি। আর পড়লেও শেষ পরিচ্ছেদের এই রসিকতার মর্ম তখন ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব হত না।

সংবাদদাতা লিখছেন, 'প্রাইজ পাওয়ার পরেও লাখপতি রশিদ কিন্তু তার স্ত্রীকে এখনও আগের মতোই ভয় পান। রশিদ আলির বিবি লটারির টিকিট কেটে পয়সা নষ্ট করা পছন্দ করেন না। রশিদ পুরস্কার পাওয়ার পরেও তিনি তাঁর অভিমতে অচল। ফলে রশিদও কিছুতেই কবুল করতে রাজি নন যে, স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি টিকিট কেটেছিলেন। শুনতে হাস্যকর মনে হলেও, রশিদ বারবার বলেছেন, টিকিটটা তিনি ক'দিন আগে বাসরাস্তার ধারে কুড়িয়ে পান।'

টেলিফোন বেজে উঠল। জানা কথা, আবির। উত্তেজনায় সায়ন্তনের কথা

গুলিয়ে যাচ্ছে, 'হয়েছে, হয়েছে। যা ভেবেছি। টাইম মেশিনের মার নেই। সব সত্যি। বল—'

প্রশান্ত স্বরে আবির বলল, 'তোর বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। ওয়েল্‌সের পাণ্ডুলিপিটা যদি পুরো হজম করে দিস, তাহলে হয়তো নোবেল প্রাইজও পেয়ে যাবি। কিন্তু আমার চিন্তা ইতিহাস নিয়ে।'

'তার মানে ?'

'মানে অতি সরল। এটা ধরেই নিচ্ছি যে, সুনীল বড়গাছিয়ায় আক্রান্ত হয়। টাকা-পয়সার অতিরিক্ত কিছু কাগজপত্রও হস্তগত করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেগুলো আবর্জনা ভেবেই তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় পালাবার সময়ে। তার মধ্যে নিশ্চয় লটারির টিকিটটাও ছিল। এবং সেটা ইতিহাসের নির্দেশ অনুসারেই ডোমজুড়ের কাছে রশিদ আলির চলতি পথে পরিত্যক্ত হয়।'

'বেশ তো ! তাতেই বা হলটা কী ?'

'যা হওয়ার তাই হল— শুধু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণত তার লিখিত বা নথিভুক্ত বিবরণের কথা ধরি। সেটাকেই ইতিহাসের মূল স্রোত বলা হয়। সেই ইতিহাস হয়তো পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু...'

'প্লিজ, আর-একটু স্পষ্ট করে...'

'স্পষ্ট ! স্পষ্ট ! নিরেট মূর্খ ! তবে শোন। আমার একটাই প্রশ্ন। তুই যদি টাইম মেশিনে না চড়তিস, তা হলেও কি সুনীল সেনকে মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি খেতে হত ?'

ছবি : অনুপ রায়

বাতিক

অমিত চক্রবর্তী



দেওয়াল-ঘড়িতে স্প্রিং-এর কড়কড় আওয়াজ হতেই বিশ্বপতি কলমটাকে টেবিলের খাঁজে শুইয়ে মনে-মনে ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে শুরু করলেন। পরপর সাতবার আওয়াজ হতেই ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং দেখে নিশ্চিত হলেন যে, তাঁর হিসেবে কোনও ভুলচুক হয়নি। এখন সন্ধে ঠিক সাতটা—রাত আটটা কিংবা সন্ধে ছ'টা নয়।

মাথার ওপর দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন বিশ্বপতি। এটা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। তারপর টেবিলের ড্রয়ারে চাবি দিলেন এবং পর-পর দুবার কলিংবেলটা টিপলেন। ফাঁকা অফিসে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার আওয়াজে বিশ্বপতির শরীরের ভেতরটা যেন ঝনঝন করে উঠল। রোজই এমনটা হয় এবং এই ঝনঝনানি শরীরের ভেতরের স্নায়ুগুলোকে কেমন টান-টান করে দেয়। হয়তো এই জন্যই প্রত্যেকদিন সন্ধে সাতটায় পর-পর দুবার কলিংবেলটা টিপে থাকেন বিশ্বপতি।

ঘণ্টার আওয়াজ হতেই অফিসের বেয়ারা-কাম-দরোয়ান রঘু ঘরে ঢুকে জানলাগুলো বন্ধ করে, একটা-একটা করে আলো-পাখার সুইচগুলো নেভায়। বিশ্বপতি সেই ফাঁকে চেয়ারে ঝোলানো তোয়ালেটা দিয়ে মুখ মুছে ব্যাগটা হাতে নিয়ে অফিসের বাইরে সিঁড়ির কাছটায় এসে দাঁড়ান। অফিস বলতে পেল্লায় এক হলঘর, তার এক কোণে গুটিতিনেক কেবিন, যার সবচেয়ে ছোটটা পড়েছে বিশ্বপতির বরাদ্দে। রঘুও বাইরে বেরিয়ে এসে সদর দরজায় তালা লাগাতে শুরু করে। সবক'টা তালায় চাবি পড়তেই বিশ্বপতি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন এবং ঠিক এগারোটা ধাপ নীচে নামার পরেই ঘুরে দাঁড়ান। তারপর আবার হনহন করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দরজার তালাগুলো টেনে দেখেন সেগুলো ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কি না। এটাও বিশ্বপতির বহুদিনের অভ্যেস।

কিছুদিন হল, লালবাজার থানার মেন গেটের ঠিক উলটো ফুটপাতে রেলিঙের ধারে এক শনিঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে। কাচের বাক্সের ভেতরে

থাকেন তিনি। পুণ্যার্থীরা যাতে পয়সা-কড়ি দিতে পারে সেজন্য শনিঠাকুরের মাথার কাছে কাচের বাক্সের ওপর চৌকোনা গর্ত কাটা। ভেতরে টাকা-কড়ি কেমন জমা হল বাইরে থেকে তা জানার ভারি সুন্দর ব্যবস্থা। প্রতিদিনের মতো আজও শনির মূর্তির সামনে দাঁড়ালেন বিশ্বপতি। ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও তিনি বলে দিতে পারেন এখনকার সময়টা সাতটা সতেরো। ডালহৌসি থেকে মিনিবাস যদি সাড়ে সাতটার মধ্যে ছাড়ে, তবে বাড়ি পৌঁছতে-পৌঁছতে পৌনে ন'টা। বিশ্বপতি হাঁটার গতি বাড়ালেন।

বিপত্তিটা বাঁধল জগুবাবুর বাজারের ঠিক মুখটায়। বিকট আওয়াজ করে দক্ষিণগামী মিনিবাসের সামনের বাঁদিকের চাকাটা ফাটল। অ্যাদ্দিন ধরে যাতায়াত করছেন, বিশ্বপতির মনে পড়ে না আগে কখনও চাকা পালটানোর জন্য বাস থেকে নেমে দাঁড়াতে হয়েছে কি না। আজকের ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে। বাসটা ছাড়তে অহেতুক দেরি করল। অন্যদিন মিনিবাসে দাঁড়াতে হলেও পার্ক স্ট্রিটের আগেই বসার সিট পেয়ে যান। আজ কিন্তু আশপাশের কোনও যাত্রীরই ওঠার লক্ষণ দেখা যায়নি। তার ওপর কন্ডাক্টরের কাছ থেকে টিকিট কাটতে গিয়ে মানিব্যাগের ভেতর কুড়ি টাকার একটা নোটের মাঝ বরাবর সেলোফেনের তাপ্পি ধরা পড়েছে এবং এক উটকো সহযাত্রীর কল্যাণে দুশো তিরিশ টাকা দামের নতুন জুতো কাদায় ছয়লাপ হয়েছে। সেগুলো তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিনিবাসের টায়ার পালটানো দেখার মতো বিড়ম্বনা আর সয় না। বিশ্বপতি ঘড়ি দেখেন—নয়-নয় করে প্রায় মিনিট পঁচিশেক সময় নষ্ট হল। রাত ন'টার খবরটা আজ আর শোনা হবে না। বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে আসে ওঁর।

বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগে মিনিট-সাতেকের মতো। গোটা রাস্তাটা অন্ধকার। লোডশেডিং চলছে। বাড়ি পৌঁছে দরজায় টোকা দেওয়ার সময় বাঁ-হাতের কব্জি উলটে ঘড়ি দেখলেন। আবছা আলোয় মনে হল ঘড়ির ছোট কাঁটাটা দশটার কাছাকাছি এসেছে। স্ত্রী সুরমা দরজা খুলতেই বললেন, 'না দেখে দরজা খোলো কেন ? কে কড়া নাড়ছে, ভেতর থেকে সেটা জানতে চাওয়া যায় না ? কোনদিন একটা কাণ্ড হবে !'

সুরমা জবাব না দিয়ে দরজার পাশে সরে দাঁড়ালেন। একান্ত নিরুপায় না হলে কোনও ব্যাপারেই বাদবিতণ্ডার মধ্যে যান না তিনি। তাছাড়া বিশ্বপতিকে তো আর নতুন দেখছেন না। দেখতে-দেখতে পনেরোটা বছর একসঙ্গে কাটল। এমনিতে মানুষটা বদরাগী নন। দোষের বলতে, যা একটু খেয়ালী। সময়মতো বাড়ি ফিরতে না পারার দরুনই যে মেজাজটা আজ এমন তিরিক্ষে, তা আঁচ করতে অসুবিধে হয় না সুরমার।

'এত রাতে কি আর চা খাবে ?' বিশ্বপতির দিকে তোয়ালে আর ধুতিটা এগিয়ে দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন সুরমা।

'তার মানে ?' ভুরু কুঁচকে তাকান বিশ্বপতি।

সুরমা রান্নাঘরের দিকে এগোলেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করাটাই ভুল হয়েছে। রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে গা ধুয়ে চা খেতে-খেতে ইংরেজি খবর শোনার অভ্যেস বিশ্বপতির। খবরটা আজ শোনা না হলেও চা খাওয়ার ব্যাপারে যে ব্যতিক্রম ঘটবে না সেটা বোঝা উচিত ছিল সুরমার। চায়ের পাট না চুকলে রাতের খাবার খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

'জানো, তোমার এক বন্ধু এসেছিল আজ।' এঁটো বাসনগুলো টেবিল থেকে তুলতে-তুলতে বললেন সুরমা, 'তোমার সঙ্গে নাকি স্কুলে পড়ত, বিলেতে ছিল অনেকদিন। নাম বলল, "সমীরণ"।'

টেবিল-ঘড়িটায় দম দিচ্ছিলেন বিশ্বপতি। রাতের খাওয়ার পর বাড়ির যাবতীয় ঘড়িতে দম দেওয়াটাই ওঁর কাজ।

'সমীরণ এসেছিল? অ্যাদ্দিন পরেও আমাদের বাড়ি চিনতে পারল!' বিশ্বপতির চোখেমুখে বিস্ময়: 'স্কুলে পড়ার সময় এ-বাড়িতে মাঝে-মাঝে আসত, এ-পাড়ারই একটা বাড়িতে ভাড়া থাকত ওর মামা। স্কুলের পাট শেষ হতে ডাক্তারি পড়তে গেল। ডাক্তার হয়ে বেরনোর পরও বারকয়েক এখানে এসেছে। তারপর ওর মামাও এ-পাড়া ছেড়ে উঠে গেল, ওরও আসা-যাওয়া বন্ধ। পরে শুনেছিলাম, ও নাকি বিলেত গিয়ে মস্ত ডাক্তার হয়েছে।'

'দেখেও তো তাই মনে হল।' ভিজে ন্যাতা দিয়ে টেবিলটা মুছতে-মুছতে বললেন সুরমা, 'গায়ের রঙ টকটকে ফরসা, এক্কেবারে সাহেবদের মতন! যে-গাড়িটায় চেপে এসেছিল সেটা একেবারে ঝকঝকে নতুন।'

'ঠিকানা কিছু দিয়ে গেছে?'

'উঁহু।' সুরমা মাথা নাড়েন: 'তবে তোমার অফিসের ঠিকানাটা লিখে নিল নোটবইতে। দু-চারদিনের মধ্যেই হয়তো অফিসে দেখা করবে।'

'ও আচ্ছা—' বলেই সদর দরজার দিকে এগোলেন বিশ্বপতি। প্রতিদিন শুতে যাওয়ার আগে সদর দরজার হাতল ধরে পর-পর তিনবার টান দিয়ে থাকেন তিনি। দরজার ছিটকিনি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বারবার হাতল ধরে টানাটানির যৌক্তিকতা আজও বুঝে উঠতে পারেননি সুরমা।

দরজায় টোকা পড়তেই ফাইল থেকে চোখ তুললেন বিশ্বপতি। সামনে যে-সুদর্শন মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মুখের মধ্যে অনেকদিন আগের এক চেনা মুখের আদল পাচ্ছেন যেন। আগন্তুক হাসিমুখে বিশ্বপতির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমায় চিনতে পারলি না? আমি সমীরণ। সেদিন তোর বাড়ি গেলাম, তোর মিসেসের সঙ্গে গল্পগুজব করলাম, চা আর পাঁপড়-ভাজা খেলাম—'

বিশ্বপতির চোখে খানিকটা সমীহ, খানিকটা বিস্ময়। কী বলবেন, বুঝতে পারেন না।



সামনে যে-সুদর্শন মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মুখের মধ্যে অনেকদিন আগের এক চেনা মুখের আদল পাচ্ছেন যেন।

টেবিলের উলটোদিকের কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েন সমীরণ। বলেন, 'কথা বলছিস না যে ! কী ব্যাপার, ব্যস্ততার সময় এসে বিরক্ত করলাম নাকি ?'

'না, না, ভাবছিলাম অ্যাদ্দিন পরে তুই হঠাৎ !' খানিকটা ঘোরের মধ্যে থেকে বলে ওঠেন বিশ্বপতি। তারপর বেল বাজিয়ে রঘুকে ডেকে চা আনার পয়সা দেন।

চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সমীরণ বলেন, 'সতেরো বছর কাটালাম বিলেতে, বুঝলি ? প্র্যাকটিসও নেহাত মন্দ হচ্ছিল না, তা ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম, যাই দেশে ফিরে। এখানকার এক হাসপাতাল থেকে অফার পেয়েছিলাম, তাছাড়া প্রাইভেট প্র্যাকটিস তো আছেই। তোর বাড়ির কাছে বড় রাস্তার ওপর একটা ঘর পেলাম, ওখানেই চেম্বার বানিয়েছি—'

'কিসের ডাক্তার তুই ? হার্ট ?' প্রশ্নটা যেন ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে বিশ্বপতির।

'কেন, তোর কি হার্টের গণ্ডগোল আছে নাকি ?'

'না, না, এমনই জিজ্ঞেস করলাম। আসলে হার্টের ডাক্তারদের খুব রমরমা কিনা—'

বিশ্বপতির কথায় মুখ টিপে হাসেন সমীরণ, বলেন, 'এখন তো স্পেশালিস্টদের যুগ রে ! চোখ-কান-গলা-পেট-এমনকি মনের রোগ—যার চিকিৎসাই করো না কেন, রুগীর ভিড় লেগে থাকবেই !'

'মনের রোগ ?' বিশ্বপতি টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠেন, 'মনের রোগ কি সত্যিই সারে, ভাই ?'

'সব না সারলেও, কিছু-কিছু রোগ নিশ্চয়ই সারে।' রঘুর রেখে যাওয়া চায়ের কাপটা কাছে টেনে নেন সমীরণ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেন, 'তুই খাবি না ?'

'না। আমি চা খাব ঠিক আড়াইটেয়।' বিশ্বপতি জবাব দেন, 'তুই কিসের স্পেশালিস্ট, বললি না তো।'

'নিউরো-সার্জারি।' তিন-চার চুমুকে চা-টা শেষ করে কাপটাকে দূরে সরিয়ে রাখেন সমীরণ : 'মাথার অসুখের চিকিৎসা করি বলতে পারিস। এই ধর, মস্তিষ্ক আর শিরদাঁড়া—মানে, সব মিলিয়ে যাকে বলে 'সেন্ট্রাল নার্ভস সিস্টেম'—সেখানে কোনও গণ্ডগোল হলে তা সারানোর ব্যবস্থা করি আমি। তোর বাড়ির কাছে চেম্বার খোলার পর ভাবলাম ওদিকটায় তো এক তোকে ছাড়া কাউকেই তেমন চিনি না। তোর মারফত আশপাশের লোকজনের সঙ্গে যাতে আলাপ-পরিচয় হয় সেজন্যেই তোর বাড়িতে গেছিলাম সেদিন। তোর মিসেসের কাছে শুনলাম, রোজই নাকি ফিরতে তোর ন'টা সাড়ে ন'টা বাজে...'

সমীরণের কথাগুলো আর কানে যাচ্ছিল না বিশ্বপতির। তাঁর মাথার মধ্যে

ঘুরছিল 'নিউরো-সার্জারি' আর 'সেন্ট্রাল নার্ভস সিস্টেম' শব্দ দুটো। সমীরণ থামতেই ফিসফিস করে বললেন, 'তোকে আমার খুব দরকার। শিগ্‌গিরই যাব তোর চেম্বারে। অসুবিধে হবে না তো ?'

'অসুবিধে আবার কী ? বিকেল আর সন্ধেটা তো বলতে গেলে মাছি তাড়াই। তুই এলে অন্তত গল্পগুজব তো করা যাবে।' সমীরণ উঠে দাঁড়ান। তারপর দরজার দিকে এগোতে-এগোতে বলেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল। বাসস্ট্যান্ডের উলটোদিকে ওষুধের দোকানের রাইট-হ্যান্ড-সাইডে আমার চেম্বার। বাইরে নেমপ্লেট আছে।'

উদাস চোখে সমীরণের চলে যাওয়া দেখেন বিশ্বপতি। রঘু এসে এঁটো কাপটা সরিয়ে নিয়ে যায়। টেবিলের ওপর গোল চাকার মতো জলছাপ। প্লেটের নীচে জল লেগে ছিল নিশ্চয়ই। রঘুকে কতবার বলেছেন সবসময় রবারের চাকতির ওপর কাপ-প্লেট রাখতে। ভুরু কুঁচকে ড্রয়ার থেকে একফালি সাদা কাপড় বার করলেন বিশ্বপতি। টেবিল থেকে সযত্নে জলের দাগ তুলতে-তুলতে কব্জি উলটে একবার ঘড়ি দেখলেন। একটা বেজে চল্লিশ। টেবিলের ওপর একগাদা ফাইল। ঠিক সাতটায় উঠতে হবে। এর মধ্যে টিফিন করতে খরচ হবে কুড়ি মিনিট। বড়সাহেবের ঘরে যদি বারদুয়েক ডাক পড়ে, তবে আরও কুড়ি মিনিটের ধাক্কা। তাহলে, হাতের কাজগুলো শেষ করার জন্য কতক্ষণ সময় থাকবে ? মনে-মনে সেই হিসেবটা করতে থাকেন তিনি।

'হ্যাঁ, এবারে খুলে বল দেখি, তোর অসুখটা কী ?'

গদি-মোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে সমীরণের চেম্বারের দেওয়াল আর আসবাবপত্র খুঁটিয়ে দেখছিলেন বিশ্বপতি। বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতে আজ অফিস থেকে বেরিয়েছেন। তার জন্য অবশ্য রঘুর কৃতিত্ব অনেকখানি। বেলা দুটো থেকে সে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে গেছে। অফিসে বেরোনোর সময় সুরমাও ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে। অফিস থেকে বেরোনোর সময় রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছিল বিশ্বপতির। রঘুকে ডেকে বলেছেন, 'ছুটির পর দরজার তালাগুলো ঠিকমত লাগাস। রাত্তিরটা বড় চিন্তায় কাটবে।'

'এত ভাবছিস কী ? তোর প্রবলেমটা বল।'

সমীরণের দিকে চোখ ফিরিয়ে বিশ্বপতি নিচু গলায় বলেন, 'সময় ধরে সবকিছু করাটাই আমার একটা রোগ। সুরমা বলে, মনের বাতিক !'

'একটু খুলে বল।' সমীরণ টেবিলের ওপর ঝুঁকে আসেন।

'এই যেমন ধর, সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা, ঠিক ছ'টায় চা-খাওয়া, তারপর ছ'টা কুড়িতে দাড়ি কামানো, ছ'টা চল্লিশে খবরের কাগজ পড়া, সাতটায় বাজারে যাওয়া—'

'তার মানে, তুই সবকিছু একেবারে ঘড়ি ধরে করিস, এই তো ?'

'করি, মানে করতে হয়।' বিষণ্ণ গলায় বলে ওঠেন বিশ্বপতি, 'সারাদিন সমস্ত কাজ ঘড়ি ধরে করা কি চাট্টিখানি কথা! কিন্তু উপায় নেই। যখনকার যা কাজ তা ঠিক সময়ে করতে না পারলে কী যে কষ্ট হয়! ধর, সকালে কাগজ এল দেরিতে। তো সেদিন আর কাগজ পড়াই হবে না। কিংবা রাস্তায় হয়তো জ্যামে পড়ে অফিসে পৌঁছতে দশ মিনিট দেরি হল—অমনই বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। আবার টেবিলের কাজ হয়তো শেষ হয়ে গেছে, তবুও সাতটার ঘণ্টা না বাজলে অফিস থেকে বেরোতে পা সরে না। মনে হয়—যদি অফিস থেকে আগে বেরিয়ে পড়ি, অমঙ্গল কিছু ঘটে যাবে নির্ঘাত। বিরাট কোনও ক্ষতি হয়ে যাবে আমার...'

'রোববার আর ছুটির দিন কী করিস?'

'রোববারেরও কাজের রুটিন আছে। দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে রেডিও শুনি, বিকেল চারটেয় বেড়াতে বেরোই—তা সে ঝড়বৃষ্টি যাই হোক না কেন। এদিকে সুরমার হয়েছে জ্বালা। তুই তো দেখেছিস ওকে। বড় শান্ত মেয়ে। আমার বাতিক সামলাতে-সামলাতেই ওর জীবনটা শেষ হয়ে গেল।'

'ডাক্তার দেখাসনি কখনও? কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'দেখিয়েছিলাম। আমার পাশের বাড়ির এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সুরমা নিয়ে গিয়েছিল আমায়। ডাক্তার তো প্রথমটা আমার কথায় তেমন আমলই দিলেন না। বললেন, "ওরকম বাতিক মশাই সকলেরই একটু-আধটু থাকে। রবার্ট ব্রুস-এর গল্পটা তো জানেন। পর-পর সাতবার যুদ্ধে হেরে গিয়েও আবার লড়েছেন। শুনেছি কলম্বাস নাকি ভারতে আসার টাকা জোগাড়ের জন্যে আঠেরো বছর ধরে একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই যে অধ্যবসায়—এও কি এক ধরনের বাতিক নয়?"

'শেষে ওঁর মতটা মানছি না দেখে বললেন, অতিরিক্ত উদ্বেগের জন্যেই নাকি অমনটা করি আমি। আমার অবচেতন মনে নাকি ধারণা আছে—জীবনে যা কিছু আমি পেয়েছি, আমার চাকরি, সংসার—সবই ক্ষণিকের ব্যাপার। সবকিছু হারানোর ভয়েই আমি নাকি নিজেই নিজের চারপাশে সময়ানুবর্তিতার এক বর্ম গড়ে নিয়েছি। ভদ্রলোক আমাকে ঘুমের ওষুধ-টষুধ খেতে দিয়েছিলেন—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আচ্ছা সত্যি করে বল তো—মানসিক রোগ কি সারে?'

বিশ্বপতির চোখের কোণটা চিকচিক করছিল। সেদিকে চেয়ে সমীরণ বললেন, 'এ-প্রশ্নের উত্তর তো সেদিন তোর অফিসেই দিয়েছি। কিন্তু তোরটা মানসিক রোগ না-ও হতে পারে। যদি বলি, এইসব উপসর্গের পিছনে তোর ব্রেনের কারসাজি আছে—বিশ্বাস করবি?'

কী জবাব দেবেন, বুঝতে পারেন না বিশ্বপতি। সমীরণ যেন ব্যাপারটা আঁচ করেন। বলেন, 'তোকে একটা ঘটনার কথা বলি। সত্যি ঘটনা। এটা ঘটেছিল এখন থেকে বছরখানেক আছে—কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। জর্জ নামে এক ছোকরার ছিল নানারকমের বাতিক। মাত্র সতেরো-আঠেরো বছর বয়েস

হলে কী হবে—পড়াশুনো, খেলাধুলো, আড্ডা এসবের ধার দিয়ে হাঁটত না। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার নিজের হাত দুখানা কচলে ধুতো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝরাস্তা থেকে ফিরে আসত রোজ—ঘরে তালা দেওয়া হয়েছে কিনা দেখতে। বারবার পকেট হাতড়ে দেখত মানিব্যাগটা রয়েছে কিনা। তোর মতো ওই ছেলেটিরও মনে হত—অদৃশ্য কেউ যেন তাকে দিয়ে জোর করে সব করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের ভাষায় রোগটার নাম—"অবসেসিভ কমপালসিভ নিউরোসিস"। ছেলেটি ছিল অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। ওর ওই অভিশপ্ত জীবন রেখে আর লাভ নেই—এরকম কিছু একটা ভেবে, ছোকরা একদিন বাপের পিস্তলখানা বাগিয়ে নিজেই নিজের কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালাল। ছোঁড়ার সময় নিশানার ভুলে গুলিটা গিয়ে বিঁধল মস্তিষ্কের বাঁদিকের "ফ্রন্টাল লোব" নামে একটা জায়গায়। ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়া হয় নামজাদা এক নিউরোসার্জনের কাছে।—ছুরি চালিয়ে ফ্রন্টাল লোব থেকে বুলেটটা বার করা হল। আর তাতেই ঘটল অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড!'

'কিসের কাণ্ড?'

'অপারেশানের পর ছেলেটা সুস্থ হতে দেখা গেল, তার মন থেকে যাবতীয় বাতিক উধাও! একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল সে। ঘটনাটা বিশেষজ্ঞ মহলে চাউর হতেই একেবারে হইহই পড়ে গেল। একদল বললেন, তাঁরা নাকি নিশ্চিত যে, মস্তিষ্কের ভেতর "ব্যাসাল-গ্যাংলিয়া" নামে নার্ভগুচ্ছ ঠিকমতো কাজ না করলে লোকের মধ্যে নানারকম বাতিক দেখা দেয়। ওই নার্ভগুলোকে সক্রিয় করে তোলার জন্যে তাঁরা "ক্লোমিপ্রামাইন" নামে একধরনের ওষুধও বার করলেন। আসলে ওঁরা ছিলেন অপারেশানের বিরুদ্ধে...'

ওষুধের নামটা খটোমটো ঠেকলেও ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হল না বিশ্বপতির। সমীরণ থামতেই উত্তেজিত গলায় বললেন, 'তা, সেই ওষুধে কাজ হল?'

'উঁহু।' ধীরে-ধীরে দু-পাশে মাথা নাড়েন সমীরণ: 'হাজার রুগীর ওপর এ-ওষুধটা প্রয়োগ করে মাত্র চারশো জনের ক্ষেত্রে সামান্য সুফল মিললেও বাকিদের বেলায় কোনও কাজই হয়নি। বলতে গেলে...'

'তাহলে কি অপারেশান ছাড়া গতি নেই?' ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করেন বিশ্বপতি, 'মাথার ভেতরে কাটা-ছেঁড়া করায় রিস্কও তো আছে?'

'তা তো আছেই।' সমীরণ জবাব দেন, 'ইতিমধ্যে আরও যেসব রুগীর ওপর অপারেশান হয়েছে তাদের কারও-কারও ডান হাত-পায়ে জড়তা এসেছে—অনেকটা প্যারালিসিসের মতন। কয়েক মাসের মধ্যেই ওইসব উপসর্গ অবশ্য কেটে যাওয়ার কথা—'

'তাহলে, আমাকেও কি অপারেশান করতে বলিস?' ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে বিশ্বপতির: 'আমারও যদি প্যারালিসিস হয়, যদি কোনওদিন আর না সারে?'

'এখনই এসব নিয়ে ভাবছিস কেন ?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সমীরণ : 'আগে তোর ব্রেনটা স্ক্যান করাই, হাসপাতালে খোঁজখবর নিয়ে দেখি এ-জাতীয় অপারেশানের সুযোগ-সুবিধে মিলবে কি না। তারপর তো ডিসিশানের পালা। অপারেশানের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তখন নিস না হয়।'

সমীরণের চেম্বার থেকে বেরিয়ে ওপরের দিকে তাকালেন বিশ্বপতি। আবছা লাল মেঘে ছেয়ে আছে আকাশটা। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না। বাড়ির পথে হাঁটতে-হাঁটতে বিশ্বপতির মাথায় 'ব্যাসাল গ্যাংলিয়া' আর 'ফ্রন্টাল লোব' শব্দ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছিল। বাড়িতে গিয়ে সুরমার কাছে অপারেশানের কথাটা কীভবে পাড়বেন তাই ভাবতে-ভাবতে বিশ্বপতির মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল।

ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। অফিস-ঘরের জানলাগুলো টেনে বন্ধ করতে গিয়ে রঘু দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাল। পাঁচটা বেজে দশ। এর মধ্যেই গোটা অফিসটা ফাঁকা! অথচ ছ'মাস আগেও ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। পাঁচটার সময় ফোন বেজে যাবে, কেউ ধরার থাকবে না—এটা ভাবাই যেত না। বড়বাবু থাকতেন ঠিক সাতটা অবধি। টেবিলের সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে তবেই উঠতেন। কী যেন একটা অপারেশান করাতে হাসপাতালে নাকি ভরতি হয়েছিলেন। মাসতিনেক পর যখন অফিসে ফিরলেন, একেবারে অন্য মানুষ! হাঃ-হাঃ করে হাসছেন, সারাদিন অফিসের ছেলেছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন, অফিসে আসার কোনও বাঁধাধরা টাইম নেই। সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই বাড়ি পালাচ্ছেন। বড়বাবুর টেবিলে এখন ফাইলের স্তূপ।

টেলিফোনের বাজনা থেমে গেছে। ঘরের পাখা-আলোর সুইচগুলো নিভিয়ে সদর দরজায় তালা লাগায় রঘু। ছ'টা তেরোর লোকালটা ধরতে হবে। আপনমনে বিড়বিড় করতে-করতে সিঁড়ি দিয়ে রঘু নামতে থাকে এবং ঠিক এগারো নম্বর ধাপে এসে থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার হনহন করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দরজার তালাগুলো টেনে-টেনে দ্যাখে—সেগুলো ঠিকমতো লাগানো .হয়েছে কিনা। এটা এখন প্রতিদিনই করে সে। আরও একটা অভ্যেস হালে রপ্ত করেছে। লালবাজার থানার উলটো ফুটপাতে বাক্সবন্দি শনিঠাকুরের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। অফিস থেকে বেরোলেই অদৃশ্য কেউ যেন তাকে ওইদিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

করঞ্জাক্ষর কাজের লোক

কিন্নর রায়



ভূত নয়, ভুতো

বর্ষার ভোরবেলাটা বেড়ানোর পক্ষে আদৌ সুবিধের নয়। ঘুম থেকে উঠেই যদি গায়ে-মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে তাহলে অনেকের মতোই মেজাজটা খিঁচড়ে যায় করঞ্জাক্ষ চাকলাদারের। বেড়াবার কেড্‌স ভিজে গেলে পায়ের পাতায় কেমন যেন বিরক্তি।

বেড়ানোর ব্যাপারে করঞ্জাক্ষের থেকেও বেশি উৎসাহ ডকির। এগারো মাসের ডকির লোম ছাঁটার পর আবারও নতুন করে গা ঢেকে যাচ্ছে। দেড় মাস আগে ডকির লোম কাটানো হয়েছে। গরমে বড্ড কষ্ট হত। এই গ্রীষ্মে ওর মতো গায়ে যদি ডবল কম্বল থাকত, করঞ্জাক্ষ ভাবতেই পারেন না।

লম্বা-লম্বা একটু ঝোলা কান, সোনালী লোম। তীরবেগে দৌড়ে যেতে পারে। গলার ঘৌ-ঘৌ-এ মেঘের ডাক। সাঁতরে গুলি খাওয়া পাখি, হাঁস মুখে তুলে আনতে ওর বড় মজা—যেমন অন্যান্য গোল্ডেন রিট্রিভারের। মেয়ে-কুকুরের বুদ্ধি শোনা যায় বেশি হয়। ডকি তো ছেলে-কুকুর। তবুও ওর মস্তিষ্কের জুড়ি খুঁজে পান না করঞ্জাক্ষ।

যে-পাগলাসাহেব ডকিকে দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ কলকাতার এক ক্লাব পার্টিতে। অনেক রাতের হইচই। সাহেব বলছিলেন গোল্ডেন রিট্রিভারদের ইতিহাস। সেই কবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে গেছিল এক রুশ সার্কাসের দল। তাদের এক সোনালী-লোম কুকুরের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ব্লাড হাউন্ড মিশে তৈরি হল গোল্ডেন রিট্রিভার। পার্টিতে কত মজার গল্প, এলোমেলো আলোচনাই না হয়। কিন্তু করঞ্জাক্ষ পরে বই মিলিয়ে দেখেছিলেন বিষয়টি ষোলো আনা খাঁটি।

পাগলাসাহেব একসময় ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিতে ছিলেন। বহুদিন রিটায়ার করে এখন থাকেন ব্যাম্বু ভিলার কাছে। তাঁর আছে কিছু কুকুর আর পুরনো পেইন্টিং, ছবির প্রিন্ট। লোকে বলে, একটা-দুটো করে পুরনো পেইন্টিং, প্রিন্ট মোটা টাকায় বেচে পাগলাসাহেব তাঁর কাপ্তেনি বজায় রাখেন। তাঁর এক ছেলে

অনেকদিন আগেই চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। ফ্ল্যাটে একা পাগলাসাহেব, আর তাঁর অনেক কুকুর। ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন—করঞ্জাক্ষ নিজে দেখেছেন, সেই বাজনার তালে-তালে দুটো গোল্ডেন রিট্রিভার নাচছে—এরাই ডকির বাবা-মা।

এই বিশাল বাড়ি, বাগানে করঞ্জাক্ষ চাকলাদার একাই থাকেন। তাঁকে গত কুড়ি বছর এখানকার মানুষ দেখে আসছে প্রায় একই চেহারায়। নিপাট ভাবলেশহীন চৌকো মুখ। যেন কিছুটা দাম্ভিক। লম্বা একহারা চেহারা। খয়েরি চুল, উলটে আঁচড়ানো। চোখে কালো কাচের চশমা, বারোমাস। রাত-দিন। দিনের আলো তাঁর তেমন সহ্য হয় না।

আজ এই মেঘলা সকালে, ভেবেছিলেন, আলসেমি করে গড়িয়ে অনেকটা সময় কাটাবেন। তার উপায় নেই। ডকি দরজা আঁচড়াচ্ছে, নখের শব্দ—খচর-খচর-খচ-খচ। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে উ-উ, উ-উ। ধপধপ শব্দ করে মাথা দিয়ে বন্ধ পাল্লায় ধাক্কা।

বিছানায় উঠে বসে চোখে কালো চশমা দিয়ে দরজা খুলতেই ডকি একলাফে দু-পা তুলে দিল করঞ্জাক্ষের কাঁধে। গোলাপী জিভ বার করে দু-বার বুলিয়ে নিল গালে। আর করঞ্জাক্ষ, 'ছাড়, ছাড়। নাম, নাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডকি,' বলে দু-বার চাপড়ে দিলেন তাঁর প্রিয় গোল্ডেন রিট্রিভারকে। দু-চারটে লোম উড়ে গেল ভোরের হাওয়ায়। বর্ষায় বড় আলগা লোম ওড়ে।

এ-বাড়ির খিলানে ডোরিক স্থাপত্য। সামনে অনেকটা বাগান। পুরনো লোহার গেট মরচে ধরা, টেনে বন্ধ করতে গেলে শব্দ হয়। বাগানে এক সময় ফোয়ারা ছিল। আর ছিল মার্বেল পাথরের সাদা পরীরা। তাদের ডানায় চাঁদের আলো পড়লে মনে হত—এই উড়ে যাবে। উড়ে গেল।

ফোয়ারা বুজে গেছে। জল দেওয়ার পেতলের নলগুলো চোরে নিয়েছে। ফোয়ারার সাদা চ্যাটালো পাথর বাঁধানো জায়গাটিতে অজস্র শুকনো পাতা, ধুলো, সাপের খোলস। পরীর নাক নেই, বাঁ কানের লতি নেই। বাঁ হাত, ডান দিকের ডানাটি ভাঙা।

এ-বাড়ির কর্তাদের চার ঘোড়ার ফিটন ছিল। আর ছিল লোকলশকর, পালকি, বেয়ারা, সেপাই, বন্দুক। গমগম করত বাড়ি। চোখে কালো চশমা দিয়ে চাঁদনি রাতে ফোয়ারার পাশে দাঁড়ালে সেই অতীতকে নিজের চিন্তা দিয়ে একটু-একটু করে জুড়ে দিতে পারেন করঞ্জাক্ষ। আর যদি আরও একটু মজা করার ইচ্ছে হয় তাহলে ছাদের ঘরে রাখা সময়-ঘড়ির কাঁটা ঘোরাতে ঢুকে পড়তে পারেন সেই সময়ের ভেতর, যখন এ-বাড়ির কর্তাবাবুরা মোম দিয়ে গোঁফ ছুঁচলো করে আতর লাগিয়ে ফিটনে পা রাখছেন। সেই আতরের ঘ্রাণ, ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, বাবুদের বাবুয়ানি—সবই হাতে করে ছুঁতে পারেন করঞ্জাক্ষ।

সময়-ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সেই সময়ে ডকিকে নিয়ে একবার ঢুকেছিলেন



শজারু যেমন মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে কচু কন্দ বার করে, তেমন করেই মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে কী যেন বার করে আনতে চাইছে ভুতো।

করঞ্জাক্ষ। ব্যস—খুব গোলমাল। ঘোড়া, ঐশ্বর্য, অদ্ভুত পোশাক দেখে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ভৌ ডেকে একশা। এক সেপাই তো ডকিকে গুলিই করে দিচ্ছিল। নেহাত নিজের কাছে সবসময় বাহারি ছড়িটি থাকে। তার একটি সুইচ টিপতেই কাঁটা ঘুরিয়ে করঞ্জাক্ষ আবার এখনকার ভাঙা বাগানবাড়িতে।

ঘাসফুলেদের মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা লেগে আছে। আকাশে রোদ নেই। গেট পেরিয়ে চেন-বাঁধা ডকিকে নিয়ে রাস্তায় এলেন করঞ্জাক্ষ চাকলাদার। একটু দৌড়বেন। পৃথিবী সকলকেই বড় ক্লান্ত করে দেয়।

ডকি দৌড়চ্ছে। সাদা হাফপ্যান্ট আর আকাশী স্পোর্টস গেঞ্জি-পরা করঞ্জাক্ষ। পায়ে সাদা কেড্‌স। পৃথিবীর হিসেব অনুযায়ী যাঁর বয়েস পঞ্চাশ। ভোরের হাওয়া তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে দেয়। আজকের ভেজা হাওয়ায় তেমন টান নেই। পথের পাশে বর্ষার জমা জলে আকাশ গোটা জলছবি। পাশে কচুগাছের সঙ্গে গা লাগিয়ে ছাই রঙের হাঁস।

মিনিট পনেরো হাঁটলেই সেই বিশাল বিলটি। এখন জলে টাপুরটুপুর। শীতে এখানে পাখি নামে। তখন এয়ারগানের গুলির শব্দে বাতাস ছিঁড়ে গেলে ঘাড় লটপট বেলে-হাঁস কুড়িয়ে আনার জন্য ডকির সাঁতার। আকাশের দিকে মুখ তুলে জল কাটছে। পাড়ে এয়ারগান হাতে করঞ্জাক্ষ চাকলাদার।

ঝিলের ওপার থেকে মেঘের গা-চোঁয়ানো বৃষ্টিকে ছুটে আসতে দেখলেন করঞ্জাক্ষ। ধু-ধু মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন চোখে পড়ে, তেমনই দেখতে পেলেন হুড়মুড় করে দৌড়ে আসছে বৃষ্টি। অজস্র ফোঁটা বিলের জলে।

বৃষ্টির ধাক্কায় বিল আলো করে ফুটে থাকা সাদা আর লালচে শাপলা ফুলেরা একটু-একটু করে কেঁপে উঠল। পড়ে গেল তাদের সবুজ পাতা।

বৃষ্টি ঠিক পাড়ে পৌঁছে যাওয়ার আগেই হাতের ছড়িটি বার করে জাদুকর ম্যানড্রেকের মতো মাথার কাছে ঘুরিয়ে দিলেন করঞ্জাক্ষ। এ-দৃশ্য কেউ দেখলে অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারত। কিংবা বিস্ময়ে বোবা। তাঁর চারপাশে এখন খুব সূক্ষ্ম, জলরঙের স্বচ্ছ ঢাকনা। আর ডকির চারপাশেও। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতেও কোনও অসুবিধে নেই। তবু একবার বিলের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন করঞ্জাক্ষ। আকাশ সাদা করে বৃষ্টি নেমেছে। আর তখনই পাড়ের কাছে একদম ভুস করেই যেন ভেসে উঠল কী একটা। যেমন উঠে আসে জলহস্তী, নয়তো কুমির।

এটা তো আফ্রিকা বা চিড়িয়াখানা নয়, নেহাতই পশ্চিমবাংলার একটি অজ গাঁ। ছোট নিচু স্টেশনে কয়লার ইঞ্জিন, ঘস-ঘস ঘিস-ঘিস করে এসে থামে দু-বেলা। আবার কু-উ-উ শব্দ তুলে দৌড়য়। দিনে বড়জোর গোটা তিন-চার ট্রেন। হলে কী হবে, এখানে ব্যাটারিতে টিভি চলে। ভিডিও-র নামও শুনেছে মানুষ। কিন্তু যাতায়াতের বড় কষ্ট। বিশেষ করে বর্ষাকালে। এখনও হাটে লাউয়ের বদলে চাল, আর মুরগির বদলে গামছা পাওয়া যায়।

ভুস করে ওঠা বস্তুটি সবুজ। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে নজর করে করঞ্জাক্ষ

দেখলেন ঘাসের বোঝা এবং তার নীচে একটি কালো মুণ্ডু।

'স্যার, ম্যাজিকটি আমি দেখতে পেয়েছি। আপনি স্যার খুব বড়...'

কেমন খোনামতো গলা! আওয়াজে যেন বৃষ্টি ছিঁড়ে যাচ্ছে।

করঞ্জাক্ষ সতর্ক হলেন। তাঁর চারপাশে তখনও স্বচ্ছ ঢাকনা। ঢাকনার ভেতর থেকেই ডকি কিম্ভূতটিকে দেখে চিৎকার জুড়েছিল : 'ঘৌ-ঘৌ, হৌ-হৌ।'

'স্যার, আপনার কুকুরটা খুব রাগী, স্যার।'

বস্তুটি কী, করঞ্জাক্ষ বুঝে উঠতে পারছিলেন না। গলাখাঁকারি দিয়ে গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করে বললেন, 'তুই কে রে!'

'আমি ভুতো, স্যার, ঘেসো ভুতো। ঘাস কাটি।'

'এখানে কেন?'

'কাজ খুঁজছি। আমায় রাখেন না! আপনার তো অনেক বড় বাড়ি, বাগান। দেখার লোকও তো দরকার।'

সন্দেহে কপাল কোঁচকাল করঞ্জাক্ষর। লোকটা এত জানল কোত্থেকে!

ততক্ষণে জলের ভেতর থেকে ঘাসের বোঝা মাথায় উঠে এসেছে ঘেসো ভুতো। একটা নোংরা গামছা ল্যাঙটের মতো করে টেনে বাঁধা।

বোঝা মাটিতে নামানোমাত্র চোখে পড়ল চকচকে টাকঅলা হেঁড়ে মাথাটি, ঢুলুঢুলু চোখ—যেমন নেশাখোরদের হয়। লম্বা-লম্বা সিড়িঙ্গে গড়ন। কালো, শুঁটকোমতন চেহারা।

মাটিতে প্রায় মিশে গিয়ে একখানা প্রণাম সারল ভুতো। করঞ্জাক্ষ গললেন। ডকি তখনও মেঘলা বাতাস ছিঁড়ে দিচ্ছে তার গলার হাঁকে।

'স্যার, আমায় রাখেন—' বলতে-বলতে দু-হাত জোড় করে বিনয়ে গলে যাচ্ছিল ভুতো।

করঞ্জাক্ষর কেন যেন মায়া হল। এই পৃথিবীর প্রভাব আর কী!

'স্টপ, ডকি, স্টপ!' বলতে-বলতে তিনি মাথার ওপর আর শরীরের চারপাশ থেকে স্বচ্ছ আবরণ খসিয়ে আনলেন ছড়ি ঘুরিয়ে। ডকিরও আবরণ গেল সরে।

'বাবাঃ—ভূত নয়, ভুতো।' মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল করঞ্জাক্ষর।

আকাশী ফিটনের সওয়ার

এ-বাড়িতে তেমন তো কোনও কাজই নেই। তবু ভুতো থেকে গেল। করঞ্জাক্ষের রান্নাবান্নার বালাই নেই। উদ্ভিদ যেমন আলো থেকে, হাওয়া ও মাটি থেকে তার খাবারটুকু শুষে নিতে পারে, তেমনই পারেন করঞ্জাক্ষ। শুধু তাঁর গোল্ডেন রিট্রিভারের জন্য দুধ-রুটি-মাংস। সেটিও শখ মনে করে বানিয়ে নেন নিজের হাতে।

আজ পৃথিবীর হিসেবমতো কুড়ি বছর হয়ে গেল তিনি এক্স-ফাইভ নামের নক্ষত্রটির নিজস্ব সংবাদদাতা। পৃথিবী নামক গ্রহের আবহাওয়ার খুঁটিনাটি খবর পাঠাতে হয় আলোর তরঙ্গে-তরঙ্গে। বাকি অবসরটুকু কাটে সময়-ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অতীত বা বর্তমানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নয়তো গভীর রাতে এ-গ্রাম ঘুমিয়ে গেলে তাঁর টু-সিটার আকাশী ফিটনটি চেপে পৃথিবীর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে-যেতে।

ফিটন মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াতে পারে না। কিন্তু বায়ুর অনেকগুলো স্তর ভেদ করে ডানা ভাসাতে পারে। কখনও মনখারাপ হয়ে গেলে স্পেস সুটটি পরে মেঘের ভেতর ঢুকে চান সেরে নেন করঞ্জাক্ষ। সে বড় নির্মল আনন্দ। মেঘের জলবিন্দুতে পৃথিবীর মালিন্যটুকু লেগে থাকে না। আর ক্কচিৎ কলকাতায়, দু-একজন বন্ধুর কাছে। কয়লার ট্রেনে চেপে।

মেঘের সঙ্গে খেলার ব্যাপারটা ডকিকেও রপ্ত করাতে চাইছেন। স্পেস সুটে ডকি এখনও তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠল না। আর এই তো সেদিন কোন এক রবিবারের সকালে নিজের বসার ঘরে পৃথিবীর টিভি সেটটির পরদায় রথে চড়ে রাবণকে শূন্যে উঠে যেতে দেখে করঞ্জাক্ষর হাসি পেয়েছিল। তিনি তো পারেন তাঁর কমলা রঙের আকাশী ফিটনকে যখন-তখন মেঘ পেরিয়ে মেঘে পৌঁছে দিতে। পৃথিবীর মানুষের কল্পনার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল।

কুড়ি বছর ধরে একঘেয়ে খবর পাঠাতে-পাঠাতে করঞ্জাক্ষ যেন একটু ক্লান্তও। হয়তো পৃথিবীর ধর্মেই। সেই এক হিসেব—আবহাওয়া, এখানকার বিভিন্ন প্রাণীর গড় আয়ু, খাবার-দাবার, চেহারা, অভ্যাস। যাবতীয় খুঁটিনাটি! তাঁদের তারায় তো কোনও ক্লান্তি নেই।

ভুতো দিব্যি মানিয়ে গেল এ-বাড়িতে। বেশ চটপটে আর গোছানো। কোনও জিনিস প্রায় বলার আগেই হাতের কাছে পেয়ে যান করঞ্জাক্ষ। মুখ দেখেই যেন বুঝতে পারে, কে কী চাইছে। কে কী চায়। ওকে যতটা বোকা ভেবেছিলেন করঞ্জাক্ষ, মোটেই ততটা বোকা নয়। কেবল ডকি ওকে একেবারে সহ্য করতে পারে না।

ভুতো, না খরগোশ?

এ-বাড়ির মাটির নীচে অনেকগুলো চোরা-কুঠুরি। তারই দুটোতে নিজের মহাকাশযানটির যন্ত্রপাতি খুলে আলগাভাবে রাখা আছে। চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে নতুন আর-একজনকে দায়িত্ব দিয়ে ফিরে যেতে হবে নিজের জন্মভূমিতে। মাঝে-মাঝেই অনেকটা রাতে চোরাকুঠুরির ভেতর ঢুকে সব ঠিকঠাক আছে কি না, দেখে নেন করঞ্জাক্ষ। আলাদা-আলাদা করে রাখা যন্ত্রপাতি ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত সতর্কতা। আজ যখন নামবেন ঠিক করছেন, তখনই ভুতো এসে নট নড়নচড়ন হয়ে গেল তাঁর দরজার কাছে। কী

খুটখাট করছে। আর হেঁড়ে গলায় শ্যামাসঙ্গীত গাইছে।

অনেকক্ষণ উসখুস করতে-করতে করঞ্জাক্ষ বললেন, 'কী ব্যাপার ভুতো! অনেক রাত হল। এবার শুতে যাও।'

'আরশোলা মারছি, স্যার।' বলতে-বলতে ভুতো আবারও চেঁচিয়ে, বেসুরো গলায় গান ধরল : 'মনের বাসনা শ্যামা—'

করঞ্জাক্ষবাবু পৃথিবীর মানুষের মতোই রেগে—ধুত্তেরি, বলে শুতে চলে গেলেন দোতলায়।

আজ আর তাঁর চোরকুঠুরিতে ঢুকে রুটিন চেকআপ হল না। নীচে তখনও গলা ফাটিয়ে ভুতো গেয়ে চলেছে, 'অর্ধ অঙ্গ গঙ্গা জলে/অর্ধ অঙ্গ রবে স্থলে...।' আর ডকি তারও চতুর্গুণ জোরে চেঁচিয়ে গোটা বাড়ি ভেঙে ফেলছে।

রাতে আবারও ডকির চিৎকারে ঘুম ভাঙল। দোতলার বারান্দা থেকে ডকি প্রায় নীচে লাফিয়ে পড়তে চাইছে। ঘুম চটকে গিয়ে সাবেক দিনের মোটা কাঠের রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখলেন করঞ্জাক্ষ। ভুতো প্রায় উপুড় হয়ে ঘাস জঙ্গলের ভেতর যেন কী করছে। সেখানে রাত ফুরিয়ে আসা চাঁদের কিছু আলো। ভুতোর পিঠে। চকচকে টাকে। চেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে ডকি। এবং করঞ্জাক্ষ : 'ও ভুতো, কী করছ', জিজ্ঞেস করামাত্র ভুতোর জবাব, 'জোনাকি খুঁজছি, স্যার।'

দৌড়ে, সিঁড়ি ভেঙে একলাই নীচে নেমে, মুছে আসা হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্নায় করঞ্জাক্ষ দেখতে পেলেন ভুতোকে। উপুড় হওয়া ভুতো তাঁকে দেখে সোজা। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসা ফিকে আলোয় যতটা দেখা যায়, তাতে করঞ্জাক্ষ দেখতে পেলেন ভুতোর মুখে ঘাস লেগে আছে। সত্যিকারের ঘাস। তার উদোম গা থেকে বনের গন্ধ। কোমরের নেংটিতে, গলায়, বুকে, পায়ে শুকনো পাতা। ন্যাড়া মাথায় চাঁদের আলো।

কী মনে হতে করঞ্জাক্ষ ফিরে এলেন। তাঁর কপালে সন্দেহের আঁচড় পড়ল। তিনি ঘুরে, ফিরে আসতে-আসতে দেখতেও পেলেন না শজারু যেমন মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে কচু কন্দ বার করে, তেমনই করেই মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে কী যেন বার করে আনতে চাইছে ভুতো। তার মুখে শেয়ালের ফিচেল হাসি। আর ডকি তখনও গলা ফাটাচ্ছে।

শেষপর্যন্ত

খবর পাঠানোর সিগন্যাল-ঘরে ভুতোকে এভাবে দেখবেন, এমন স্বপ্নেও আশা করতে পারেননি করঞ্জাক্ষ। একটি তথ্যের গোলমালে, ডেটার ভুলচুকে তাঁর নক্ষত্রে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের গবেষণার বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। এমনকি সঙ্কেতের এদিক-ওদিক হলে, করঞ্জাক্ষ বিপদে পড়েছেন এমন ভেবে

নিয়ে নেমে আসতে পারে আক্রমণ, এই পৃথিবীতে। তাতে পৃথিবীর ক্ষতি। ক্ষতি সমস্ত মহাকাশ-গবেষকদের।

ডকি অজ্ঞান, নাকি মারা গেছে? করঞ্জাক্ষ বুঝতে পারলেন না। চেনে বাঁধা গোল্ডেন রিট্রিভার ছেঁড়া ন্যাতা হয়ে পড়ে আছে। আর তাঁর বসার চেয়ারে ভুতো। চকচকে টাক। কালো পিঠ। একটু কুঁজো হয়ে বসে আলোর সঙ্কেতে খবর পাঠানোর বোতাম টিপছে ভুতো।

পৃথিবীতে এখন অনেক রাত। ঘরের তালা ভাঙতে তেমন কোনও কষ্ট হয়নি ভুতোর। আর ডকিকে অজ্ঞান করতে, না কি মেরে ফেলতে?

কী ভেবে যেন কালো ভূতটার দিকে না এগিয়ে ছুটে শোয়ার ঘর থেকে হাতের ছড়িটি নিয়ে এলেন করঞ্জাক্ষ। তারপর তার সুইচ টিপে সরু-সরু অনেকগুলো আঁকশি বার করে চেয়ার থেকে প্রায় পাকা আমের মতো পেড়ে নিয়ে এলেন ভুতোকে।

'স্যার, অন্যায় হয়েছে, স্যার। কান মুলছি।'

হাতের কাছে এনে ঠাস করে একটা চড় মারলেন করঞ্জাক্ষ।

চড় খেয়ে উফ্ বলে ভুতো তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল।

'স্যার, সত্যি কথা বলছি। ওই জলাটার ভেতর নেমে আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। খবর পাঠানোরও কোনও উপায় নেই। ঘাস মাথায় জল থেকে উঠে আসতে-আসতে আপনার চারপাশে বৃষ্টি আটকানো দেওয়াল আর ছাদ দেখেই কেমন যেন মনে হল।'

'কী মনে হল?'—করঞ্জাক্ষ হেডস্যারের গলায় ধমকালেন।

'স্যার, মনে হল, আপনি এখানের নন, আপনি পারেন আমার দেশে, মানে ওই মহাকাশ পেরিয়ে অন্য এক গ্রহে একটা খবর দিতে। আপনার কাছে পাওয়া যেতে পারে সারানোর যন্ত্রপাতি, পরামর্শ।...স্যার, আপনার যন্ত্রটা বুঝতে পারছি না। নিজের কোড নম্বরটাও ভুলে গেছি। কী যে করি! অবশ্য এখানে থেকে গেলে মন্দ হয় না, এত ঘাস-পাতা। মাটির নীচে-ওপরে কত খাবার! এত টাটকা সবুজ আমাদের ওখানে পাওয়া যায় না, স্যার। একটু পেটুক আছি যে—'

করঞ্জাক্ষ হাঁ হয়ে গেছেন।

'অ্যাই ডকি, ওঠ-ওঠ। স্যার রাগ করবেন। আমরা স্যার পারি যে-কোনও প্রাণীকেও ঘুমো, বলে ঘুম পাড়াতে। ওঠ, বলে ওঠাতে।...অ্যাই ডকি, ওঠ।'

ডকি ততক্ষণে আড়মোড়া ভাঙছে।

'যাক গিয়ে স্যার, নাই-বা পাঠাতে পারলাম খবর! কী হবে ফিরে গিয়ে! আপনার তো একজন কাজের লোক দরকার, স্যার। আমাকে রাখেন না! এখানে কত ঘাস, পাতা, সবুজ।'—বলতে-বলতে জিভের জল টানল ভুতো।

ছবি : অনুপ রায়

ঝিঁজো

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



বাড়ি ফিরে ডোর-বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। দরজায় অপরিচিত একটি মেয়ে। বয়েস অল্প, পনেরো-ষোলোর বেশি হবে না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এই মেয়েটি যে কে, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। পাপিয়া আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'দাদা, এ-মেয়েটি আবার কোত্থেকে এল ! কীরকম অদ্ভুত চেহারা !'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলাম, 'কী করে বলব, আমিও তো তোর সঙ্গে এক্ষুণি ফিরলাম। একে তো আগে কখনও দেখিনি—'

আজ গ্লোবে ইভনিং শোতে স্পিলবার্গের একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। মাঝে মাত্র ঘণ্টাচারেক বাড়ি ছিলাম না। এটুকু সময়ের মধ্যেই একে আমদানি করল কে ? চেহারা দেখে তো বাড়ির কাজের মেয়ে বলেও মনে হয় না।

দরজার একপাশে চুপচাপ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। এবার ওর দিকে ভাল করে তাকালাম। স্কার্ট-পরা মেয়েটি খুবই সুন্দরী, সন্দেহ নেই, যদিও মুখে কেমন এক বিষণ্ণতার ছোঁয়া। গায়ের রঙও অন্যরকম। কেমন যেন ফরসা সবুজ। একে লাল-টুকটুকে মেয়ে না বলে বোধহয় বলা উচিত সবজে-সবুজ মেয়ে। ওর চোখের মণিতেও আশ্চর্য উজ্জ্বল সবুজ আভা। কিন্তু সেটা স্থির নয়। জোনাকির মতো কেবল জ্বলছে আর নিভছে।

দারুণ অবাক হয়ে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। একটু পরেই অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিতে হল।

একটু হেসে পাপিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে, তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি—'

কিন্তু মেয়েটি পাপিয়ার কথার কোনও উত্তর দিল না। আগের মতোই বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি বোধহয় পাপিয়ার কথা শুনতে পায়নি, এ-কথা ভেবে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না—'

এবার মেয়েটি ঠোঁট ফাঁক করে কী যেন বলল। কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু মনে হল, সামনে কোথাও যেন একঝাঁক ঝিঁঝিপোকা ডাকছে।

এবার সত্যিই খুব অবাক হলাম। ঝিঁঝিপোকার মতো মানুষের গলার স্বর হতে পারে, এ-কথা জানা ছিল না।

'কী রে, তোরা কী গেটেই দাঁড়িয়ে থাকবি, না কি বাড়ি ঢুকবি !'

মায়ের গলার আওয়াজ পেয়ে হঠাৎ যেন ঘোর কাটল। আর সময় নষ্ট না করে আমি আর পাপিয়া দুজনেই ঝটপট বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

শোয়ার ঘরে গিয়ে মাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল পাপিয়া, 'এই অদ্ভুত মেয়েটা আবার কে ? একে তো—'

পাপিয়ার কথা শুনে মা হেসে ফেললেন : 'আগে দেখবি কী করে ? তোরা বেরনোর একটু পরেই তো সৃজন নিয়ে এল ওকে। সেই বেহালার চৌরাস্তা না কোত্থেকে—'

'তাই নাকি ! কী ব্যাপার খুলে বলো তো—'

মা যা বললেন তা মোটামুটি এইরকম :

আজ সকালে বেহালায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন সৃজনকাকা। সেখান থেকে গল্পগুজব করে ফেরবার সময় দেখলেন, বেহালার চৌরাস্তার মোড়ে এই মেয়েটি চুপচাপ একলা দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কোনও লোকজন নেই। রোববারের দুপুর। তাই রাস্তায়ও লোকজন বিশেষ নেই। ওখানে ওইভাবে মেয়েটিকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হল সৃজনকাকার। কিন্তু মেয়েটি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি—কোনও ভাষাই জানে না। তাই জিজ্ঞেস করেও মেয়েটির কাছ থেকে কোনও উত্তর পাননি সৃজনকাকা। শুধু ওই ঝিঁঝিপোকার ডাক ছাড়া।

মেয়েটির কোনও কথা বুঝতে না পেরে সৃজনকাকা যখন কিছুটা দোটানায়, তখন মেয়েটিই ইশারায় জানাল, এ-শহরে ওর থাকার কোনও জায়গা নেই। ওকে যেন সৃজনকাকা নিজের বাড়িতে নিয়ে যান।

সৃজনকাকার তখন মনে হল, মেয়েটি বোধহয় গাঁয়ের মেয়ে। কারও সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসে হারিয়ে গেছে। মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি কম, গলার স্বরও হয়তো কোনও অসুখে খারাপ হয়ে গেছে। সাত-পাঁচ ভেবে প্রথমেই পুলিশের কাছে জমা না দিয়ে মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। মনে-মনে ঠিক করেছেন, পরে পুলিশে খবর দেবেন। বাবা-মা অথবা আত্মীয়স্বজনের খোঁজ পাওয়া গেলে পরে না হয় তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

মায়ের কাহিনী ফুরোলে পাপিয়া বলে উঠল, 'যাক, তোমার তো ভালই হল, যে-ক'দিন মেয়েটির আত্মীয়স্বজনের খোঁজ না পাওয়া যায়, তোমার ফাইফরমাশ খাটতে পারবে—'

'না রে, না। সৃজন বারবার বলে গেছে, ওকে দিয়ে যেন ঘরের কোনও



…দরজা খুলে গেল। দরজায় অপরিচিত একটি মেয়ে। বয়েস অল্প, পনেরো-ষোলোর বেশি হবে না। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এই মেয়েটি যে কে, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কাজকর্ম করানো না হয়। কিন্তু মেয়েটা নিজে থেকেই কাজকর্ম করছে। কিছুক্ষণ আগে দারুণ চা বানিয়ে তোর বাবা আর আমাকে খাইয়েছে। এই দেখ না, তোরা ডোর-বেল টেপামাত্র মেয়েটা দরজার দিকে ছুটে গেল। আমি আসবার আগেই দরজা খুলল। কয়েক ঘণ্টা ধরে দেখছি তো, মেয়েটা দারুণ চটপটে। খুব বুদ্ধিও আছে।'

পাপিয়া অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'সত্যি ! কিন্তু দেখলে তো বেশ বোকা বলেই মনে হয়।'

'তোর কাকাও প্রথমে তাই ভেবেছিল, কিন্তু এখন ওর ধারণা বদলেছে—'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য ব্যাপার ! একটা নতুন মেয়ে বাড়িতে এসেছে। কোথায় তার সঙ্গে তোমরা গল্পগুজব করবে। তা না করে তার বুদ্ধি নিয়ে আলোচনায় মেতেছ। মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করেছ ?'

মায়ের বদলে পাপিয়াই উত্তর দিল, 'ওর নাম জিজ্ঞেস করেই বা কী লাভ ? ও কি নিজের নাম বলতে পারবে ? ওই তো ঝিঁঝিপোকার মতো গলার স্বর !'

পাপিয়ার কথা শুনে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ও নতুন মেয়েটার ওপরে বেশ চটেছে। কিন্তু এরই মধ্যে এমন কী ঘটল যাতে পাপিয়া এমন রেগে গেল মেয়েটার ওপর ! হয়তো বাড়িতে ঢোকবার সময় মেয়েটা যে পাপিয়ার কথার জবাব দেয়নি সেটাই কারণ। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে এত চটে যাওয়ার কী আছে ভেবে পেলাম না। কারণ এমনও তো হতে পারে, পাপিয়ার কথা মেয়েটা প্রথমে বুঝতে পারেনি।

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্যই বললাম, 'যাক গে, মেয়েটা নিজের নাম না-ই বা বলল, আমরাই তো ওর একটা নাম দিতে পারি। আমি ওর জন্যে একটা নামও ভেবেছি। ঝিঁজো। মেয়েটা ঝিঁঝিপোকার মতো আওয়াজ করে আর ওর চোখের মণিটা জ্বলে-নেভে জোনাকির মতো। ঝিঁঝির 'ঝিঁ' আর জোনাকির 'জো' মিলে তৈরি হল ঝিঁজো। কেমন, খুব সুন্দর নাম হয়নি !'

মুখ বেঁকিয়ে পাপিয়া বলল, 'দুস, এটা কি একটা নাম হল নাকি ! একেবারে বাজে নাম।'

পাপিয়া যা-ই বলুক না কেন, এ-বাড়িতে ঝিঁজো নামটাই চালু হয়ে গেল। সৃজনকাকা, মা-বাবা সবাই ঝিঁজো বলেই মেয়েটাকে ডাকতে শুরু করলেন। আর এই নামেই সাড়া দিত মেয়েটা।

ইতিমধ্যে ঝিঁজোকে ওর বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশে খবর দিয়েছেন সৃজনকাকা। টিভিতে ওর ছবি দেখানো হয়েছে, রেডিয়োর খবরে বলেছে, খবরের কাগজেও ছবি ছাপা হয়েছে। কিন্তু ঝিঁজোর আত্মীয়স্বজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এদিকে আমাদের সকলের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে ঝিঁজোর, কেবল পাপিয়ার সঙ্গেই ভাবটা তেমন জমেনি। ভেতরে-ভেতরে খানিকটা রেষারেষি যেন থেকে গেছে। আজকাল কথা বলতে না পারলেও আমাদের সব কথাই

বুঝতে পারে ও।

পড়াশোনার ফাঁকে অবসর মিললে আমরা তিনজনে লুডো খেলতাম। প্রথম-প্রথম লুডো খেলায় হেরে যেত ঝিঁজো, কিন্তু পরের দিকে প্রতিদিনই ও খেলায় জিতত।

শুধু লুডো নয়, ওকে শেখাবার পর ব্যাডমিন্টন কিংবা দাবাতেও ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। এত ভাল স্কিপিং করতে শিখল ঝিঁজো যে, শুধু পাপিয়া নয়, পাড়ার কোনও মেয়েই ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না।

ও যে আমাদের কীভাবে খেলায় হারাত, তার রহস্য ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তবে দেখেছি, আমরা ওর প্রতিপক্ষ হয়ে কখন কী চাল দেব, তা খুব সহজেই আগে বুঝতে পারত। ফলে খেলায় জেতা ওর পক্ষে তেমন কোনও শক্ত ব্যাপার ছিল না। শুধু খেলাধুলোতেই নয়, রান্নাবান্নার কাজেও ওর যথেষ্ট উৎসাহ। রান্নাঘরে প্রায়ই মায়ের হাতা-খুন্তি নিয়ে কীসব রান্নাবান্না করত। খেয়ে দেখেছি, ওর হাতের রান্না বেশ ভাল।

ওর আরেকটা গুণ বা ক্ষমতা হল, যে-কোনও ঘটনাই, যা একটু পরেই ঘটতে চলেছে, তা খুব সহজেই বুঝতে পারত। কী করে যে ও ভবিষ্যৎ বুঝতে পারত, এটা আমার কাছে একটা রহস্য। লক্ষ করে দেখেছি, ঝিঁজো যখন কোনও ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে তখন ওর চোখের সবুজ আলোটা অনেক বেশি দপদপ করতে শুরু করে। আর কথা বলার গতিও বেড়ে যায় অনেক গুণ। তখন মনে হয়, একটা-দুটো নয়, কয়েক হাজার ঝিঁঝিপোকা যেন ভিড় করেছে আশেপাশে।

সাফ মাথা দেখে একদিন সৃজনকাকা ঝিঁজোকে অঙ্ক শেখাতে বসালেন। আমরাও দেখে অবাক হলাম, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সব ধরনের অঙ্কই ঝটপট শিখে ফেলল ও। বড়-বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ মুহূর্তের মধ্যেই কষে ফেলা ওর কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।

'আরে ঝিঁজো দেখছি দারুণ অঙ্ক কষে!' আমার কথায় ঝিঁজোর মুখে হাসি ফুটলেও মুখ গম্ভীর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পাপিয়া।

সৃজনকাকা বললেন, 'বাঃ, দারুণ বলেছিস তো, বাদল। ঝিঁজোকে নিয়ে আমাদের সায়েন্স ক্লাবে শো করালে দারুণ জমবে কিন্তু—'

প্ল্যানমাফিক রোববার বিকেলে ঝিঁজোর শো-এর বন্দোবস্ত হল। তার আগে ঝিঁজোকে দিনকয়েক পুরো তালিম দিলেন সৃজনকাকা। কোন ভঙ্গিতে স্টেজে দাঁড়াতে হবে, কোন কায়দায় বোর্ডে চক দিয়ে লিখবে, দর্শকরা হাততালি দিলে কীভাবে অভিবাদন করতে হবে—সব কিছু।

রোববারের শো বেশ ভালই জমেছিল। বিরাট-বিরাট গুণ, ভাগ মুহূর্তের মধ্যে করে দেখাল ঝিঁজো। চারদিকের বিরাট হাততালি, আনন্দের উচ্ছ্বাসে ঝিঁজোর বিষণ্ণ মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠেছিল মাঝে-মাঝে।

পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হল ঝিঁজোর ছবিসুদ্ধ বেশ বড়সড়

প্রতিবেদন। খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরনোর পর থেকেই আমাদের বাড়িতে অজস্র মানুষের ভিড়। কেউ আসছে অটোগ্রাফ নিতে, কেউ আসছে অভিনন্দন জানাতে, আবার কেউ-বা শুধু চোখের দেখা দেখতে। শুভেচ্ছা আর ভালবাসার স্রোতে যেন ডুবে গেল ঝিঁজো।

শুধু এর মধ্যে একজনেরই মুখভার। সে হল পাপিয়া। সমস্ত অনুষ্ঠানটাই ও দেখল প্রায় নিঃশব্দে। কিন্তু স্টেজ থেকে নেমে এসে ঝিঁজো প্রথমেই ধরল পাপিয়ার হাত। ঝিঁজো এখনও আমাদের ভাষায় ভাল করে কথা বলতে পারে না। অথচ ওর হাত-ধরা, ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, পাপিয়াকে ও নিজের বন্ধু হিসেবে চাইছে। ঝিঁজো বুঝতে পারে, পাপিয়া ওকে পছন্দ করছে না।

দিনকয়েক পরে সৃজনকাকা বললেন, 'তৈরি থেকো ঝিঁজো, সামনের রোববার পাপিয়াদের স্কুলে তোমাকে আবার শো করতে হবে। ওদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে ধরেছেন—'

সৃজনকাকার কথা শুনে ঝিঁজো খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল, তারপর ঘাড় নেড়ে ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলল, 'না না, আমি পারব না।'

সৃজনকাকা ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'সে কী ! আমি যে কথা দিয়ে দিয়েছি !'

কিন্তু ঝিঁজো ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে বলছে, 'না সৃজনকাকা, আমি পারব না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

কাকার অবস্থা দেখে আমি বললাম, 'দেখি, পাপিয়াকে বলে। ও অনুরোধ করলে হয়তো ঝিঁজো যেতে পারে—'

দোতলায় গিয়ে দেখি, পাপিয়ার হাতে কী একটা বই।

'কী রে পাপিয়া, কী পড়ছিস ?'

বইটা তুলে দেখাল পাপিয়া। দেখলাম, 'ম্যাথ্‌স পাজ্‌ল' নামে একটা বই।

ঠাট্টার সুরে বললাম, 'তুইও কি অঙ্কের পণ্ডিত হবি নাকি !'

'কেন, ঝিঁজো হতে পারলে আমি পারব না !' পাপিয়ার মুখ গম্ভীর।

'কেন পারবি না ? মানুষ চেষ্টা করলে কী না পারে ! এই ঝিঁজোকেই দেখ না। কিছুদিন আগেও তো ঝিঁজোকে কেউ জানত না, চিনতও না। আমরাও ভাবতাম ওর বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। তেমনই তুইও—'

এতক্ষণে হাসি ফুটল পাপিয়ার মুখে।

তখন গলার স্বর নামিয়ে বললাম, 'এই শোন, একটা কাজ করতে হবে তোকে। সামনের রোববার তোদের স্কুলে ঝিঁজোর একটা শো হওয়ার কথা। তোদের প্রিন্সিপ্যালকে কাকা কথা দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখন ঝিঁজো বেঁকে বসেছে। বলছে, ও যেতে পারবে না—'

অদ্ভুত নির্লিপ্ত স্বরে পাপিয়া বলল, 'কিন্তু ঝিঁজো যাবে কি যাবে না, সেটা ওর ব্যাপার। এ-ব্যাপারে আমি কী করব ?'

'না রে, তোর অনেক কিছু করার আছে। আমি আর সৃজনকাকা দুজনে মিলে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু ও কিছুতেই মানছে না। আমি জানি, একমাত্র

তুই বললেই হয়তো যাবে। প্লিজ, একবার বল—'

'কিন্তু—'

'হ্যাঁ, একবার অন্তত বলে দ্যাখ। বুঝতে পারছিস না, এর সঙ্গে সৃজনকাকার প্রেস্টিজ জড়িয়ে আছে। তোদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে উনি কথা দিয়েছেন। এখন যদি ঝিঁজো না যায়, তবে কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে বল তো। তুই একবার অন্তত সৃজনকাকার কথা ভেবে এই কাজটা করে দে—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পাপিয়া বলল, 'ঠিক আছে, দাদা। তোরা যখন এত করে বলছিস—'

এরপর পাপিয়া যখন ঝিঁজোর হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে যেতেই হবে, ঝিঁজো। না হলে আমি কী করে স্কুলে মুখ দেখাব বলো তো,' তখন ঝিঁজো আর আপত্তি করতে পারল না।

ঝকঝকে মুখে ঝিঁজো বলল, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই যাব।'

রোববারে স্কার্ট ছেড়ে পাপিয়ার শাড়ি পরে কপালে টিপ লাগিয়ে ঝিঁজো যখন এসে দাঁড়াল, তখন উচ্ছ্বাসের গলায় আমি বলে উঠলাম, 'বাঃ, আজ তোমাকে দারুণ লাগছে ঝিঁজো। একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়ে। সবাই দেখে চমকে যাবে—'

'সত্যি বলছ !' ঝিঁজোর মুখে লাজুক হাসি।

সেদিন বিকেলে পাপিয়াদের স্কুলে অ্যাসেম্বলি হলে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। শহরের গণ্যমান্য অতিথিদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে। আশেপাশের সমস্ত মানুষজন যেন ভেঙে পড়েছে ঝিঁজোকে একবারের মতো অন্তত চোখে দেখার জন্য।

অনুষ্ঠান শুরু হল পাপিয়াদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মীরা দেবীর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে। এরপর সৃজনকাকা ঝিঁজোর সঙ্গে উপস্থিত মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিলেন দুরন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে।

দর্শকদের পাঠানো অঙ্কের প্রবলেমের স্লিপ দিয়ে শুরু হল ঝিঁজোর অনুষ্ঠান। গত অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতার পর এবার ঝিঁজো অনেক বেশি অভিজ্ঞ, পরিণত। প্রত্যেকটি প্রশ্ন ওকে পড়ে শোনাচ্ছেন সৃজনকাকা। ঝিঁজোর ভাবতে সময় লাগছে বড়জোর চার-পাঁচ সেকেন্ড। তারপর খচখচ করে উত্তরটা লিখে ফেলছে ব্ল্যাকবোর্ডে।

বাবা, মা, পাপিয়া তিনজনেই এসেছে। ওদের সিট দর্শকদের প্রথম সারিতে। আমি অবশ্য স্টেজে সৃজনকাকার পাশে। কখন কোন দরকার হয় কে জানে !

অনুষ্ঠান প্রথম আধঘণ্টা বেশ ভালভাবেই চলল। কিন্তু তারপরই যেন গণ্ডগোলের শুরু।

এক দর্শকের প্রশ্ন ঝিঁজোকে পড়ে শুনিয়েছেন সৃজনকাকা। কিন্তু আর পাঁচ

সেকেন্ড নয়, উত্তরটা ভাবতে ঝিঁজো এবার যেন বেশি সময় নিচ্ছে। কুড়ি সেকেন্ড পেরিয়ে গেছে, অথচ ঝিঁজো পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে। ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগোবার কোনও লক্ষণ নেই।

দর্শকদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন, কোলাহল। 'এই প্রশ্নটা তাহলে বুঝি পারল না...পারছে না...ফেল করেছে...' ইত্যাদি নানা স্বরের অস্ফুট মন্তব্য। হঠাৎ ওলিম্পিক জাম্পারের মতো লাফ নিয়ে স্টেজ থেকে নামল ঝিঁজো। তারপর এক ছুটে পাপিয়ার সামনে। পাপিয়া আর মাকে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিল।

স্টেজ থেকে ওর লাফিয়ে নামা, তারপর এক টানে ওদের দূরে সরিয়ে দেওয়া—এ সবকিছু ঘটল এক সেকেন্ডের কম সময়ে। এসব দেখে কে বলবে এই একটু আগেই ঝিঁজো সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতো টিপ পরে দাঁড়িয়ে ছিল। এই মুহূর্তে ওকে দেখে অরণ্যদেবের কথাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল আমার।

কিন্তু তারপরেই যা ঘটল, তা দেখে আমরা সবাই তাজ্জব, হতভম্ব।

পাপিয়া যে সিটে বসে ছিল, তার ঠিক ওপরের ফ্যানটা হঠাৎ সিলিং থেকে ভেঙে পড়ল একেবারে পাপিয়ার সিটের ওপর। পাপিয়া ওখানে বসে থাকলে যে কী হত তা ভাবতেই শিউরে উঠলাম। সমস্ত ব্যাপার দেখে পাপিয়াও ভয় পেয়ে কাঁপতে-কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে-সঙ্গে জল, পাখা, বরফ নিয়ে আমাদের ছুটোছুটি।

চোখ মেলেই পাপিয়ার প্রথম প্রশ্ন, 'ঝিঁজো কোথায় ?' পাপিয়ার গলার স্বরে বন্ধুত্বের গাঢ় আমেজ। কিন্তু পাপিয়াকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যে বাঁচাল, সেই ঝিঁজো যে এখন কোথায় তার খোঁজ আমরা কেউ রাখিনি।

ঝিঁজোর খোঁজে আমরা যখন এদিক-ওদিক ছুটছি, এমন সময় হঠাৎ বাথরুমের দিক থেকে এক বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল।

সৃজনকাকা চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'বাদল, শিগ্‌গির ছুটে আয়—'

আমরা সবাই ছুটলাম বাথরুমের দিকে।

গিয়ে দেখি বাথরুমের ভেতরে পড়ে আছে ঝিঁজো। গলার কাছটা আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কী, ঝিঁজো পুড়ে গেল কী করে ? কেউ কি—'

সৃজনকাকা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঝিঁজোর শর্ট সার্কিট হয়েছে—'

'শর্ট সার্কিট ! সে কী !'

'আসলে ঝিঁজো ছিল এক রোবট, যা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। হয়তো ভিন গ্রহ থেকে ওকে কেউ পাঠিয়েছিল পৃথিবীর খবরাখবর নেওয়ার জন্য। ওই যে ওর চোখের সবুজ মণি জ্বলত আর নিভত, তা অনেকটা ক্যামেরার শাটারের মতো। ওই চোখের ক্যামেরা দিয়েই ঝিঁজো এখানকার সব ছবি পাঠাত নিজের গ্রহে। আসলে বোধহয় নিজেদের গ্রহের জিনিসপত্র সব ফুরিয়ে

আসছিল—'

সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো অবাক ! বিস্ময়ের সুরে আমি বলি, 'কিন্তু হঠাৎ ওর শর্ট সার্কিট হল কী করে ?'

সৃজনকাকা বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আসলে নিজের প্রোগ্রাম আর পাপিয়ার মাথার ওপরে ঘুরন্ত ফ্যান ভেঙে পড়া—এই দুটো জিনিস নিয়ে একসঙ্গে ভাবতে গিয়ে ওর ভেতরের ট্রান্সফর্মারটাই জ্বলে-পুড়ে গেছে—'

'না না, এসব আমি বিশ্বাস করি না। ঝিঁজো ছিল আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। কিন্তু আমি ওকে ভুল বুঝেছি। ঝিঁজো তুমি চোখ মেলো, ক্ষমা করো—' বলে পাপিয়া ঝিঁজোর সাড়হীন শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়ে আকুল কান্নায়।

ছবি : বিমল দাস

নেশা

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়



ক্যাঁ-চ— ! বিশ্রী আওয়াজ তুলে ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল। সামনে যে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। মানুষের চেহারা এত বীভৎস হতে পারে ! ভূতে আমি বিশ্বাস করি না—কিন্তু যদি করতাম তাহলে নিশ্চয় এই জনপ্রাণীহীন আধাপোড়ো বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে অন্য কিছু ভাবতে পারতাম না। কাঠির মতো রোগা শরীর, যেন হাড়ের ওপর একটা পাতলা চামড়া জড়ানো, কোটরগত চোখ দুটো মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাসে, নীচের ঠোঁটটা সামনে ঝুলে পড়া, গায়ের রঙ কালো, পরনে শুধু একটা আটহাতি কাপড় ছাড়া কিছুই নেই। ওই চেহারা দেখে বয়েস কত তাও জানা যায় না। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে দরজার একটা পাল্লা ধরে ও দাঁড়িয়ে আছে।

গলাটা ঝেড়ে বললাম, 'আজ রাতের মতো একটু জায়গা হবে ? মানে, গাড়িটা পথে খারাপ হয়ে গেছে। আশপাশেও তো কোনও জনবসতি দেখতে পাচ্ছি না।'

'ভেতরে আসুন।—' ওর গলার স্বরও কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে। কিন্তু আমার তখন আর অন্য কিছু ভাবার সময় কোথায় ? এই অবস্থায় আমার সবথেকে বেশি যেটা দরকার তা হল কয়েক ঘণ্টা টানা বিশ্রাম। লোকটার পিছু-পিছু ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে। বাড়িটা যে বহুদিনের পুরনো তা সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও বাইরে থেকে বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এখন গেট পেরুতেই চোখে পড়ল বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা বাগান। মানে কিছুদিন আগেও হয়তো সুন্দর বাগান ছিল—এখন সেটা গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ের জংলা জায়গা বলাই ঠিক।

আমি নিঃশব্দে লোকটাকে অনুসরণ করে চলেছি। আর লণ্ঠনটা এক হাতে দোলাতে-দোলাতে ঠিক যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে লোকটা। শরীরটা ওর অমন হলে কী হবে, চালচলন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। আমার শরীরের ভেতরটা একবার শিরশির করে উঠল।

গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা গন্ধ নাকে ভেসে এল। তীব্র বুনো এক ধরনের গন্ধ। অচেনা, কিন্তু কেমন যেন নেশা ধরানো।

লোকটার পিছু-পিছু বাগান পেরিয়ে সামনের ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে চললাম। ওখানে বাগানের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে একটা একতলা বাড়ি। সামনের দিকে পাশাপাশি দুটো ঘর দেখা যাচ্ছে। পিছনে আরও আছে কিনা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

নিজের ওপরই বিরক্তি জাগল। মোটরে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার মতলব করার আগে গাড়িটা আরও ভালভাবে 'চেক' করার দরকার ছিল। তাহলে পথের মাঝে এই জনমানবহীন জঙ্গুলে জায়গায় সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার মুখে আচমকা টায়ার ফেটে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হত না। আসলে বহুদিন বাদে হঠাৎ বন্ধুর আমন্ত্রণ পেয়ে দেরি করতে আর তর সয়নি, এবং দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন বোধহয় এইভাবেই আসে। স্থান-কালের হিসেব থাকে না।

তবে এত সহজে দুর্ভাগ্যকে মেনে নেওয়া আমার ধাতে নেই। নিকটবর্তী করিমপুর ছাড়িয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার এসে এই জায়গাটায় হঠাৎ যখন গাড়ি বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম ঠিকই। তারপর অবশ্য দূর থেকে এই আধাপোড়ো বাড়িটা আবিষ্কার করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। ভেবে দেখেছিলাম খোলা রাস্তায় গাড়িতে বসে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার কিংবা অন্য কোনও অজানা বিপদের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে ওই পোড়ো বাড়িতে ঢুকে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই কম বিপজ্জনক। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এমন জনবসতিহীন অঞ্চলে এই পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়িতে কোনও মানুষ বাস করতে পারে, এমন ধারণা আমার হয়নি।

লোকটা আমায় নিয়ে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। লণ্ঠন নিয়ে লোকটা ঘরের ভেতরে ঢুকতেই সারা ঘরটা দৃশ্যমান হল। বেশ বড়সড় ঘর। বাগানের দিকে দুটো জানলা। পুরনো আমলের একটা দেওয়াল আলমারি, র‍্যাক—সেগুলোতে বই ঠাসা। এছাড়া আরও কিছু দ্রব্য-সামগ্রী। ঘরের জানলার ধার ঘেঁষে একটা সেকেলে খাট, অন্যধারে টেবিল, খানতিনেক চেয়ার। ঘরের আসবাবপত্র কিংবা সাজসরঞ্জাম যেন ঠিক এই জনমানবহীন অঞ্চলের পোড়ো বাড়ির সঙ্গে কেমন বেমানান।

ঘরের দোরগোড়ায় আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা একঘেয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় ডাকল, 'কই, ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর পা দিলাম। হারিকেনটা টেবিলের ওপর রেখে লোকটা এতক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। দাঁতের পাটিদুটো উঁচু, এর ওপর

চোয়াড়ে ভাঙা মুখ—তাই হাসতেই বীভৎসভাবে সমস্ত দাঁতগুলো ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। আমার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলাম।

হঠাৎ সে বলল, 'এ-বাড়িতে আমি একাই থাকি। এ-বাড়ির কেয়ারটেকার।'

আমি তখন হারিকেনের স্বল্প আলোয় ঘরের ভেতরটা চোখ বুলোচ্ছিলাম। এবার লোকটার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে বললাম, 'তোমার নাম কী ?'

'জগদানন্দ।'

আমি ততক্ষণে র‍্যাক থেকে একটা বই নামিয়ে হারিকেনের আলোর সামনে নিয়ে এসেছি। বইয়ের মলাটটা উলটে পাতার দিকে চোখ রেখে বললাম, 'ডঃ আর. শ্রীনিবাসন কার নাম ?'

'কেন, বাবুমশাই ?—' কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে কেয়ারটেকার জগদানন্দের কণ্ঠস্বরটা কেঁপে গেল না ?

'এই বইতে নাম দেখছি।' র‍্যাকের আরও দু-একটা বইতে, একই নাম দেখলাম।

'ওঃ—' এবার বেশ নিশ্চিত হয়েই সে জবাব দেয়, 'উনিই তো এ-বাড়ির মালিক। নামকরা বিজ্ঞানী।'

হ্যাঁ, নামটা যেন কোথায় দেখেছি। ডঃ আর. শ্রীনিবাসন। খবরের কাগজে কী ? 'তা উনি গেলেন কোথায় ?'—প্রশ্ন করি আমি।

'যাওয়ার সময় বললেন কোথায় যেন মিটিং-এ যেতে হবে। তা প্রায় মাসখানেক আগে। তারপর আর ফেরেননি।—' জগদানন্দ বেশ সহজভাবেই জবাব দেয়।

হতেও পারে। ভাবলাম আমি। ডাক্তার, বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স কিংবা মিটিং-এ যোগদান করা আশ্চর্য তো কিছু নয়। ভাবনাটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করি। এ-জায়গাটা এত নোংরা কেন ? দেখে মনে হয় এ-বাড়িতে যেন কতকাল মানুষের পা পড়েনি। এমনকি, ঘরের মধ্যেও এখানে-সেখানে ধুলোর পলস্তারা পড়ে আছে। সবটাই ভৌতিক নয় তো ?

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, এমন সময় জগদানন্দ বলল, 'আজ রাতটা এ-ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারেন। ভয় করবে না তো ?'

'ভয় ! কেন ?'—আমি জগদানন্দেব মুখের দিকে তাকাই।

'মানে, অচেনা জায়গা...আমি অবশ্য থাকব পাশের ঘরেই।'

'আচ্ছা, জগদানন্দ— ?—' ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বলি।

'বলুন।'

'এই বাড়িতে সত্যিই তুমি একা থাকো ? সম্পূর্ণ একা ?'

'হ্যাঁ, থাকি একাই...তবে কিনা...' কী যেন বলতে গিয়েও থমকে যায় জগদানন্দ।

'তবে কিনা...কী ? বলো।' ওর চোখে চোখ রেখে আমি জেরা করার চেষ্টা করি। লোকটাকে প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন বেখাপ্পা, রহস্যজনক মনে



হঠাৎ মনে পড়ল, কোমরের পাশে গোঁজা ভোজালিটার কথা। ওটা আজ সঙ্গে নিয়েই শুয়েছিলাম। চকিতে বার কয়েক কোপ লাগালাম শুঁড়টার ওপর। চটচটে কালো তরল পদার্থ বেরিয়ে এল ওটা থেকে।

হয়েছে।

'আপনি বসুন, আমি বরং আপনার জন্যে খাওয়ার বন্দোবস্ত করি।—' জগদানন্দ বোধহয় আমার প্রশ্নটাকে চাপা দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'না, না, কোনও দরকার নেই,—' আমি বাধা দিই : 'সঙ্গে আমার টিফিন কেরিয়ারে টোস্ট, ডিম, মিষ্টি যথেষ্টই আছে। গাড়িতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার কথা ভেবেই নিয়ে এসেছিলুম। তুমি বরং আমার দু-একটা কথার জবাব দাও।'

'আপনার সব কথার জবাব দেব, বাবু। কিন্তু আজ রাতে আপনি আমার অতিথি, কিছু তো খাওয়াতেই হবে। আপনি একটু বসুন, আমি বরং এক গ্লাস শরবত করে আনি।'

'শরবত! এত রাত্রে।'—আমি অবাক হই।

'হ্যাঁ, শরবত।'—জগদানন্দ একটু থেমে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'ডঃ শ্রীনিবাসনের নিজস্ব ফরমুলায় তৈরি। দারুণ সুস্বাদু। ভয় নেই, বিষ খাওয়াব না।'—বলতে-বলতে প্রায় ক্ষিপ্রপদেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

লোকটা ভারি অদ্ভুত তো! হঠাৎ শরবত খাওয়াবার জন্য এত জেদাজেদি করছে কেন? নানারকম চিন্তা মাথায় আসে। শরবতের নামে বিষ খাওয়ানোই কি ওর আসল উদ্দেশ্য? কিন্তু এজন্য শরবতের প্রয়োজন কী? আমি একা, সম্পূর্ণ অসহায় এই আধাপোড়ো বাড়িটাতে ওর হাতের মুঠোর মধ্যে—ও তো যে-কোনও উপায়েই আমাকে খুন করতে পারে। হঠাৎ মনে হল, জগদানন্দকে এত খারাপ মানুষই বা ভাবছি কেন? চেহারাটা সকলেরই কন্দর্পকান্তি হয় না—তারা সবাই কি চোর, ডাকাত, বদমাশ? বরং এমনও তো হতে পারে, আসলে ও সত্যিই ভাল, অতিথিবৎসল। এ-জঙ্গলে একা বাড়ি পাহারা দেয়। হঠাৎ একজন সঙ্গী পেয়ে খুশি হয়েছে। তাই যে-কোনওভাবে অতিথিসৎকার করতে চাইছে। এখন ও শরবত নিয়ে আসতে গেছে। ডঃ শ্রীনিবাসনের নিজস্ব কোনও ফরমুলায় বানানো। চিন্তা করতেই হঠাৎ মনে পড়ল ডঃ আর. শ্রীনিবাসনের কথা। বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

তাহলে কি এই জঙ্গুলে জায়গায় এই পোড়ো বাড়িটাই তাঁর গবেষণাগার? উদ্ভিদবিজ্ঞানী বনেজঙ্গলে নিভৃতে গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন—এতে আর আশ্চর্য কী!

ভাবতেই সমস্ত ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন বেশ কিছুটা স্বস্তি অনুভব করি।

জগদানন্দ ঘরে ঢুকল। হাতে একট ঢাউস কাচের গ্লাসে ভরতি সবুজ রঙের শরবত, আর একটা প্লেটে কিছু কুচো ফলপাকুড়।

'এই শরবত যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই সুস্বাদু। একবার খেলে আর এক গ্লাস খেতে ইচ্ছে করবে।'—জগদানন্দ বিশ্রীভাবে ওর দাঁতের পাটিদুটো বার করে নিঃশব্দে হাসল।

'কিন্তু সঙ্গে আবার ফলের কুচি কেন ?'

'এই বনবাদাড়ে আপনাকে আর কী খাওয়াতে পারি, বলুন। —' জগদানন্দ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বিনয়ী হতে চাইল।

একটু আগে যদিও অনেক কিছু ভেবেছি, এমনকি জগদানন্দ লোকটা ভাল হতে পারে এমন সার্টিফিকেটও মনে-মনে দিয়ে দিয়েছি, তবু শরবত হাতে নিয়ে মনটা যেন কেমন করে উঠল। ওর মুখের দিকে তাকালাম। ভাবলেশহীন। সত্যিই কোনও মতলব নেই তো লোকটার ?

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধির একটা চমক খেলে গেল। জগদানন্দকে বললাম, 'ফল আমার দরকার নেই, বরং এসো, শরবতটা দুজনে ভাগ করে খাই। তুমি ওই প্লেটে কিছুটা ঢেলে খেয়ে নাও। এত ভাল স্বাদ যখন, তুমিই-বা বাদ যাবে কেন ?'

নিঃশব্দে হাসল জগদানন্দ। ও কি আমার চালাকি টের পেয়েছে ? কিন্তু ও কিছু না বলে গ্লাস থেকে প্লেটে কিছুটা শরবত ঢেলে এক চুমুকে পান করল। তারপর প্লেটটা ঠিক করে টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এবার তো বাবুমশাইয়ের শরবত খেতে আপত্তি হবে না ?'

ভীষণ লজ্জায় পড়লাম। এভাবে ঠকে যাব, ভাবিনি। এবার আর দ্বিধা না করে গ্লাসের অবশিষ্ট শরবত এক নিঃশ্বাসে পান করলাম।

সত্যিই অপূর্ব স্বাদ। এত মিষ্টি অথচ চমৎকার আমেজধরা শরবত জীবনে কখনও পান করিনি আমি। তবে বাড়িতে ঢুকতেই যে-বুনো নেশাধরা গন্ধটা নাকে লেগেছিল, এই শরবতে সেটা আরও তীব্রভাবে পেলাম। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। মাথার ভেতরে কেমন যেন একটা হালকা ঝিমুনি বোধ করছি। অনেকটা দুর্গাপুজোর বিজয়ার রাতে সিদ্ধির নেশার মতো—কিংবা তাও নয়, অন্য ধরনের। ঠিক ভাবতে পারছি না—তবে কি শরবতের মধ্যে মাদক জাতীয় কিছু মেশানো ছিল ?

জগদানন্দ আমার দিকে তার বিশ্রী ক্ষয়া দাঁতের পঙ্‌ক্তিগুলো বার করে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'আপনি কী যেন আমায় জিজ্ঞেস করবেন বলছিলেন।'

লোকটা কি আমার অবস্থা বুঝতে পারছে না ? না কি জেনেশুনেই পরীক্ষা করতে চাইছে, তার শরবতের প্রতিক্রিয়া আমার ওপর কেমন হল। এদিকে ঝিমুনিটা ক্রমেই বাড়ছে—কিন্তু সেইসঙ্গে শরবতের মিষ্টি স্বাদটাও জিভে জড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে আর এক গ্লাস চেয়ে খাই।

বুঝতে পারলাম, একটা নেশাড়ে লোকের মতো নিজের ওপর ক্রমেই আস্থা হারাতে শুরু করেছি। একটা ঘুম-ঘুম ভাব দু চোখের পাতায় ভর করেছে। আমি নিশ্চিত—এ-সবই সেই শরবতের ক্রিয়া। কিন্তু এভাবে আমাকে নেশাচ্ছন্ন করে ওর লাভ কী ? প্রাণে না মেরে সর্বস্ব অপহরণ ? কিন্তু কাল সকালে যখন আমার নেশা কেটে যাবে—তখন ওকে বাঁচাবে কে ? নাঃ, কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

হঠাৎ বড্ড গরম হতে শুরু করেছে। কুলকুল করে ঘামছি। ঘরের দুটো জানলা। একটা খোলা। অন্য যেটা বাগানের দিকে—বন্ধ। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। জানলাটা টেনে খুলতে যাব, হঠাৎ জগদানন্দ লাফিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল : 'বাবুমশাই, ওই জানলাটা খোলা যায় না। বাইরে থেকে বন্ধ।'

'কিন্তু কেন ? আমার গরম হচ্ছে। ওদিকে তো বাগান। জানলাটা খুলতে অসুবিধে কী ?—' আমার কণ্ঠের বিস্ময় চাপা থাকে না।

'সব অসুবিধে সবাইকে বলা যায় না, বাবুমশাই—বিশেষত সে যদি এ-বাড়ির রাতের অতিথি হয়—।'

চমকে তাকিয়ে দেখলাম জগদানন্দের চোখের ভাষা কেমন যেন বদলাতে শুরু করেছে। অল্প আলোতেও দীপ্ত হয়ে উঠেছে ওর চোখের দৃষ্টি।

আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। মাথার ভেতরটা ধীরে-ধীরে অবশ হয়ে আসছে। আমি কখন সম্পূর্ণ অবশ হয়ে পড়ব জগদানন্দ কি সেই আশাতেই বসে আছে ? ঠিক যেমন মাকড়সা বসে থাকে জালের মধ্যিখানে—জালে-পড়া পতঙ্গটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—কখন সে একেবারে অবশ হয়ে পড়বে, সেই আশায়।

নাঃ, এ হতে পারে না। আমি নিখিলেশ সেন। এখনও রীতিমতো দেহচর্চা করি। কোমরের কটিতে এই মুহূর্তেও লুকনো আছে আমার প্রিয় ধারালো ভোজালিটা। এত সহজে হার আমি মানব না। কিন্তু আপাতত কী করতে পারি আমি ?

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম। এই ফাঁদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় এই ঘরের দরজা বন্ধ করে রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দেওয়া। একবার সকাল হয়ে গেলে ওর কোনও মতলবই আর খাটবে না—এ-বিশ্বাসটুকু আমার আছে।

একটা হাই তুলে বললাম, 'জগদানন্দ, তোমার আর এখন এ-ঘরে থাকার দরকার নেই। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি আর বসতে পারছি না।'

জগদানন্দ কি খুশি হল আমার কথা শুনে ? বোঝা গেল না, কিন্তু না বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ও ঘর ছেড়ে চলে যেতেই হারিকেনের আলোটা আর-একটু উসকে দিয়ে সারা ঘরটা আর-একবার ভাল করে দেখে নিলাম। বেশ কিছুদিন অব্যবহৃত। একজন বেহিসেবী, জ্ঞানী লোকের ঘর যেমনভাবে থাকা উচিত তেমনই আছে সবকিছু। সন্দেহজনক বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। কেবলমাত্র বাগানের দিকের ওই বন্ধ জানলাটা ছাড়া। কয়েকবার চেষ্টা করেও জানলাটা খোলা গেল না। বাইরে থেকে শক্তভাবে আঁটা। মনে পড়ল একটু আগে জানলা খোলার ব্যাপারে জগদানন্দের ঘোরতর আপত্তির কথা। অথচ কারণটা কী, সে বলেনি।

রহস্যের জট ক্রমেই পাকিয়ে যাচ্ছে।

দুরে কোথা থেকে একটা ক্ষীণ 'দুম-দুম' শব্দ ভেসে এল।

কোথাও যেন কেউ প্রচণ্ডভাবে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। শব্দটা এখানে আসার পর আরও কয়েকবার শুনেছি—কিন্তু নানা চিন্তার মধ্যে খেয়াল করিনি। কান পাতলাম। শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। একটু পরে আবার শোনা গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করেও ওটা কিসের আওয়াজ বুঝতে পারলাম না। শেষে মনকে বোঝালাম, এ-বাড়ির অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে ওটাও একটা। পরদিন সকাল না হলে টের পাওয়া যাবে না।

কিন্তু চোখ দুটো যে আমার জুড়ে আসছে! সকালের অপেক্ষায় জেগে বসে থাকা আমার পক্ষে আদপেই সম্ভব নয়। সারাদিনের ক্লান্তি, তার ওপর শরবতের নেশা—আমার জেগে থাকার শেষ শক্তিটুকুও যেন শুষে নিচ্ছে। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

খাটটা সেই বন্ধ জানলাটার ধারেই। একটু ইতস্তত করেও মন থেকে আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে খাটে উঠে শুয়ে পড়লাম। হারিকেনটা টেবিলের ওপর জ্বালাই রইল। শোয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। রাত কত, কে জানে। হারিকেন নিভে গেছে। একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি। খাটের ওপর উঠে বসতে গেলাম। মাথা প্রচণ্ড ভার। কিন্তু ভীষণ তেষ্টা। জোর করে উঠতে গিয়েই কিসের যেন স্পর্শ পেলাম। হিলহিলে রোঁয়া-রোঁয়া কী যেন আমার দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কী ওগুলো? অনেকটা সাপের মতো শরীর—কিন্তু সাপ বা কোনও চেনা সরীসৃপ তো নয়!

হঠাৎ পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল খাটের ধারের সেই জানলাটা হাট করে খোলা। কেউ কি বাইরে থেকে খুলে দিয়েছে? আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ, একটা হালকা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। তার কিছুটা ঘরের মধ্যেও। সাপের মতো সেই লকলকে বিচিত্র শুঁড়গুলো এগিয়ে আসছে জানলার বাইরে থেকে, অসংখ্য। অন্ধকারটা চোখে কিছুটা সয়ে যেতে বুঝতে পারলাম—ওগুলোর রঙ সবুজ, গায়ে হালকা রোম। শুঁড়ের ডগার কাছে শুঁয়োগুলো বেশ বড়সড়—কিন্তু ওগুলো কী? কী জাতীয় প্রাণী? আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, সাবধান! ওগুলো মারাত্মক কোনও কিছু।

ছিটকে সরে যাওয়ার আগেই একটা শুঁড় এসে ঠিক সাপের মতো পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরল আমার ডান পা-টা। এ কী দারুণ বিপদে পড়লাম, হে ভগবান! হঠাৎ মনে পড়ল, কোমরের পাশে গোঁজা ভোজালিটার কথা। ওটা আজ সঙ্গে নিয়েই শুয়েছিলাম। চকিতে বার করেই কোপ লাগালাম শুঁড়টার ওপর। চটচটে কালো তরল পদার্থ বেরিয়ে এল ওটা থেকে। শুঁড় আলগা হল। কিন্তু ততক্ষণে আর-একটা শুঁড় জড়িয়ে ধরেছে আমার কাঁধের কাছটা। আর-একটা কিলবিল করে এগিয়ে আসছে কোমরের দিকে। আমি তখন প্রাণপণে

ভোজালিটা চালিয়ে একটার পর একটা শুঁড় কাটবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু শুঁড় যে অসংখ্য—আরও এগিয়ে আসছে জানলাটার বাইরে থেকে—আরও—কিন্তু এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি আসলে ওগুলো কী।

শরীরটা ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছে—কয়েকটা শুঁড় আমার শরীরটাকে যেন শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে—কিছুতেই আর ছাড়ানো যাচ্ছে না। ওগুলোর ডগা অমন লালচে হয়ে উঠছে কেন ? ওগুলো কি তাহলে আমার রক্ত শোষণ করছে ? ভাবতেই শিউরে উঠলাম।

'দুম-দুম' আওয়াজটা দূর থেকে আবার শোনা গেল। সেইসঙ্গে কী যেন একটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ। মাথার মধ্যেটা আবার ঝিমঝিম করতে লাগল।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল জানলার বাইরে। অন্ধকারে চোখ তখন অনেক সয়ে এসেছে। জানলার পাশেই একটা মোটা গাছের গুঁড়ির মতো কী রয়েছে—সেখান থেকেই শুঁড়গুলো জানলা গলে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। জানলা গরাদেহীন। ওই অবস্থার মধ্যেও একটু-একটু যেন অনুমান করতে পারছি—ওটা নিশ্চয়ই কোনও হিংস্র মাংসভুক গাছ। রাতের অন্ধকারে জানলা খুলে আমার দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চোখ পড়ল গাছটা থেকে একটু দূরে। জগদানন্দ দাঁড়িয়ে আছে না ? ওর বীভৎস মুখ এখন আরও হিংস্র দেখাচ্ছে। জ্বলজ্বলে চোখ দুটো আমার দিকেই নিবদ্ধ।

মনে পড়ল স্ত্রীর কথা, ঘরে রেখে আসা দু-বছরের ছেলে টুটুলের কথা, মায়ের কথা—এদের আর কোনওদিন দেখতে পাব না। কেউ জানতে পারবে না কোথায় কীভাবে হারিয়ে গেছি আমি। দু-ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের কাছে—নোনতা স্বাদ পেলাম। ভগবানকে একবার ডাকলাম অস্ফুট স্বরে।

হঠাৎ একটা গুলির শবদ।

খুব কাছেপিঠে শব্দটা হয়ে অন্ধকার স্তব্ধতাকে যেন চুরমার করে দিল। চমকে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি জগদানন্দ ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠে ছুটতে গিয়েই দিশেহারা হয়ে আছড়ে পড়ল জানলার ধারের ক্ষুধার্ত মাংসভুক গাছটার ওপরে। নিমেষে ম্যাজিকের মতো আমার শরীর থেকে শুঁড়গুলো খুলে গিয়ে হিলহিল করে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর চোখের পলকে ওগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল জগদানন্দের শরীরটা।

আমি আচ্ছন্নের মতো বিছানায় পড়ে ছিলাম।

হঠাৎই দরজায় করাঘাতের শব্দ। সেইসঙ্গে পরিষ্কার ইংরেজিতে উত্তেজিত গলায় স্বর : 'দরজা খুলুন ! কে আছেন ? আর ভয় নেই।'

কার গলার স্বর ? তবে যে শুনেছিলাম জঙ্গলের এই আধাপোড়ো বাড়িটাতে জগদানন্দ ছাড়া আর কেউ থাকে না !

করাঘাত বেড়েই চলেছে : 'দরজা খুলুন ! ঈশ্বরের দোহাই !'

নিজের অজান্তেই এক সময় টলতে-টলতে উঠে ঘরের খিলটা খুলে দিয়েছিলাম। তারপর জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ার আগে অনুভব করলাম দুটো উষ্ণ হাত আমায় ধরে ফেলল।

জ্ঞান ফিরেছিল টানা চব্বিশ ঘণ্টা বাদে। চোখ খুলতেই সামনে যাকে দেখলাম, তিনি প্যান্ট-শার্ট পরা, উসকোখুসকো চুল এক বৃদ্ধ। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার সঙ্গে চোখে চোখ মিলতেই প্রসন্ন হাসিতে মুখটা ভরে গেল ওঁর। পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, 'আর ভয় নেই।'

এ তো সেই কণ্ঠ ! আর চিনতে ভুল হল না, ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'আপনিই ডঃ আর. শ্রীনিবাসন ?'

তেমনই প্রসন্ন হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'কিন্তু আর কথা নয়, আপনি এখনও খুবই দুর্বল। আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। আমি ওষুধ দিচ্ছি।'

সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও একটা দিন কেটে গেল। মাংসভুক বিষাক্ত অর্কিড সে-রাতে আমার শরীরের অনেকটা রক্তই শুষে নিয়েছিল।

হ্যাঁ, সে-রাতের ওই সবুজ হিলহিলে শুঁড়গুলো ছিল এক ধরনের রাক্ষুসে অর্কিডজাতীয় গাছের প্রত্যঙ্গ। ডঃ শ্রীনিবাসনই কয়েক বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার এক গভীর জঙ্গল থেকে এ-দুষ্প্রাপ্য গাছের চারাটি সংগ্রহ করে এনে তাঁর ল্যাবরেটরি সংলগ্ন নার্সারিতে রোপণ করেছিলেন। এ-ধরনের ছোটখাটো মাংসভুক অর্কিড দক্ষিণ আমেরিকা এবং পৃথিবীর কোনও-কোনও অংশে খুবই দেখা যায়। এদের নানান বিচিত্র শ্রেণী আছে।

ডঃ শ্রীনিবাসন আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছিলেন :

মাংসাশী পশুর মতো মাংসাশী গাছ তার শিকারকে চিবিয়ে গিলে খায় না। বরং তারা শিকারকে বন্দি করার পর এক ধরনের জারক রস তাদের শরীর থেকে নিঃসৃত হয়। এর সাহায্যে শিকারকে বিয়োজিত করে তারা শুষে নেয়। তবে কোনও-কোনও মাংসাশী গাছের জারক রস থাকে না। তারা বিয়োজনের জন্য জীবাণুদের ওপরে নির্ভর করে। মাংসাশী গাছ কেন যে পোকামাকড় ধরে খায় তার সঠিক কারণ বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না। তবে তাঁদের ধারণা, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলের ঘাটতি আছে এমন মাটিতে বেড়ে ওঠার জন্যেই গাছগুলো খাদ্য হিসেবে পোকামাকড়-প্রাণী বেছে নেয়। এইসব শিকার থেকেই সে প্রয়োজনীয় মৌলের ঘাটতি মেটায়।

'সানডিউ' নামে এক ধরনের পতঙ্গভুক গাছ আছে। এগুলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বেড়ে ওঠে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এই গাছ পাওয়া যায়। তবে অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বেশি। এর কিছু প্রজাতি

উত্তর আমেরিকা ও অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়।

এইসব মাংসাশী গাছ নানাভাবে পোকামাকড় আকৃষ্ট করে তাদের ফাঁদে ফেলে শিকার করে খায়। কিন্তু আমি সে-রাতে যে-ক্ষুধার্ত বৃক্ষটির খপ্পরে পড়েছিলাম তা সত্যিই এক বিচিত্র জাতের রাক্ষুসে মাংসভুক অর্কিড। এই মারাত্মক বৃক্ষের চারাটি হঠাৎই খুঁজে পেয়েছিলেন ডঃ শ্রীনিবাসন। দিনে-দিনে এর আকার এবং ক্ষুধা দুই-ই বেড়েছে প্রচণ্ড। এ-জাতীয় গাছগুলির সাধারণত 'ফোটোসিনথিসিস' পদ্ধতিতে আহার আহরণের পন্থা জানা থাকে না। তাই দরকারমতো অন্য জীবন্ত প্রাণীকে ফাঁদে ফেলে তার শরীরের রক্ত-মাংস হজম করেই সে তার রাক্ষুসে খিদে মেটায়।

ডঃ শ্রীনিবাসনের মুখ থেকে শুনছিলাম তাঁর বিচিত্র রাক্ষুসে অর্কিডের কথা। সমস্ত ঘটনা উনি একে-একে খুলে বললেন। সেগুলো যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই অদ্ভুত।

সে-রাতে 'দুম-দুম' শব্দটা শ্রীনিবাসনই করেছিলেন। গত দু-মাস ধরে জগদানন্দ ডঃ শ্রীনিবাসনকে এ-বাড়িতেই একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছিল।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'কিন্তু কেন ?'

'কারণ আমি ওকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলাম।'—ডঃ শ্রীনিবাসন মুখের পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন।

'কী থেকে আপনি ওকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন ?'—আমি প্রশ্ন করি।

'এক ভয়ঙ্কর নেশা থেকে।'

'নেশা !'—কৌতূহল আমার তীব্র হয়ে ওঠে : 'কিসের নেশা ?'

ডঃ শ্রীনিবাসন এবার উঠে সারা ঘরে পায়চারি করতে-করতে বললেন, 'ওই মাংসভুক বিশেষ অর্কিডটায় এক ধরনের ফুল ফোটে। তার নেশাধরা, তীব্র বুনো গন্ধ। আসলে ওই গন্ধ ছড়িয়েই সে তার শিকারকে আকৃষ্ট করে। জগদানন্দ ওই ফুলের মধুর নেশায় মজেছিল।'

'বলেন কী ?'

'হ্যাঁ, বিচিত্র উপায়ে সে গাছ থেকে ফুল পেড়ে মধু সংগ্রহ করত। তারপর তার মধুটুকু নিংড়ে পান করে আকণ্ঠ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত।'

'আশ্চর্য !' বিস্ময় ও উত্তেজনায় আমি অধীর হয়ে উঠলাম।

ডঃ শ্রীনিবাসন চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'লোকটা চিরকালই নেশাড়ে, কিন্তু অমানুষ ছিল না। অর্কিডের নেশা ওকে অমানুষ করে তুলেছিল। আমি জানতে পেরে ওকে ধমকালাম। ভয় দেখিয়ে ওই মারাত্মক নেশা থেকে ওকে নিবৃত্ত করতে চাইলাম। কিন্তু ফল হল উলটো। একদিন রাতের গভীরে অতর্কিতে আমায় বন্দি করে একটা ঘরে পুরে রেখে ও ওর নেশার দাসত্ব করতে লাগল।'

বাকিটা ডঃ শ্রীনিবাসন বলার আগেই বুঝে নিতে আমার দেরি হল না। অর্কিডের নেশায় বাঁধা পড়েছিল বলেই সবকিছুর বিনিময়ে ওই মারাত্মক

গাছটাকে বাঁচানোই ওর একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল ! কিন্তু জনপ্রাণীহীন এই জঙ্গলে কতদিন আর পাখি কিংবা ছোটখাট জীবজন্তু জোগাড় করে ওই রাক্ষুসে গাছের খিদে মেটানো সম্ভব ! অবশেষে নিজের নেশার রস জোগাড় করতে গাছকে নিজের শরীরের রক্ত নিংড়ে দিয়েও ওর ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি করতে হচ্ছিল—ঠিক এমন সময় এক রাতে আমার প্রবেশ।

জগদানন্দ হাতে যেন স্বর্গ পেল। আমায় ফাঁদে ফেলে গাছের খিদে মেটানোর সমস্ত ব্যবস্থাই সে পাকা করে রেখেছিল। এমন একটা তাজা খাবার দিতে পারলে অন্তত বেশ কয়েকদিন তো ওর পৈশাচিক খিদে মিটিয়ে নিশ্চিন্তে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা যেত। আর এই মতলবেই রাতে আমায় বেহুঁশ করে রাখার জন্য অতিথি সৎকারের নাম করে ওই অর্কিডের ফুলের মধুর শরবতই আমাকে এক গ্লাস খাইয়েছিল জগদানন্দ।

কী নিদারুণ অতিথি সৎকার !

কিন্তু সবকিছুই ভেস্তে গেল একেবারে চরম মুহূর্তে ডঃ শ্রীনিবাসন ঘরের দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসায়। সে-রাতে গুলিটা উনিই ছুঁড়েছিলেন জগদানন্দকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফল হল অভাবিত। হতচকিত হয়ে পালাতে গিয়ে অর্কিডের ওপরই আছড়ে পড়ল লোকটা। আর তার ফলে অর্কিডের জীবন্ত শুঁড়গুলো আমাকে ছেড়ে ওকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল।

সন্ধের একটু আগে ডঃ শ্রীনিবাসনের সঙ্গে পেছনের বাগানের ওই রাক্ষুসে গাছটার কাছে গিয়েই চমকে উঠলাম।

কী বীভৎস দৃশ্য !

গাছটা স্থির হয়ে পড়ে আছে একটা ভরপেট অক্টোপাসের মতো। শুঁড়গুলোয় তখনও লালচে ভাব। আমরা কাছে এগোতেই ওগুলো একটু-একটু করে দুলতে শুরু করল। কিন্তু ওর গোড়ায় ও কে ? একটা ফ্যাকাসে কঙ্কাল কুঁকড়ে গুটিয়ে পড়ে রয়েছে। ও-ই কি জগদানন্দ ?

আমি শিউরে উঠলাম। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠল। বোধহয় পড়েই যেতাম, তার আগেই ডঃ শ্রীনিবাসন আমার কাঁধটা ধরে ফেললেন।

'বি স্টেডি, মিঃ সেন। জগদানন্দ নিজের পাপেই মরেছে। ওর মৃত্যুর জন্যে একমাত্র ও নিজেই দায়ী।'

বলতে-বলতে দূর থেকে গাছটার ওপর কী একটা অ্যাসিড ছুঁড়ে দিলেন ডঃ শ্রীনিবাসন। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল গাছের দেহটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওই রাক্ষুসে অর্কিডের সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলো আলোড়িত হতে শুরু করল ভয়ঙ্কর ভাবে—যেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় ওর শুঁড়গুলো লকলকিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। তারপর একসময় স্থির হয়ে নেতিয়ে পড়ল। আগুন ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু ছাই আর কয়েক টুকরো দগ্ধাবশেষ ছাড়া আর কিছুই পড়ে রইল না সেখানে।

সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডঃ শ্রীনিবাসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

'একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এতদিনে শেষ হল।'

ডঃ শ্রীনিবাসনের কণ্ঠে কি বিষাদের সুর শুনলাম ? আশ্চর্য !

পরদিন যাওয়ার সময় উনি অনেকটা পথ সঙ্গে এলেন।

গাড়িতে বসে স্টার্ট দেওয়ার আগে শেষবারের মতো কৃতজ্ঞচিত্তে বললাম, 'আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। সে-রাতের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আপনি এসে হাজির না হলে...।'

বলতে-বলতে ডঃ শ্রীনিবাসনের দিকে তাকিয়ে থমকে গেছি। ওঁর দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ রয়েছে জংলা বাগানের সেই দিকে, যেখানে এখনও পড়ে রয়েছে সেই রাক্ষুসে অর্কিডের দগ্ধাবশেষ। কিন্তু ওঁর দৃষ্টি এত বিষণ্ণ কেন ? তবে কি যে-দুষ্প্রাপ্য চারাটিকে একদিন বহু দূর থেকে তুলে এনে নিজের হাতে ওই বাগানে রোপণ করে লালন করেছিলেন, ধীরে-ধীরে নিজের অজান্তেই সেই উদ্ভিদকে ভালবেসে ফেলেছিলেন—যদিও তা এক নৃশংস মাংসভুক বৃক্ষ !

এ কি ভালবাসা, না নেশা ? হয়তো জগদানন্দের মতো নয়—তবু এ-নেশা একটা মানুষকে বছরের পর বছর ফেলে রাখে লোকালয় থেকে দূরে কোনও জংলা বাগান-ঘেরা আধাপোড়ো বাড়ির মধ্যে !

এ নেশা প্রকৃতির অজানা রহস্যকে জানার নেশা।

গাড়ি ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। বন্ধুর কাছে গিয়ে পৌঁছব নির্দিষ্ট সময়ের তিনদিন পরে। ওকে যখন গত তিনদিনের সব কথা বলব—ও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না।

ভাববে, একা জঙ্গলের পথে আসার সময় গাড়ি থামিয়ে আমি কোথাও বেহুঁশ হয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম—হয়তো কোনও নেশার ঘোরে !

আপনমনেই হেসে উঠে গাড়ির অ্যাক্সিলারেটরে আরও জোরে চাপ দিলাম।

ছবি : বিমল দাস

বিদিশার নিশা

সঙ্কর্ষণ রায়



বিদিশার এক রাত। রাতের আঁধারের মধ্যে বিদিশার গুহাগুলি পরীক্ষা করছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভানুপ্রতাপ মিশ্র। গুহাগুলির মধ্যে তিনি অতি প্রাচীন চিত্রকলার সন্ধান নিচ্ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমের পাহাড়ী এলাকায় এই অনুসন্ধানের কাজ চালাতে-চালাতে বিদিশায় এসে পৌঁছেছেন তিনি।

এই অনুসন্ধান ভানুপ্রতাপ দিনের আলোয় না করে রাতের আঁধারে করছিলেন, কারণ গুহাব কালো পাথরের পটভূমিকায় আঁকা গুহাচিত্র দিনের আলোয় নিষ্প্রভ, কিন্তু স্বয়ংপ্রভ রঙ দিয়ে আঁকা বলে রাতের আঁধারেই তা প্রকাশ পায়। অতিবেগুনি রশ্মি বিকিরণকারী যন্ত্রের সাহায্যে ভানুপ্রতাপ পাহাড়ের গায়ে তাদের চিহ্ন নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

ভানুপ্রতাপের এই অনুসন্ধানে তাঁকে সাহায্য করছিল তাঁর সহকারী ও ছাত্র এনামুল হক। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই সে গুহার পর গুহার মধ্যে ঢুকে কাজ করছিল এবং অবশেষে গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সেখানে তাঁরা দুজন ছাড়া আর ছিল আঁধার রাতের চৌকিদার করিম বক্স। সে ছিল একটু দূরে তার পর্যবেক্ষণ কামরায়। সেখানে বসে সে তাঁদের দিকে নজর রাখছিল। ভানুপ্রতাপ ও এনামুলকে সে ভাল করেই চেনে, তাঁদের ওপরে নজরদারির দরকারই নেই কোনও। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তাঁদের ওপর থেকে সে নজর সরিয়ে নিতে পারছিল না, কারণ এই তার কাজ।

একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে গুহাগুলি পরীক্ষা করার পর শেষপর্যন্ত তাঁরা দুজনে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। করিম বক্সের মনে হল বুঝি তাঁর কাজ শেষ হয়েছে।

গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছেন তাঁরা, এমন সময় ঘটে যায় একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। হঠাৎ জ্বলে ওঠে এক ঝলক উজ্জ্বল আলো। বোধহয় টর্চলাইটের আলো। করিম বক্স এনামুলের হাতে একটি টর্চলাইট দেখেছিল।

গুহার মধ্যে ঘন-ঘন এই টর্চলাইট জ্বালাচ্ছিল এনামুল। এই আলোয় করিম দেখল যে, একটি বড় আকারের পাথর ভানুপ্রতাপের মাথায় এসে পড়ল। তাঁর কাছাকাছি এনামুল ছাড়া আর কেউই নেই। নিঃসন্দেহে এনামুল টর্চ জ্বেলে এই পাথরটি তাঁর মাথার ওপরে ছুঁড়ে মেরেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠেন ভানুপ্রতাপ এবং নিভে যায় টর্চের আলো। সেদিকে ছুটে যায় করিম বক্স। গিয়ে দেখে, ভানুপ্রতাপের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে আছে। এনামুলকে সে দেখতে পায় না। নিঃসন্দেহে সে পালিয়েছে।

বিদিশার পুলিশ এনামুলকে সার্কিট হাউসে তার ঘরের মধ্যেই পেয়ে যায়। যে ঘরে সে আছে তার পাশের ঘরেই ভানুপ্রতাপ থাকতেন।

পুলিশ ইনস্পেক্টর, তার সহকারী ও তিনজন কনস্টেবল এনামুলকে একটি চেয়ারে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকতে দেখল। তাদের দেখে এনামুল উত্তেজিত স্বরে বলল, 'একটি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে! গুহার সামনে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে বসে ছিল একজন স্টোনম্যান, স্যার ও আমার ওপরে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। পাথর ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলো জ্বলেছে। চোখধাঁধানো আলো। আমি পালিয়ে এসেছি। স্যারও পালিয়েছেন বলে মনে হয়…।'

'না।' এনামুলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল পুলিশ ইনস্পেক্টর এক্রাম আলি, 'আপনার স্যার পালাতে পারেননি। কারণ পাথরটা তাঁর মাথার ওপরেই পড়েছিল। ছুঁড়েছিল যে-স্টোনম্যান, সে আপনি ছাড়া আর কেউই নয়। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নয়, টর্চের আলো জ্বেলে আপনিই পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন ডক্টর ভানুপ্রতাপ মিশ্রের মাথা তাক করে।'

'এ কি বলছেন আপনি!' আর্ত আহত কণ্ঠে বলে উঠল এনামুল, 'আমার পিতৃতুল্য শিক্ষকের মাথায় আমি পাথর ছুঁড়ে মেরেছি! এমন অসম্ভব কথাটি আপনি মুখে উচ্চারণ করলেন কী করে! পাথর যে মেরেছে সে আমার দিকেও তাক করেছিল। দু-তিনটে পাথরের টুকরো আমার মাথায় লেগেছিল বলে আমি আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছি।'

'কেভসের সামনে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের ওয়াচম্যান করিম বক্স স্বচক্ষে আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে দেখেছে। সে-ই বলেছে যে, আপনি টর্চ জ্বেলে…'

'না না, কক্ষনো না! বিশ্বাস করুন, ইনস্পেক্টরসাহেব, স্যার আর আমি, আমাদের দুজনকেই লক্ষ্য করে পাথর মারা হয়েছিল, আমরা দুজনেই ছিলাম স্টোনম্যানের টার্গেট। আমার আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও আঘাত পেয়েছিলাম। মাথায় আঘাত। তার ফলে এখনও আমার মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে…'



গুহা থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছেন তাঁরা, এমন সময় ঘটে যায় একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ...একটি বড় আকারের পাথর ভানুপ্রতাপের মাথায় এসে পড়ল।

এনামুলের মাথার ভেতরটা যতই ঝিমঝিম করুক, তার মাথা পরীক্ষা করে সরকারি ডাক্তার কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান না। ডাক্তারের মতে আঘাতটা তার মানসিক। অধ্যাপকের মাথায় আঘাত হেনে মনে-মনে সে অনুতাপ বোধ করতে শুরু করেছে বলেই হয়তো মাথার মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

'কিন্তু কেন আমি আমার পিতৃতুল্য অধ্যাপককে মারব ?' এনামুল ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'শৈশবেই আমি আমার বাবা ও মাকে হারিয়েছি, তিনিই আমাকে মানুষ করেছেন, বলতে গেলে তিনিই আমার বাবা ও মা, তাঁকে কেন মারব আমি ! কী লাভ আমার তাঁকে মেরে !'

'কী লাভ ?' ইনস্পেক্টর এক্রাম আলি এনামুলের জিনিসপত্র তল্লাশ করে একটি বাক্স থেকে কয়েকটি নয়া প্রস্তরযুগের হাতিয়ার ও পোড়ামাটির মূর্তি খুঁজে পেল। এনামুলের মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে সে বলল, 'লাভ এগুলোই...'

'কিন্তু এগুলো আমাদের গবেষণার জন্যে সংগ্রহ করেছি আমরা। আমাদের কাজ শেষ হলে এগুলি ইউনিভার্সিটির মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করার কথা।'

'আপনার অধ্যাপক তাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি চেয়েছেন তাদের আত্মসাৎ করতে। আত্মসাৎ করে বিদেশি সংগ্রহকারীর কাছে চড়া দামে বিক্রি করবেন ভেবেছেন। তারা তো কাছেই আছে, সাঁচি, বিদিশা আর ভোপালের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আর কোনও কথা নয়, চলুন থানায়...'

গ্রেপ্তার হয়ে থানায় এসে এনামুল বলল, 'শুনুন এক্রাম আলিসাহেব, আমি যে নির্দোষ আপনি তা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'করুন প্রমাণ !' এক্রাম আলি বলল, 'প্রমাণ যদি করতে পারেন যে আপনি নির্দোষ, আপনাকে অবশ্যই ছেড়ে দেব।'

'আমি নিজে পারছি না, এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সাহায্য চাই।'

'কে বিশেষজ্ঞ ? তাঁর নাম-ঠিকানা বলুন, এখনই তাঁকে ডেকে পাঠান।'

'বিশেষজ্ঞের নাম ডক্টর সুবীর সিংহ। কলকাতায় ডক্টর কল্যাণ বসুর ল্যাবরেটরিতে ফরেনসিক এক্সপার্ট। সম্প্রতি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এসেছেন এখানে একটি ফরেনসিক ল্যাবরেটরি গড়ে তোলার ব্যাপারে।'

'তাঁকে তো আমি চিনি। এখনই টেলিফোনে যোগাযোগ করছি তাঁর সঙ্গে...'

তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে সুবীর সিংহকে আহ্বান জানাল এক্রাম আলি। ঘণ্টাচারেকের মধ্যেই বিদিশার থানায় পৌঁছে গেলেন সুবীর।

এক্রাম আলি এবং এনামুল হকের সঙ্গে কথা বলে সুবীর পাথরটি দেখতে চাইলেন। অর্থাৎ, যে-পাথরের আঘাতে ভানুপ্রতাপ প্রাণ হারিয়েছেন, সেই পাথরটি পরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

পাথরটি এক্রাম আলির টেবিলেই ছিল। সে সেটা এগিয়ে দিল সুবীরের

দিকে।

পাথরটি তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ মন দিয়ে পরীক্ষা করলেন সুবীর। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'এটা পাথর হলেও ঠিক পাথর নয়। একজন জিয়োলজিস্টকে দিয়ে এটা পরীক্ষা করাতে চাই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে এটা আমি জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাব...'

'অবশ্যই নিয়ে যাবেন।' এক্রাম আলি বলল, 'কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না এটা পরীক্ষা করে কী লাভ হবে! এই পাথর কি যথেষ্ট শক্ত ও ভারি নয়? এটা কারুর মাথায় ছুঁড়ে মারলে সে কি মারা যাবে না?'

'অবশ্যই মারা যাবে। এই পাথর সাধারণ যে-কোনও পাথরের চেয়ে শক্ত ও ভারি। দেখে মনে হচ্ছে যেন জমাট-বাঁধা লোহা...'

চোখে দেখে সুবীরের যা মনে হল, ভোপালে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তাই শনাক্ত করা গেল। সত্যিই এটা জমাট-বাঁধা লোহা। লোহার সঙ্গে মিশে আছে নিকেল। কিন্তু এটা সাধারণ পাথর নয়, উল্কাপিণ্ড। আকাশ থেকে নেমে এসে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল ভানুপ্রতাপের মাথায়। তার দু-একটা টুকরো এনামুলের গায়েও লেগেছিল, কিন্তু তার কোনও ক্ষতি হয়নি। উল্কাটি নেমে আসার সময় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কিছু দাহ্য পদার্থ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠেছিল। তার আলোকেই করিম বক্স টর্চের আলো ভেবেছিল।

'কিন্তু করিম বক্স তো স্পষ্ট দেখেছিল যে, এনামুল ভানুপ্রতাপের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মেরেছে!'

'ভুল দেখেছিল।' সুবীর বললেন, 'কারণ, ওরকম উজ্জ্বল আলোয় করিমের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার কথা। দাঁড়ান, করিমকে ডেকে প্রশ্ন করছি...'

সুবীরের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে করিম বক্স শেষপর্যন্ত স্বীকার করল যে, উজ্জ্বল আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল!

'চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও তুমি দেখতে পেলে যে এনামুল ভানুপ্রতাপের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারল?' সুবীর প্রশ্ন করেন।

'দেখতে ঠিক পাইনি।' আমতা-আমতা করে করিম বক্স বলল, 'মিশ্রজীর কাছে এনামুল ছাড়া আর কেউই ছিল না, কাজেই সে ছাড়া আর কে মারবে বলুন!'

'মেরেছে আকাশ থেকে নেমে আসা উল্কা।' সুবীর বললেন।

খুনী—আকাশ থেকে নেমে আসা উল্কাপিণ্ড। অতএব এনামুলকে ছেড়ে দিল এক্রাম আলি।

ছবি : অনুপ রায়

আশ্চর্য চুরি

নিরঞ্জন সিংহ



অফিসে ঢুকতেই সম্পাদকমশাই সুখবরটি জানালেন। জেনিভায় যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্মেলন হচ্ছে সেই সম্মেলনের খবর সরবরাহের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত এক বাংলা দৈনিকের আমি বিজ্ঞান-সাংবাদিক। জেনিভার সম্মেলন সম্পর্কে আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। খবরটা শুনে তাই মনে-মনে খুশিই হলাম।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ সদাশিব মুখার্জি এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন—সে-খবর আগেই জানতাম। ডঃ মুখার্জি একজন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখায় ডঃ মুখার্জির অবদানের কথা পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। বংশগতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করে যে বস্তুটি, তার অবস্থান দেহের কোষের মধ্যে। চেহারা তার প্যাঁচানো মইয়ের মতো। নাম তার ডি. এন. এ.। এই ডি. এন. এ.-র অংশকে বলে জিন। এই জিন কাটা-ছেঁড়া করে নতুন জিন সৃষ্টি করতে পারলে নতুন জাতের মানুষ সৃষ্টি সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ডঃ মুখার্জি এমন এক পদ্ধতিতে নতুন ধরনের জিন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইচ্ছে করলে তিনি উন্নত শ্রেণীর বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অফিসের কেরানি, শ্রমিক অথবা সৈনিক তৈরি করতে পারেন। বিজ্ঞানের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এ-কথা প্রকাশ হতেই সারা পৃথিবীতে বিতর্কের ঝড় শুরু হয়ে গেছে। ডঃ মুখার্জি অবশ্য জানেন যে, এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাল দিক যেমন আছে, তেমনই খারাপ দিকও আছে। কোনও সরকার যদি মনে করে যে, দেশে বুদ্ধিমান মানুষ তৈরির কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ, তারা সরকারের ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করবে, এমনকি প্রয়োজন হলে সরকারকে উৎখাতও করতে পারে, তাহলে তো সেই সরকার কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তৈরি করবে, যারা সরকারের সব নির্দেশ বিনা বিচারে মেনে নেবে।

বহু বিদেশি সরকার ডঃ মুখার্জির জিন তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বহু গ্রান্ট, বড়-বড় চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনও দেখানো

হয়েছে ডঃ মুখার্জিকে। কিন্তু এই একগুঁয়ে জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানীকে কেউ লোভ দেখিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারেনি। ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোনও দেশে গিয়ে গবেষণা করাকে ঘৃণা করেন ডঃ মুখার্জি।

এই বিতর্কিত বিজ্ঞানী সম্মেলনে ডঃ মুখার্জি কী বলেন তা জানার আগ্রহ রয়েছে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের। ওঁর কাছ থেকে আসল তথ্য আদায় করে নেওয়া অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হবে কী ?

এতসব কারণেই এইরকম একটা সম্মেলনের খবর পাঠাবার দায়িত্ব পেয়ে আমি খুব খুশি।

ডঃ মুখার্জির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল আমার। ফোনে জানালাম যে, আমি আমাদের বাংলা দৈনিকের তরফ থেকে জেনিভা যাচ্ছি। ডঃ মুখার্জি খুশি হলেন খবরটা পেয়ে। নির্দিষ্ট দিনে দমদম বিমানবন্দরে দেখা হল ডঃ মুখার্জির সঙ্গে। রাশভারী লোক। বিমানে পাশাপাশি সিট পড়লেও দু-চারটের বেশি কথা হল না।

জেনিভায় পৌঁছে ডঃ মুখার্জির সঙ্গে একই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম। পাশাপাশি ঘরও পাওয়া গেল। সম্মেলন শুরু হতে দু-দিন দেরি। ডঃ মুখার্জির এক পুরনো বন্ধু ওঁকে ফোনে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালেন। ডঃ মুখার্জি আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার শরীরটা খারাপ হওয়ায় গেলাম না।

সন্ধ্যার একটু পরে ডঃ মুখার্জির বন্ধু গাড়ি নিয়ে এলেন ওঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি ডঃ মুখার্জিকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলাম। নতুন জায়গায় চট করে আমার ঘুম আসে না। রাত দশটা নাগাদ একটা ফোন এল ডঃ মুখার্জির বন্ধু ডঃ সামোয়ার কাছ থেকে। ডঃ মুখার্জি নাকি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় একটু চোট পেয়েছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। তবে আজ রাত্তিরে তিনি আর হোটেলে ফিরবেন না। আমি যেন চিন্তা না করি।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও আমি আর ও-নিয়ে মাথা ঘামালাম না। এপাশ-ওপাশ করতে-করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল আটটা নাগাদ ডঃ মুখার্জি ফিরে এলেন। মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন ?'

বললেন, 'ভালই আছি, তবে একটু ক্লান্ত লাগছে।'

সেদিন আর কোথাও বেরোলেন না ডঃ মুখার্জি। সারাদিন প্রায় ঘুমিয়েই কাটালেন।

পরদিন ওঁকে বেশ সুস্থ বলেই মনে হল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। বিকেলের দিকে দুজনে শহরে একটু ঘোরাঘুরিও করলাম।

তার পরদিন সম্মেলন শুরু হল। আমি ডঃ মুখার্জির সঙ্গে কনফারেন্স হলে

গিয়ে পৌঁছলাম। আজই ডঃ মুখার্জির বক্তৃতা আছে। দেখলাম ডঃ মুখার্জির বক্তৃতা শোনার জন্য সব দেশের বিজ্ঞানীরা খুবই আগ্রহী। একসময় ডঃ মুখার্জি বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কনফারেন্স হল নিস্তব্ধ।

ডঃ মুখার্জি শুরু করলেন। কিন্তু কোনও বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনার বদলে উনি বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আমি জানি আপনারা আমার কাছ থেকে নতুন কিছু শোনার জন্যে আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন। আমি তার জন্যে গৌরবান্বিত। বিজ্ঞানে ভারত একদিন সারা বিশ্বের পথিকৃৎ ছিল—অবশ্য এ-কথা আজ কেউ স্বীকার করতে চান না। এমনকি বিদগ্ধ ভারতীয়দের মধ্যেও অনেকে এ-কথা বিশ্বাস করেন না। অনেকের ধারণা, নিজের দেশকে বড় করে দেখানোর লোভে আমরা এ-ধরনের অপপ্রচার করে থাকি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ মহাকাশবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। শুধু তাই নয়, মানুষের জ্ঞানের চরম বিকাশ যে-দর্শনশাস্ত্রে, সেই দর্শনশাস্ত্রেও ভারত ছিল অগ্রণী। এসব কথার কথা নয়, এর প্রমাণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ। আজ ইউরোপ, আমেরিকা বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে, কিন্তু ভারত যে এখনও বিশ্বের দরবারে কিছু দিতে পারে সে-কথা আজ আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। বন্ধুগণ, যে-কথা জানতে আপনারা আগ্রহী সে-কথা এই মুহূর্তে আমি আপনাদের জানাতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন। আমি পৃথিবীর সব দেশের সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি—তাঁরা যদি শপথ করে বলেন যে, এই পদ্ধতি একমাত্র মানবকল্যাণে লাগানো হবে, ক্ষমতার লোভে তাঁরা এই পদ্ধতির অপব্যবহার করবেন না, তাহলেই আমি সব কিছু প্রকাশ করব। তা না হলে আমি আমার গবেষণার কাগজপত্র সব নষ্ট করে ফেলব।'

ডঃ মুখার্জির ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা কনফারেন্স হল ভরে উঠল গুজগুজ-ফুসফুসে। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য চেপে রাখার অধিকার কারও নেই।'

একজন বিজ্ঞানী বললেন, 'ডঃ মুখার্জি তামাম দুনিয়ার সরকারকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছেন।'

পরদিন ডঃ মুখার্জির কোনও বক্তৃতা ছিল না। আমরা পাশাপাশি চেয়ার দখল করে বসলাম। সম্মেলন শুরু হতেই ঘোষক জানালেন, 'বন্ধুগণ, আমি আজ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ডঃ রবার্ট আপনাদের সামনে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন যে-সম্পর্কে আপনারা অত্যন্ত আগ্রহী। ডঃ রবার্ট বহুদিন ধরে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনিও ডঃ মুখার্জির মতোই নতুন জিন সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তার বিশদ বিবরণ আপনারা ডঃ রবার্টের মুখ থেকেই শুনুন।'

ঘোষণা শেষ হতে না হতে চমকে উঠলেন ডঃ মুখার্জি। তারপর ফিসফিস করে আমাকে বললেন, 'আশ্চর্য! কে এই ডঃ রবার্ট। এঁর নাম তো কখনও



ডঃ মুখার্জি শুরু করলেন। … 'বন্ধুগণ, আমি জানি আপনারা আমার কাছ থেকে নতুন কিছু শোনার জন্যে আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন। …সে-কথা এই মুহূর্তে আমি আপনাদের জানাতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন। …'

শুনিনি ! কোন দেশের বিজ্ঞানী ইনি ?'

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছেও বেশ রহস্যময় বলে মনে হল। লক্ষ করলাম, কনফারেন্স হলের বিজ্ঞানীরা সবাই একটু অবাক হয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছেন। বিজ্ঞানী মহলে এই ডঃ রবার্ট খুব একটা পরিচিত মানুষ বলে মনে হল না।

ডঃ রবার্ট মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ। বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ভদ্রলোকের মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। সেদিকে ডঃ মুখার্জির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আমি। ডঃ মুখার্জি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মনে হল, উনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন।

ডঃ রবার্ট শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আমি জানি আপনারা আমার কাছ থেকে নতুন কিছু শোনার জন্যে আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন। আমি তার জন্যে গৌরবান্বিত। বিজ্ঞানে ভারত একদিন··· ।'

আমি চমকে উঠলাম। এ যে হুবহু ডঃ মুখার্জির ভাষণ শুনছি। অদ্ভুত ব্যাপার ! ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ ? সম্মেলনের কর্মকর্তারাই বা কী করে ওঁকে বক্তৃতা-মঞ্চে উঠতে দিলেন !

গতকাল ডঃ মুখার্জি যে-কথা বলে ভাষণ শেষ করেছিলেন, ডঃ রবার্টও সেই কথা বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। নতুন জিন তৈরির কোনও কথাই তিনি আলোচনা করলেন না।

কনফারেন্স হলে প্রচণ্ড শোরগোল উঠল। হঠাৎ ডঃ মুখার্জি আমার হাত ধরে আচমকা টান দিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'শিগ্গিরই এখান থেকে বেরিয়ে এসো।'

ডঃ মুখার্জির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কেউ আমাদের লক্ষ করেছে বলে মনে হল না।

বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই সোজা এয়ারপোর্ট। ডঃ মুখার্জিকে কোনও প্রশ্ন করারও ফুরসত পেলাম না।

প্লেনে উঠে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডঃ মুখার্জি। প্লেন তখন রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে। আমি ডঃ মুখার্জির দিকে ফিরে বললাম, 'ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?'

ডঃ মুখার্জি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা আমার মগজের স্মৃতিকোষ বার করে নিয়ে ওই ডঃ রবার্টের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ডঃ সামোয়া সেদিন হোটেলে নেমন্তন্ন করে আমাকে অজ্ঞান করে এই কীর্তিটা করেছে। ভেবেছিল এইভাবে নতুন জিনের কথা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু আমার মনে তখন একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেটা হচ্ছে নতুন জিন তৈরির কথা কিছুতেই ফাঁস করব না। তার বদলে সম্মেলনে কী বলব তাই আমার সমস্ত মন জুড়ে ছিল। তাই স্মৃতিকোষ বার করে নিয়ে ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সুতরাং এবার ওরা হয়তো আমাকে সরাসরি আক্রমণ করত।

তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে পালালাম।'

ডঃ মুখার্জির কথা শুনে ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়ার বদলে আরও যেন ঝাপসা হয়ে উঠল। স্মৃতিকোষ একজনের মগজ থেকে অন্যের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া কি সম্ভব ? সম্ভব না হলে ডঃ রবার্ট কী করে ডঃ মুখার্জির ভাষণটা হুবহু বলে গেলেন ?

আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। প্লেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। জানলার বাইরে ঘন ছাই রঙের মেঘ।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

বঙ্কুবাবুর গল্প

বিমলেন্দু মিত্র



বঙ্কুবাবু বললেন, 'আমার বন্ধু পদ্মলোচনের ঠাকুমার ঠাকুরঘরের জটিল রহস্যের সমাধান যে স্বচক্ষে দেখেছে, তার পক্ষে নেচে-নেচে গান গেয়ে গাছের চারা রোপণ চাক্ষুষ দেখা যে কতটা অসম্ভব তা তোরা কী বুঝবি ? তা সে পরিবেশ রক্ষা-টক্ষা যাই বলিস না কেন ! শুনলুম বউমারা আজ কচুশাক দিয়ে ইলিশমাছ রাঁধছেন···ওটা চলবে, কচুশাককে রোপণ করতে হয় না। যা বুড়ি, ভেতরে বলে আয়, আজ লাঞ্চটা এখানেই সারব।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে বুড়ি খুব জোরে হেসে উঠে হাততালি দিয়ে রান্নাঘরে দৌড়ল, বলে গেল, 'একটু পরে বোলো জেঠু, রান্নাঘরে মাছের কচুরিও ভাজা হচ্ছে।'

গোটা চারেক কচুরি শেষ করে বঙ্কুবাবু বললেন, 'আমাদের পদ্মলোচনের ঠাকুমা যে কী জাঁদরেল ভদ্রমহিলা ছিলেন তা বাহিরশুঁড়োর সবাই জানত। পদ্মলোচন ওরফে ফিঙে, আর তার ভাই পলাশলোচন ওরফে ঝিঙে, এই দুই নাতি ছাড়া ওদের গোটাতিনেক ভেড়ির সব কর্মচারী, গোটাচারেক বাড়ির সব ভাড়াটে, পদ্মর বাবা হারান সরকার, পদ্মর মা, ঝি-চাকর—সব্বাই যমের চেয়েও ওঁকে বেশি ভয় করত। ফরসা, দশাসই চেহারা, কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুলের মাঝখানে একগোছা টিকি, গলায় সোনাবাঁধানো মোটা-মোটা রুদ্রাক্ষর মালার সঙ্গে তুলসীর মালা জড়ানো। হাতে জপের থলে, মুখে অবিরাম বিশুদ্ধ গালাগালি। ওদের বাড়িটা সর্বদাই যেন দমবন্ধ করে থাকে। কেবল যতক্ষণ উনি ছাতের ঠাকুরঘরে থাকেন ততক্ষণ পদ্মদের বাড়িটা একটু হাঁফ ছেড়ে নেয়।

'ঠাকুমার ঠাকুরঘর এক এলাহি কাণ্ড ! মন্দিরের চেহারার ঘরকে ঘিরে নাটমন্দির, ভোগঘর, শয়নঘর ইত্যাদি। বিশাল ছাদের অধিকাংশই ঠাকুরঘরে শামিল হয়েছে। ছাদের আলসে ঘিরে শ'খানেক টবে শ'খানেক নানাধরনের ফুলগাছ। ফিঙে-ঝিঙের বন্ধু বলে আমাদের বিশেষ কিছু বলতেন না ঠাকুমা, তবে ফুলগাছ থেকে ফুল ছেঁড়া স্ট্রিক্টলি বারণ ছিল।

'সেদিন ক্লাসে পদ্ম বললে, "বঙ্কা, তুই কাপালিক দেখেছিস ?"

'বললুম, "না। তুই কি নতুন গল্পের বই পেয়েছিস ?"

'ও বললে, "উঁহু, ঠাকুমা এক কাপালিকের কাছে কালীকেত্তন শিখছে।"

'তা অবশ্য উনি পারেন। ওনার ঠাকুরঘরে একশো তিরিশখানা ঠাকুরের পটে কৃষ্ণ-রাধা, রাম-হনুমান, শিব-দুর্গা, কালী-মনসা সবই সমান মাপে ঝুলছেন। রোজ সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে বসে খঞ্জনি বাজিয়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, হরে-হরে, ব্যোম-ব্যোম, কালী-কালী করেন। সেই বাজখাঁই গলার সিংহনাদে বাহিরশুঁড়ো কাঁপতে থাকে। ওই গলায় কালীকেত্তন যে মর্মস্পর্শী দাঁড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওকে বললুম, "কাপালিক কীরকম রে ? মড়ার মাথার খুলিতে করে কীসব খায়-টায় ?" ফিঙে বললে, "উঁহু, লাল সিল্কের কাপড় পরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে শুধু কালীকেত্তন করে।" ওরকম নিরামিষ কাপালিক মোটেই ইন্টারেস্টিং হবে বলে মনে হল না। পরে একদিন পদ্ম বললে, "ঠাকুমা কাপালিককে তাড়িয়ে দিয়েছে। ও নাকি মাংস খেতে চেয়েছিল।"

'এরও দিনকতক পরে ইস্কুলে এসেই পদ্ম বললে, "জানিস বঙ্কা, আজ ঠাকুরঘরে ঠাকুমা ফিট হয়েছিল !" ভারি অবাক হয়ে বললুম, "সে কী রে ? তোর ঠাকুমা তো বেশ দশাসই, মানে বেশ পালোয়ান গোছেরই আছেন। তবে ?" পদ্মর মুখে শুনলুম, সন্ধেবেলায় ঠাকুরঘরে খঞ্জনি বাজিয়ে ঠাকুমা পাড়া কাঁপিয়ে কালীকেত্তন করছিলেন। হঠাৎ বিকটরকমের আর্তনাদ করে উনি চুপ করে যান। ধপাস করে জোর আওয়াজও হয়। লোকজন ছাদে উঠে দেখে, উনি খঞ্জনি হাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। রমেন-ডাক্তারবাবু দেখে পরে ওষুধ-টষুধ দিয়েছেন।

'পদ্মর মুখে আরও শুনলুম, ঠাকুমা পরদিন সকাল থেকেই পদ্মর বাবা হারান সরকারকে যাচ্ছেতাই করছেন, হারানবাবু রোজা খুঁজে আনতে পারছেন না বলে। ভারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "রোজা কী হবে রে ? ঠাকুমাকে ভূতে পেয়েছে নাকি ?" পদ্ম ব্যাপারটা বলতে পারলে না।

'কথাটা ভূপেশবাবু স্যারের কানে তুলেছিল বোধহয় ঝিঙে। স্যার টিফিনের পরের পিরিয়ডে পদ্মকে সব জিজ্ঞেস করলেন। ওর ঠাকুমা অজ্ঞান হওয়ার পর রোজা ডাকার জন্যে চেঁচামেচি করছেন শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "যতদূর মনে হয় কলকাতা শহরে আজকাল আর ভূতের রোজা পাওয়া যায় না, কারণ শহরে আজকাল ভূতেরই তেমন চাহিদা নেই। তা তোরা বলছিস, তোদের ঠাকুমাকে ভূতেই পেয়েছে ?" পদ্ম বললে, "কী জানি, স্যার ! ঠাকুমাই তো রোজা ডাকার জন্যে জেদ করছে।"

'স্যার ঝোলা গোঁফের দুপাশ চিবিয়ে নিয়ে বললেন, "ভূতে পাওয়া লোক রোজা ডাকতে বলছে ? ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।" স্যার বললেন, ছুটির পর উনি পদ্মদের বাড়ি যাবেন।

'স্যারের সঙ্গেই গেলুম সেদিন বিকেলে। ফিঙে-ঝিঙের বাবা কেমন যেন

হতভম্ব হয়ে বসে ছিলেন। স্যারকে দেখে কিছু কূল পেলেন। উনিও ভূপেশবাবুস্যারের ছাত্র ছিলেন এককালে। ওঁর মুখে ব্যাপারটা শোনা গেল। ঠাকুমা এখন অবশ্য দিব্যি আছেন। ডাক্তারবাবু বলেছেন, কোনও কারণে ভয়-টয় পেয়ে উনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। হার্ট-টার্ট এখন দিব্যি আছে। তবে কীজন্যে যে ওনার মতন জাঁদরেল মহিলা ভয় পেতে পারেন তা ঠিক বোঝা গেল না। স্যার বললেন, "চলো হারান, পিসিমার সঙ্গে দেখা করি।" ঠাকুমা নিজের শোয়ার ঘরে ছিলেন। স্যারকে দেখে খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললেন, "ম্যাস্টার ! হতচ্ছাড়া হারানকে বললুম রোজা ডাকতে, তা ও তোমায় ডেকে এনেছে ? তুমি কি আজকাল রোজাগিরি করছ ?"

'স্যার মুচকি হেসে বললেন, "না পিসিমা, তা আপনার রোজার দরকার পড়ল কেন ?"

'ঠাকুমা ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, "হতচ্ছাড়া হাড়হাভাতে কালীসাধকটা নির্ঘাৎ পিশাচসিদ্ধ। ওটাকে তাড়িয়েছি বলে ও নিশ্চয় ভূত ছেড়ে দিয়ে গেছে। রোজা ছাড়া ভূত তাড়াবে কে ?"

'কিছুই বোঝা গেল না। স্যারও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। বললেন, "ব্যাপারটা গুছিয়ে বলুন তো পিসিমা। সন্ধে না হতেই আপনি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন ?"

'পিসিমা চোখ গোল করে গলা চড়িয়ে বললেন, "ভয় পাওয়া আমার সাতকুষ্ঠিতে লেখেনি। তবে ভূতে যদি তোমার গলা জড়িয়ে ধরত তবে তুমিও আঁতকে উঠে অজ্ঞান হয়ে যেতে। ওই শয়তান পিশাচসিদ্ধটাকে হাতের কাছে পাই একবার !"

'ঘটনা-পরম্পরা যা জানা গেল তা এইরকম : ঠাকুমা যথারীতি সন্ধেবেলা ঠাকুরঘরে একাই ছিলেন। পুজোর একপক্কড় শেষ করে খঞ্জনি বাজিয়ে কেত্তন শুরু করেছিলেন। এমন সময়ে পিছনদিকে পিঠ বেয়ে কে যেন সুড়সুড়ি দেয়। তিনি সামান্য পিছন ফিরতেই বুঝলেন ভূতে তাঁর গলায় দড়ির ফাঁস জড়াচ্ছে। খঞ্জনি ফেলে উনি চিৎকার করেই আসন ফেলে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারপর কী হয়েছে আর মনে নেই। তবে এটা ঠিক যে, পিছন ফিরে উনি কোনও মানুষজন দেখেননি। ভূতের চেহারাও অবশ্য চোখে পড়েনি।

'পদ্ম বললে, "ঠাক্‌মা, হনুমান ছাতে নেমে পিছন থেকে তোমার গলা জড়িয়ে ধরেনি তো ?" ঠাকুমা তার দিকে চোখ রাঙিয়ে একটা হুঙ্কার দিলেন। পদ্ম তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল। স্যার প্যাঁচা চশমার ভেতর থেকে গোল-গোল চোখ করে চেয়ে থেকে বললেন, "আপনার ভুলটুল হয়নি তো, পিসিমা ?"

'উনি চিড়বিড় করে উঠে বললেন, "ভুল হোক অলপ্পেয়ে শত্তুরদের। বাহাত্তর আমার কবে পার হয়ে গেছে। তোমরা ইঞ্জিরি পড়ে নাস্তিক হয়ে গেছ। ভূতেও বিশ্বাস নেই, ভগবানেও বিশ্বাস নেই। বলছি রোজা ডাকো,



পিসিমা চোখ গোল করে গলা চড়িয়ে বললেন, "ভয় পাওয়া আমার সাতকুষ্ঠিতে লেখেনি। তবে ভূতে যদি তোমার গলা জড়িয়ে ধরত তবে তুমিও...অজ্ঞান হয়ে যেতে।..."

নইলে আমি কুলুক্ষেত্তর করব।"

'স্যার বললেন, "আপনার ঠাকুরঘরটা একবার দেখব।"

'ঠাকুরঘরের জিওগ্রাফি আমাদের জানা। সেখানে নতুন কিছুই নেই। শুধু মূল ঠাকুরঘরের চৌকাঠের ঠিক বাইরেই নতুন কয়েকটা টবে কিছু নতুন গাছ সাজানো হয়েছে।

'স্যার বললেন, "পিসিমা কি আজও পুজোয় বসবেন না কি ? আজ না হয় ছাদে না-ই উঠলেন !"

'ঠাকুমা বললেন, "তোমার যত অনাছিষ্টি কথা, ম্যাস্টার ! ছাদে উঠব না তো পুজো করবে কে ? ঠাকুরকে দুধ-গঙ্গাজল দিতে হবে না ?"

'পরদিন ইস্কুলে গিয়েই শুনি গত সন্ধ্যায় পদ্মদের বাড়ি ফের ভূত এসেছিল। পদ্ম অবশ্য বললে, ঠাকুমাকে গুপ্তশত্রু আক্রমণ করেছিল। অজ্ঞান ঠাকুমার গলায় ফাঁসের দড়ির দাগ পাওয়া গেছে। সুতরাং বিকেলে দুড়দুড় করে ছুটলুম ওদের বাড়ি। ভূপেশবাবুস্যারও দেখি রয়েছেন। শুনলুম, প্রায় গত সন্ধের মতোই ব্যাপার ঘটেছে। ভূতই হোক বা গুপ্তশত্রুই হোক, পিছন থেকে ওঁর গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে টান দিয়েছিল। গলায় লাল দাগ রয়েছে। তবে একবাড়ি লোকের চোখ এড়িয়ে গুপ্তশত্রু কী করে ছাদে উঠতে পারে তা কেউ বলতে পারলে না।

'ঠাকুমা বিছানায় শুয়ে আজ বাস্তবিকই চিঁচিঁ করছেন। ভূপেশবাবুস্যারকে দেখে কেঁদে ফেলে বললেন, "ও ম্যাস্টার, তুমি কি ভূত তাড়াবে না ?" স্যার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "সায়েন্স-টায়েন্স লাগালে ভূত পালাবার পথ পাবে না।" তারপর পদ্মর বাবাকে বললেন, "হারান, পিসিমা কি একাই ছিলেন ছাদে ?"

'উনি বললেন, "হ্যাঁ, স্যার। পুজোর সময় মা তো আর কাউকে—"

'"বুঝেছি। তোমরা পিসিমার চিৎকার শুনে ছুটে গিয়েও কাউকে দেখতে পাওনি ?"

'"না, স্যার ! মা আসনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আশপাশে জবা বিল্বিপত্তর ছড়ানো। হাতে খঞ্জনি। রমেন ডাক্তারবাবু পরে এগজামিন করে দেখলেন যে, গলায় দড়ির ফাঁস লাগার লাল দাগ। অথচ দড়ি-ফড়ি ধারেকাছে কোথাও নেই।"

'স্যার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তোমাদের চোখ এড়িয়ে ছাদে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয় ?"

'"না, স্যার। বিশেষ করে আগের দিনের ঘটনার পরে চারদিকে খুব নজর রাখা হয়েছিল।"

'ঝোলা গোঁফের দুপাশ চিবিয়ে নিয়ে স্যার ভাবিত গলায় বললেন, "পিসিমার আজ আর ছাদে উঠে কাজ নেই। পুজোটা কোনও ঠাকুরমশাইকে ডেকে করিয়ে নিন।"

'ঠাকুমা চিঁচিঁ করেই বললেন, "ধড়ে প্রাণ যতক্ষণ আছে, পুজো আমি নিজেই

করব। ঠাকুরকে তো উপোসী রাখতে পারব না! তবে আজ একটু আগে হরুনাপ্‌তেকে ডেকে ঘর-বন্ধন মন্তরটা শিখে নিয়েছি।"

'স্যার হারানবাবুর সঙ্গে বাইরে এসে বসলেন। বললেন, "হারান, পিসিমাকে জানানোর দরকার নেই। উনি ছাদে উঠলে তুমি আর আমি টর্চ হাতে চুপিচুপি ছাদে উঠব। একটা কাটারি হাতে রেখো।"

'স্যারকে অনুনয়-বিনয় করে পদ্ম আর আমিও ওঁদের সঙ্গে থাকার পারমিশান পেলুম। ঝিঙে ছেলেমানুষ বলে বাদ গেল।

'পদ্মর ঠাকুমার সাহস যে আছে তা বলতেই হবে। নিজস্ব দাসীটিকে সিঁড়িতে বসে থাকবার জন্যে বলে উনি একাই ছাদে উঠলেন। কিছু পরে আমরাও চুপিচুপি ফলো করলুম। ততক্ষণে ঠাকুমা শাঁখ-টাক বাজিয়ে, ধূপ-ধুনো জ্বেলে পুজোয় বসে পড়েছেন। নানারকম মন্তর-টন্তর শুনতে-শুনতে, শাঁখ ঘণ্টার আওয়াজে, কেমন ঘোর-ঘোর লাগছিল। আমরা এমন জায়গায় পজিশান নিয়েছিলুম, যেখান থেকে আমরা তাঁর ওপরে নজর রাখতে পারি, দরকার হলে লাফিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর রেসকিউতেও যেতে পারি।

'আমার বুকটা দুরদুর করছিল। যদি সত্যিই ভুতুড়ে ব্যাপার হয়! ঠাকুমার মতো ডাকসাইটে মহিলাকে ফাঁসিতে লটকাবার চেষ্টা যে-ভূত করতে পারে, তার চেহারা কেমন হবে ? বিশেষ করে যখন সে কাপালিকের ছেড়ে দেওয়া ভূত !

'ঠাকুমা ঘণ্টা নাড়লেন। বব-বম্ করে গালবাদ্য করলেন। তারপর "ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শব শিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরা—" ইত্যাদি স্তব-টব পাঠ করলেন। শেষে খঞ্জনি হাতে প্রথমে "ভবসাগর তারণ—" ইত্যাদি করে অবশেষে কালীকীর্তন ধরলেন, "কালী কালী কালিকে, চণ্ড-মুণ্ড খণ্ড-খণ্ডী রুদ্র-দণ্ড পালিকে—" ইত্যাদি। উঃ, কী তার ভীমরব, কী তাল, কী লয়! আশপাশের বাতাস উচ্চগ্রামের সেই সাঙ্ঘাতিক শব্দাঘাতে যেন কাঁপতে লাগল। ঠিক এই সময়ে—

'এই সময়ে চোখে পড়ল, ওঁর পিছনদিকে টবে গজানো জবাজাতীয় গাছটার ডালগুলো লম্বা টান-টান হয়ে ম্যাজিশিয়ানের দড়ির মতো বাড়তে-বাড়তে যেন কোন অদৃশ্য ফাঁসুড়ের হাতের ফাঁসের মতো গুটিয়ে ঠাকুমার গলার দিকে এগুচ্ছে !

'চিৎকার আমাদের গলাতে আটকে গিয়েছে! শুধু দেখলুম, স্যার বিদ্যুদ্বেগে লাফিয়ে উঠে খঞ্জনিটা ঠাকুমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন। ঠাকুমার কেত্তন হেঁচকি তুলে থেমে গেল। আর স্পষ্ট দেখলুম লকলক করে এগিয়ে যাওয়া জবার ডাল নেতিয়ে পড়ে গুটিয়ে ফের আগের মতোই ফিটফাট জবাগাছ হয়ে গেল। ব্যাপারটা যদি ভুতুড়ে না হয় তবে তার এক্সপ্ল্যানেশান কী তা জানি না।

'হ্যাঁ, তাই আমি নেচে-গেয়ে বৃক্ষরোপণটোপন পছন্দ করি না। যা বুড়ি, দেখে আয় বউমাদের রান্নার কতদূর !' বঙ্কুবাবু চুপ করলেন।

তপেশ চিড়বিড় করে উঠে বলল, 'ভাল হবে না বলছি, বঙ্কুদা, গল্পটা শেষ করো, নইলে—'

বঙ্কুবাবু বিরক্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'শেষ তো হয়েই গেল! তোরা কি জানিস না যে, পঞ্চান্ন বছর আগে লোকে না জানলেও এখন তো গাছের বাড়বৃদ্ধির ওপরে মিউজিকের প্রভাব নিয়ে রিসার্চ-টিসার্চ হচ্ছে। রাশিয়াতে গবেষণা হয়েছে। আমাদের দেশে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বিষয়ে জোর গবেষণা চলছে। টমকিন্স আর বার্ডের আজগুবি সব থিয়োরি ছেড়ে দিলেও এটা ঠিক যে, আলোতে গাছের টিস্যু যেমন সাড়া দেয়, শব্দের নানা ভাইব্রেশনে, তাল-লয়-যুক্ত সুরেলা শব্দতে, মার্গসঙ্গীতে গাছ সাড়া দেয়। পঞ্চান্ন বছর আগেই ভূপেশবাবুস্যার তা বুঝেছিলেন। পদ্মর ঠাকুমার ভীমগম্ভীর গলার কালীকীর্তনের ফলে যে শব্দদূষণ ঘটছিল, তাতে তাঁর টবে বসানো সিদ্ধজবার গাছ একটু বেশিমাত্রায় সাড়া দিয়েছিল। মানে, ফাঁসি লাগিয়ে শব্দদূষণ বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। মানুষে তো কিছু করে না!'

ছবি : দেবাশীষ দেব

বখেড়া

সুকুমার ভট্টাচার্য



ঘড়ভরণ দ্বিবেদীর কাহিনীর ওপর বিশেষ আস্থা নেই সোমসাহেবের। আবার গোটা ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কথা বলতে-বলতে ঘড়ভরণ তার বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শোনা ইতিহাসে চলে যায়। ভাঙা বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে যা বলে, কাহিনী হিসেবে শুনতে ভালই লাগে সোমসাহেবের।

অনেকদিন আগেকার কথা—'তা অমন পঁচাশ-ষাট বরষ তো জরুর হোবে।' সেই সময় এক বৈষ্ণব বাবাজী বরানগরের পাঠবাড়িতে জায়গা না পেয়ে সোজা চলে এসেছিলেন এই উল্টোডাঙায়। সঙ্গে একটা ঝোলায় ছিল কিছু পুঁথিপত্র, আর 'ডাহিনা' হাতে ছিল 'একঠো' নিমগাছের চারা। বরানগরে পাঠবাড়ির ধারে 'গঙ্গাজীকে কিনারে' গজিয়েছিল সেই নিমচারা।

প্রথমে বৈষ্ণব বাবাজী উল্টোডাঙার আখড়া তৈরি করেছিলেন, তারপরে রোপণ করেছিলেন সেই নিমচারা। এরপর কতকাল কেটে গেছে, সেই বাবাজীও গতায়ু হয়েছেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁর রেখে যাওয়া আখড়ায় দিনের পর দিন নামগান করেছেন সেই বিরাট মহানিমের নীচে। সাঁঝের বেলায় বৈষ্ণবীরা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে নিমতলায়। নিজেদের মনের বাসনা জানিয়ে কত ভক্ত সুতোর 'ঢিলি' বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে সেই নিমগাছের ডালে।

'খুব নামদার বড়িয়া জায়গা ছিল বাবুসাহাব। লেকিন সরকারনে বিলকুল খতম কর দিয়া।' বলে লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যায় ঘড়ভরণ।

চুপচাপ কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে যায়। আবার মুখ খোলে সে।

সরকার নাকি সেসব জায়গা নিয়ে নিয়েছে। অগেকার সেসব কুঁড়ে, গাছপালা, আখড়া কেটে তুলে দিয়ে হাউসিং স্কিমে বড়-বড় বাড়ি তৈরি করেছে। কত 'বড়িয়া বড়িয়া আদমি' কত জায়গা থেকে উঠে এসেছে উল্টোডাঙার ওইসব বাড়িগুলোতে। শহর নাকি আরও জমজমাট হয়ে উঠেছে। 'সচ বাত', কিন্তু ওই যে নিমগাছের 'দেওতা'টিকে উদ্বাস্তু করেছে

সরকার, সেই দেবতাটি তো আর অমনই ছেড়ে দেবেন না। আর সেইজন্যেই আজ উল্টোডাঙার পথেঘাটে এত বখেড়া দিয়ে ফিরছেন দেবতাটি—কথায়-কথায় কোথাও না কোথাও একটা না একটা দুর্ঘটনা।

হাজার চিন্তার মাঝে আলগা হাসি ফুটে ওঠে সোমসাহেবের ঠোঁটে। অবশ্য তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন, হাজার চেষ্টা করলেও তিনি ঘড়ভরণের মনের ধারণাটাকে বদলাতে পারবেন না। তাই আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়েন তার চায়ের দোকান থেকে।

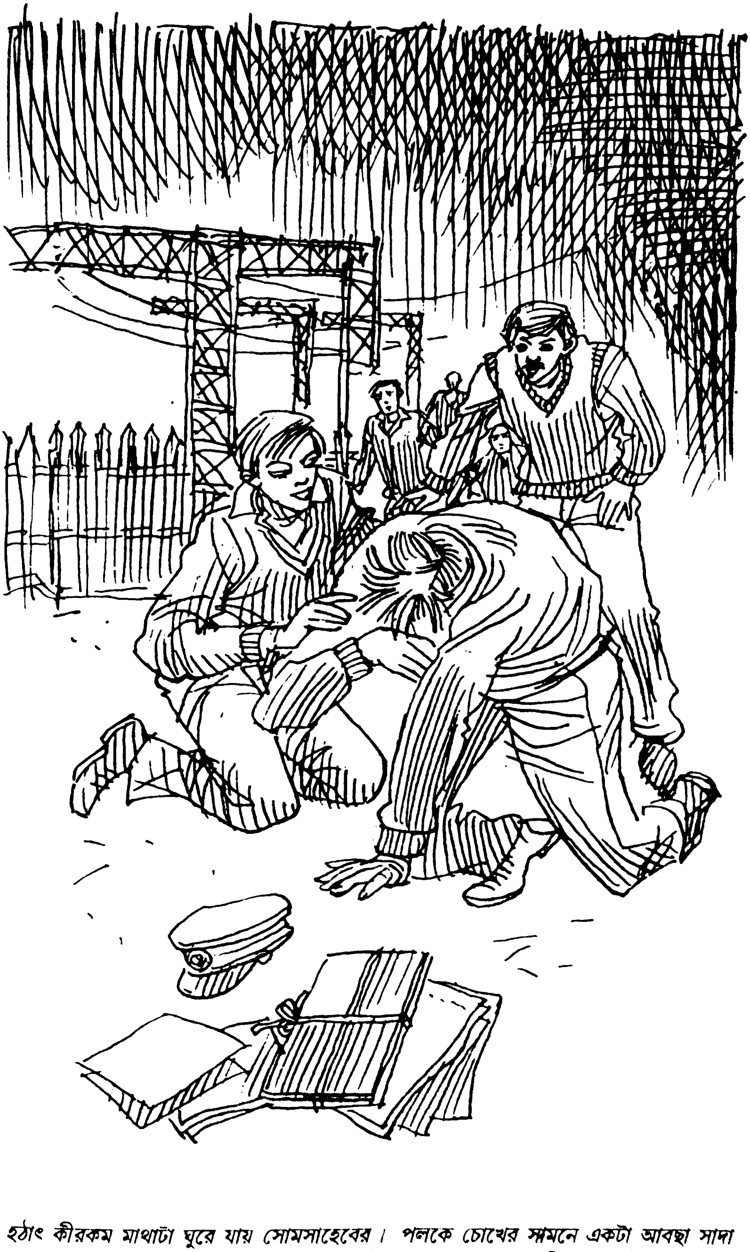
উচ্ছন্নে যাক ওর কাহিনীর সত্যাসত্য, সোমসাহেব ভাবেন, কিন্তু এ-কথা তো সত্যি যে, এ-অঞ্চলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। সমস্ত কলকাতা জুড়েই অল্পবিস্তর দুর্ঘটনা ঘটছে ঠিকই, তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানকার সংখ্যা কিছু বেশি। নিমগাছের দেবতাটিকে বাদ দিলেও ওই বখেড়া ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না সোমসাহেব।

পুলিশের ওপর মহলের কর্তারা অন্য কথা বলেন। তাঁদের ধারণা, মোটর-ভিক্‌ল্‌সের কর্তারা লরি কিংবা মোটরের কলকব্জা ভালমতো পরীক্ষা না করেই লাইসেন্স-এর ছাড়পত্র সই করে দেন। এছাড়া ড্রাইভারদের রাফ ড্রাইভিং তো আছেই।

অনুসন্ধানের কাজে নেমে সোমসাহেবের সবক্ষেত্রে তা কিন্তু মনে হয় না। প্রায় দিন পনেরো হতে চলল, থানায় বসে একটার পর একটা দুর্ঘটনার নথিপত্র ঘেঁটেছেন তিনি। পড়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ঘটনার ড্রাইভারদের একই রকম জবানবন্দী। অবশ্য জবানবন্দী শুধু তাদেরই পাওয়া গেছে, যারা বেঁচে আছে।

না, তারা কেউই নেশা-ভাঙ করেনি—অন্তত ওই সময়ে। গাড়ির গতিও একটা সীমিত কাঁটার গণ্ডিতেই বাঁধা ছিল। কিন্তু কোত্থেকে কী যে হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারেনি তারা। রামজনম সিংয়ের স্টেটমেন্টটা মনে পড়ে সোমসাহেবের। পরপর চার-চারটি প্রাণের মহড়া নিয়ে সে তার লরিটিকে সোজা ভিড়িয়ে দিয়েছিল পথের ধারের একটা ছাতিমগাছের গুঁড়িতে। স্টিয়ারিং-এর চাপে জাঁতিকলের ইঁদুরের মতো নিজে আটকে গিয়েছিল সিটে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আগুন লেগে গিয়েছিল ইঞ্জিনে। আশপাশ থেকে অনেকেই হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত সেই আগুনের মাঝ থেকে অর্ধদগ্ধ রামজনম সিংকে হিঁচড়ে বার করে পাঠিয়েছিল আর. জি. করে। বেচারা বাঁচেনি। তবে মরার আগে সে পুলিশকে এমন একটা কথা বলে গিয়েছিল যার ব্যাখ্যা সোমসাহেবের পূর্বতন অফিসার করতে পারেননি। সোমসাহেব নিজেও বক্তব্যটিতে সন্দেহ পোষণ করেন, গোটা জবানবন্দীটিকে গাঁজাখুরি বলে মনে করেন।

কিন্তু কী সেই জবানবন্দী, যা একজন মৃত্যুপথযাত্রীর মুখনিঃসৃত হওয়া সত্ত্বেও শ্রোতার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়? সেটি হচ্ছে : কয়েক মুহূর্তের জন্য



হঠাৎ কীরকম মাথাটা ঘুরে যায় সোমসাহেবের। পলকে চোখের সামনে একটা আবছা সাদা পরদা নেমে আসে।...টাল সামলাতে স্টেশনের লোহার রেলিঙটা আঁকড়ে ধরতে গেলেন...পারলেন না। টলে পড়লেন।

নাকি রামজনম অন্ধ হয়ে যায়। পরে যখন তার হারানো দৃষ্টিশক্তি ফেরত আসে, তখন সে নিজেকে চারপাশের দাউ-দাউ আগুনের মাঝে পুড়তে দেখে।

রামজনমের আগে বা পরে ঠিক এমন কথা কেউ বলেনি। তবে খুঁটিনাটি যতটা পড়ে দেখেছেন সোমসাহেব, তাতে সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এক ড্রাইভার কবুল করেছে, হঠাৎ তার মাথাটা কেমন ঝিম ধরে গেছ্‌ল। কানের ভেতর বেজে উঠেছিল হাজার-হাজার ঝিঁঝিপোকার মিলিত আওয়াজ। হাত-পা কেঁপে গেছ্‌ল, গাড়ি চলে গেছ্‌ল কন্ট্রোলের বাইরে।

কিন্তু এসব কথা তো আদালত শুনবে না। শোনেওনি। চার বছরের ঘানির মেয়াদ নিয়ে সেই ড্রাইভার এখন চার পাঁচিলের চত্বরে চাপাটি খাচ্ছে।

উল্টোডাঙা স্টেশনটাকে যদি কেন্দ্র করা যায়, সোমসাহেব ভাবেন মনে-মনে, তাহলে তার মাইল দুই পরিধি জুড়ে শহরের যে বিরাট অংশটুকু পড়ে, যত দুর্ঘটনা যেন সব ওই এলাকাতেই ঘটে চলেছে। তার বাইরে কলকাতার যে বৃহত্তম অংশ এবং শহরতলি, সেখানে কি দুর্ঘটনা হয় না? হয়। কিন্তু সোমসাহেবের সমীক্ষায় এই অঞ্চলটিতেই দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক বেশি।

পায়ে-পায়ে স্টেশনে চলে আসেন তিনি।

শীতের বিকেল বুঝি-বা একটু বেশি গড়িয়ে গেছে। পশ্চিমের বড়-বড় বাড়ির আড়ালে সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার থমথমে আমেজ একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন সোমসাহেব।

আজ বৃহস্পতিবার। হাতে আর মাত্র তিনদিন। সোমবারেই তাঁকে শেষতম দুর্ঘটনার রিপোর্ট পেশ করতে হবে বড়সাহেবের কাছে। এটিও একটি রানওভারের কেস। আসামী ড্রাইভার এখনও জেল-হাজতে দিন গুনছে।

কিন্তু কী রিপোর্ট পেশ করবেন সোমসাহেব? মনে-মনে তেমন জোরালো বক্তব্য কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে আসামীকে শাস্তি দেওয়ার মতো একটা রিপোর্ট অবশ্য যেমন-তেমনভাবে খাড়া করে দেওয়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র সেটুকু করতে তিনি কোনওমতেই রাজি নন। তাঁর মনে কোথায় যেন একটা খিঁচ রয়ে গেছে। এই যে একই অঞ্চলে এত দুর্ঘটনা—না না, দুর্ঘটনা নয়, বখেড়া—ঘড়ভরণের শব্দটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন সোমসাহেব, এর পিছনে কিছু একটা আছে। সেটা কী? আচ্ছা, ও. সি.কে সব কথা যদি খুলে বলা যায়? যদিও তিনি কী চোখে নেবেন ব্যাপারটা তা আঁচ করা মুশকিল, তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

তরতরিয়ে স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন সোমসাহেব। একটা গাড়ি ধরে সোজা চলে এলেন থানায়।

'আরে সোমসাহেব যে! কী খবর বলুন। নতুন কিছু অঘটন নয় তো?' বড়বাবুর বড়গলার অভ্যর্থনা।

সপ্রতিভ হয়ে সোমসাহেব বলেন, 'না না, সেসব কিছু নয়। এমনই একটা

পরামর্শ জরুরি হয়ে পড়ল আপনার সঙ্গে।'

বিগলিত হাসি এবার পিছলে পড়ল বড়বাবুর গলা থেকে, 'তা বেশ তো, বেশ তো। বসুন। ভাল কথা, আপনার সেই অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্টটার কদ্দূর, সোম ?'

'আজ্ঞে, ঠিক ওই ব্যাপারেই কিছু আলোচনা ছিল।

'ওই ব্যাপারে আলোচনা!' বড়বাবুর চোখ কুঁচকে আসে : 'ওই রিপোর্টের ওপরে আবার আলোচনা কী ? জেনুইন রানওভার কেস। ড্রাইভার তার স্টেটমেন্টে কবুল করেছে।'

'সেসব জানি। কিন্তু আমার বক্তব্যটা স্যার একটু অন্যরকমের। যদি শোনেন...'

আর সময় না নিয়ে সোমসাহেব সোজাসুজি নিজের বক্তব্যে নেমে এলেন, একটি-একটি করে প্রতিটি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার কথা ব্যক্ত করলেন :

'যে-কোনও কারণেই হোক উল্টোডাঙা অঞ্চলে দুর্ঘটনার সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশি। কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত ড্রাইভারের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট খতিয়ে দেখা গেছে, সে কোনওরকম নেশা না করেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। জীবিত ড্রাইভারদের কেউ-কেউ বলেছে, তাদের কান কিংবা মাথা সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা রামজনম সিংয়ের—সে নাকি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক পলকের জন্যে।'

সোমসাহেব পরিশেষে বললেন, 'যা-ই বলুন স্যার, এতগুলো রিপোর্ট পড়ার পর প্রেজেন্ট কেসের ওপর রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে আমার মন বলছে, ফান্ডামেন্টালি আমরা বোধহয় কোথাও ভুল করছি। সমস্ত ঘটনারই হয়তো অন্য কোনও একটা হেতু আছে, আই মিন, একটা রহস্য আছে। অ্যান্ড ইন দিস কানেক্‌শন আই অলসো অবজার্ভড যে, দুর্ঘটনার সংখ্যা গ্রীষ্মকালের চাইতে শীতকালেই যেন বেশি। বিশেষ করে ফ্যাটাল কেসের সংখ্যা...'

আর বোধহয় ধৈর্য রাখতে পারলেন না বড়বাবু। বিস্তৃত হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখে। বললেন, 'থামলেন কেন ? বলুন, বলুন, আরও কী-কী আপনি অবজার্ভ করলেন। যেমন ধরন, ট্র্যাফিক পুলিশ নিশ্চয়ই নিয়মমাফিক মোড়ে-মোড়ে ডিউটিতে ছিল না। কিংবা ট্র্যাফিক সিগন্যালগুলো নিশ্চয়ই লোডশেডিংয়ে নিভে গেছল আর আকাশের চাঁদ যথাসময়ে উঁকি না মেরে অকুস্থলে অমাবস্যা ক্রিয়েট করেছিল !'

থমকে গেলেন সোমসাহেব। মনে-মনে হয়তো-বা ব্যথাও পেলেন একটু। সে ভাবটুকু কাটিয়ে কিছু বলার আগেই বড়বাবু পুনশ্চ সংযোজন করলেন : 'দেখুন মিস্টার সোম, ওসব আপনি যা বলছেন, তা হল গবেষণার কথা। আমাদের দেশে এ-জাতীয় গবেষণা এখনও পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। আমাদের কাজ হল, মানে এক্ষেত্রে পুলিশের কাজ হল, শুধুমাত্র

প্রমাণসাপেক্ষ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে চার্জশিট তৈরি করা এবং আসামীসমেত সেটিকে ঠিক সময়ে আদালতে পেশ করা। ব্যস, এর বেশি আমাদের আর কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি বরং সেইমতো তৈরি হোন।'

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না সোমসাহেব। দু-চারটে নেহাত বলতে-হয় ধরনের কথার পর তিনি বেরিয়ে এলেন বড়বাবুর ঘর থেকে। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবলেন কয়েক মিনিট। মনে-মনে ভাল করে খতিয়ে দেখলেন বড়বাবুর কথাগুলো। কিন্তু না, তাঁর মন কোনওমতেই রাজি নয় তাঁর কথাগুলো পুরোপুরি মেনে নিতে। হলই-বা গবেষণার কাজ, থাকলই-বা দায়িত্বের কিছু বাড়তি ঝামেলা। তবু একটু দেখতে ক্ষতি কী? ফাইনাল রিপোর্ট পেশ করতে তো এখনও দু-তিনদিন বাকি আছে।

কয়েক মুহূর্ত লাগল তাঁর মন ঠিক করতে। তারপরই নেমে এসে থানার চত্বরে দাঁড়-করানো মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিলেন তিনি।

শুরুতেই ঠিক করলেন উল্টোডাঙা স্টেশনটিকে কেন্দ্র করে মাইলদুয়েক নিজে একবার টহল দিয়ে দেখবেন, কোথাও কোনও সিগন্যাল পোস্ট অকেজো হয়ে পড়ে আছে কিনা, ট্র্যাফিক পুলিশ ঠিক-ঠিক জায়গায় থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে কিনা, কিংবা ট্র্যাফিক রুল ব্রেক করে কোনও ড্রাইভার নিজের জমিদারি চাল জাহির করছে কিনা। বড়বাবু তাঁকে এগুলি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু এগুলি তো ফেলনা নয়। বরং এইসব প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো ভুলে গিয়েছিলেন বলে মনে-মনে যথেষ্ট লজ্জা পেলেন সোমসাহেব।

তাছাড়া আর একটা কথা সোমসাহেবের মাথায় জেঁকে বসেছে: একবার দেখা করতে হবে ঘড়ভরণের সঙ্গে। সে তো তার কয়লার গোলা আর চায়ের দোকান নিয়ে দিনরাত্তির বসে থাকে রাস্তার ধারে। গত বছরে যে বিরাট রেল-দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে উল্টোডাঙা স্টেশনে, সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই সে কিছু না কিছু ওয়াকিবহাল আছে। দেখতে হবে ওর কাছ থেকে আরও কিছু খবরাখবর পাওয়া যায় কিনা।

মোটরসাইকেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়ালেন সোমসাহেব। কিন্তু না, এমন কিছুই তাঁর নজরে এল না, যেটাকে অস্বাভাবিক বা বেআইনি বলে মনে হতে পারে।

শীতের রাত। পথ বেশ জনবিরল হয়ে এসেছে। এক ফাঁকে হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিলেন তিনি: রাত পৌনে এগারোটা।

গাড়ির গতি স্লো করলেন তিনি। এত রাতে ঘড়ভরণকে বিরক্ত করা কি উচিত হবে? সে যদি শুয়ে পড়ে? মনে-মনে চিন্তা করেন সোমসাহেব। পরে কী ভেবে তার ডেরার সামনে এসে মোটরসাইকেলে ব্রেক কষলেন তিনি।

না, ঘড়ভরণ জেগেই আছে মনে হয়। ভেতরে আলো জ্বলছে।

পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে তিনি দাঁড়ান দোকানের ঝাঁপের পাশে। ভেতর থেকে ঘড়ভরণের গলা ভেসে আসছে।

এত রাতে কার সঙ্গে কথা বলছে ? সোমসাহেব কান পাতলেন।

'পহেলা প্রহর মে সবকোই জাগে,
দুসরা প্রহর মে ভোগী।
তিসরি প্রহর মে তস্কর জাগে,
চৌঠা প্রহর মে যোগী।
পবনপুত্ হনুমানজী,
শ্রীরামচন্দ্রকি জয় !'

টক টক টক !

টোকা দেন সোমসাহেব।

'কৌন ?'

'দরজা খোলো, ঘড়ভরণ। আমি, পুলিশসাব।'

'কৌন্ পুলিশসাব ?' দোকানের ঝাঁপ তুলে দেখার চেষ্টা করে ঘড়ভরণ : 'আরে রাম রাম ! বাবুসাহাব ! এত্‌নাহি রাতমে !'

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল, দ্বিবেদী।'

বিস্ময় ফুটে ওঠে ঘড়ভরণের চোখে। তাড়াতাড়ি করে দোকানের ঝাঁপ তুলে আলতো হাসি মুখের ওপর টেনে এনে বলে, 'আইয়ে বাবুসাব, অন্দর আইয়ে। বৈঠিয়ে। থোড়া চা-উ পিজিয়েগা তো ?'

'আরে না না, এত রাতে ওসবের কোনও জরুরত নেই। তুমি বরং ঠাণ্ডা হয়ে বসে আমায় একটু সাহায্য করো দিকি। তাহলেই যথেষ্ট হবে।'

দোকানের মধ্যে পাতা বেঞ্চিটাতে বেশ জাঁকিয়ে বসলেন সোমসাহেব। শুধোলেন, 'কী পড়ছিলে ? তুলসীদাস ?'

'উও কুছ নেহি, বাবুসাহাব', একটু যেন লজ্জায় পড়ে ঘড়ভরণ : 'দিনভরকে বাদ থোড়া...'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' একটু হাসলেন সোমসাহেব : 'আচ্ছা ঘড়ভরণ, গেল বছর এই উল্টোডাঙা স্টেশনে তোমার সেই নিমগাছের দেওতাটি একটা বেশ জবর রকমের বখেড়া দিয়েছিলেন, মনে আছে ? তুমি কি তখন এখানে ছিলে ?'

'বখেড়া !'

'হ্যাঁ, মানে, ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট। হাবড়া লোকাল যখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ পিছন থেকে দার্জিলিং মেল এসে হুড়মুড় করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতে বেশ কয়েকটা বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। হতাহতও কিছু হয়।'

'হাঁ হাঁ, বাবুসাহাব, হ্যাঁ। আবি মালুম হুয়া। উয়ো তো বহুত খতরনাক

থা।' বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে সেদিনকার ঘটনার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে যায় ঘড়ভরণ : 'হাবড়া লোকালের ইঞ্জিনে কী যেন একটা খারাবি দেখা দিয়েছিল, সেদিন সে গাড়ি দো কদম আগে যায় তো তিন কদম পিছু হটে। না জানি সিগন্যালের কোনও গড়বড় ছিল কি না। এহি রকম আগুপিছু যখন চলছে, সেই সময় পিছাসে এক টিরেন হুড়বড়িয়ে উয়ার পিছে ভিড়িয়ে গিয়েছিল। আরে ব্যস, অ্যায়সা আবাজ!'

মনে-মনে আবার ছক কাটেন সোমসাহেব : সেই গাড়ির ইঞ্জিন খারাপের সম্ভাবনা! সেই একই প্রশ্ন—সিগন্যালে গোলযোগ ছিল কি না! আশ্চর্য, কিছুতেই কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছনো যাচ্ছে না।

চুপ করে বসে ভাবছেন সোমসাহেব।

'বাবুজি, থোড়াসে চা-উ বন্‌হাই?'

ঘড়ভরণের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন সোমসাহেব। উঠে পড়ে বললেন, 'আরে না না। রাত অনেক হয়েছে। তুমি এখন আরাম করো।'

পুরো দুটো দিন নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর করে বেড়ালেন সোমসাহেব। নানা জায়গায় ঘুরে, নানা নথিপত্র পড়ে ঘড়ভরণের 'দেওতা'টিকে সযত্নে সিংহাসনে সমাসীন রেখে যুক্তিসম্মত রিপোর্ট খাড়া করার কথা চিন্তা করতে শুরু করেছেন তিনি। বখেড়া যে-ই আনুক, দেবতাই হোক আর মানুষই হোক, বখেড়া তো আছেই।

উল্টোডাঙা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করেন আর ভাবেন সোমসাহেব।

শীতের সন্ধে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। পথে-পথে জ্বলে উঠেছে আলো। একটা অস্বচ্ছ ঘোলাটে গোল পরিমণ্ডল বাল্‌বের চারপাশে ফুটে উঠেছে। বড় রাস্তার ওপাশে হাউসিং এস্টেটের বাড়িগুলি শীতের কুয়াশায় সাত সুমুদ্দুর তেরো নদীর পারের নিঝুম দৈত্যপুরীর মতো মনে হচ্ছে।

হঠাৎ কীরকম মাথাটা ঘুরে যায় সোমসাহেবের। পলকে চোখের সামনে একটা আবছা সাদা পরদা নেমে আসে। আবছা হতে-হতে আশপাশের সবকিছুই তাঁর চোখের ওপর থেকে মিলিয়ে যায় একসময়ে। কিছুই তাঁর নজরে আসে না। কান-মাথা ভোঁ-ভোঁ করে ওঠে।

টাল সামলাতে স্টেশনের লোহার রেলিঙটা আঁকড়ে ধরতে গেলেন সোমসাহেব। পারলেন না। টলে পড়লেন।

তারপর না জানি কতক্ষণ কেটে গেছে। একটু-একটু করে আবার নজর ফিরে আসে সোমসাহেবের। দেখেন, তাঁকে ঘিরে নানা মানুষের জটলা।

'না না, জল আনতে হবে না রে! জ্ঞান ফিরেছে।' একজন বলে উঠল।

'কী মশাই? ব্যাপার কী?' আর একজনের উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

'আহা-হা, উঠবেন না, উঠবেন না!'—একজন হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'একটু না

হয় রেস্ট নিন।'

কিন্তু তাঁর হয়েছিল কী ? ঠিক বুঝতে পারেন না সোমসাহেব। শুধু ঘামছেন। এই শীতের দিনেও পোশাকের ভেতরটা ঘামে সপসপে হয়ে উঠেছে।

একটু বাদে নিজের পদমর্যাদার কথা খেয়াল হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। শুধোলেন, 'আমার কী হয়েছিল বলুন তো ?'

'আপনের ? তা কী কইরা কই বলেন তো ?' একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'আমি আপনের পাশেই আছিলাম। যদ্দূর মালুম হয়, মাথা ঘুইর‍্যা পইড়া গেলেন।'

মাথা ঘুরে ! অবাক সোমসাহেব। মাথা ঘুরে গেছে ভাবতেও তাঁর খারাপ লাগছে।

সেই ভদ্রলোক আবার বলেন, 'হয় প্যাটে গ্যাস হইছে, নয়তো প্রেশার। ডাক্তারের লগে কন্‌সাল্ট করেন, মশয়।'

ডাক্তার ! চকিতে সোমসাহেবের মগজে বিদ্যুৎ খেলে যায়—সমরেশ ! তাঁর বন্ধু, সহপাঠী। সঙ্গে-সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আপনারা যদি কেউ দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেন।'

তারপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা মানিকতলায় সমরেশের চেম্বারে।

'কী ব্যাপার ! তুমি—' সমরেশের বিস্মিত উচ্ছ্বাস।

'আরে ভাই, আর বলো কেন ! হঠাৎ মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গেছি। থরো চেকিং করে দ্যাখো তো ব্যাপারটা কী ?'

অবাক ডাক্তার বন্ধু। চোখ কুঁচকে আসে তার : 'তুমি পড়ে গেছ মাথা ঘুরে ? আশ্চর্য ! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।' বলে সোমসাহেবকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে পেশেন্ট বেডে শুইয়ে দেন ডাক্তার সমরেশ। তারপর পেশেন্টের জামার বোতাম খুলে দিয়ে চলে নানারকম পরীক্ষা। প্রেশারও চেক করা হল।

'কী হে, কেমন দেখলে ?'

'কী আর দেখব বলো ! কোয়াইট নরমাল। শুধু পাল্‌সের বিটটা একটু…কী ব্যাপার বলো তো ? কী হয়েছিল ? কোনও চোর-ডাকাতের পিছু তাড়া করেছিলে নাকি ?'

আবাল্যের সহপাঠী এই বন্ধুর কাছে কতটা খোলামেলা হওয়া যায়, মনে-মনে একটু খতিয়ে দেখেন সোমসাহেব। তারপর একটি-একটি করে সমস্ত কথাই বলেন বন্ধুকে। নিজের ভাবনা-চিন্তা থেকে শুরু করে ঘড়ভরণের মতামত—কিছুই বাদ দেন না। ড্রাইভার রামজনম সিংয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর আজকের সন্ধ্যার অভিজ্ঞতার কতটা মিল আছে, সেটাও উল্লেখ করতে ভোলেন না তিনি।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে বন্ধুর বক্তব্য শুনলেন সমরেশ। বেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'দ্যাখো ভাই, তোমাদের পুলিশ

লাইনের ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আমি নাড়ি টিপি, বড়ি দিই। তবে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে আমি বোধহয় তোমায় একটু সাহায্য করতে পারি।'

'কীরকম ?'

'আমার এক আত্মীয় আছেন, মানে আমার ভায়রাভাই আর কি ! ভদ্রলোক "স্মোক ন্যুইসেন্স ডাইরেক্টরেট"-এ বেশ ভাল পোস্টে আছেন। সেদিন আমার বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন ছেলে-বউ নিয়ে। তাঁকেও সেদিন ওইসব অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে কী যেন সব বলতে শুনেছিলাম। যদি চাও তো তোমাকে না হয় তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি।'

কয়েক সেকেন্ড বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সোমসাহেব বলেন, 'তা এসব অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে তাঁদের কোনও বিশেষ মতামত আছে নাকি ?'

'সেরকমই তো শুনলাম সেদিন।'

'কীরকম ?'

'অত বলতে পারব না ভাই।' ডাক্তার হাসলেন : 'বুঝতেই তো পারছ, সেসব হল ওঁদের নিজস্ব টেকনিক্যাল ব্যাপার। তবে তুমি যে-ব্যাপারে অনুসন্ধান করছ, সে-ব্যাপারে নাকি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন পরিস্থিতির বেশ একটা বড়রকমের হাত আছে। আরও কী যেন সব অ্যাসিড-ট্যাসিডের কথা বলছিলেন উনি।'

অবাক সোমসাহেব। বলেন, 'ভারি ইন্টারেস্টিং তো ! তুমি পারো তাঁর সঙ্গে আমার একটু যোগাযোগ করে দিতে ?'

'অসুবিধে কী ? বেশ তো, কাল রবিবার, বিকেলে আমার চেম্বার বন্ধ থাকে। আমি ফ্রি। চাও তো কালই তোমায় নিয়ে যেতে পারি।'

'বেশ রাজি। কাল তাহলে বিকেল পাঁচটায়।'

ডাক্তার-বন্ধু সমরেশ আগে থেকেই টেলিফোনে কথাবার্তা বলে রেখেছিলেন। মিস্টার মুখার্জি ওঁদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। প্রাথমিক আলাপ-পর্ব শেষ হওয়ার পর সোমসাহেব বললেন, 'আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারটা সমরেশের মুখে নিশ্চয়ই সব শুনেছেন, মিস্টার মুখার্জি। ও বলেছিল, এ বিষয়ে আপনাদেরও নাকি কিছু-কিছু বিশেষ মতামত আছে। সেটা জানতে পারলে আমাদের সুবিধে হয়।'

মৃদু হাসলেন মুখার্জি। তারপর খুব শান্তভাবে বললেন, 'আপনি ঠিক কোন বিষয়ে জানতে চান ? স্মোক ন্যুইসেন্স-এর ব্যাপারে ? তাহলে গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল যে, বিষয়টি খুব গভীর এবং ব্যাপক।'

এবার একটু ভাবনায় পড়েন সোমসাহেব। কী বলবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। শেষে বলেন, 'দেখুন মিস্টার মুখার্জি, আমি একটা দুর্ঘটনার

এনকোয়ারি রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম যে, কলকাতার একটা বিশেষ অঞ্চলে দুর্ঘটনার সংখ্যা যেন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ড্রাইভিংয়ে ড্রাইভারদের স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তি ছাড়াও এমন একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে, যেটাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। পারটিকুলার্‌লি ইন কেস অফ অ্যান অ্যাক্‌সিডেন্ট।'

'অ্যাক্‌সিডেন্ট !' সামান্য চোখ কোঁচকালেন মুখার্জি : 'দেখুন মিস্টার সোম, দুর্ঘটনাকে আমরা সাধারণত অসাবধানের পরিণাম বলে মনে করে থাকি। তবে আজকের দিনে, বিশেষ করে কলকাতায়, স্মোক ন্যুইসেন্সের সঙ্গে এর একটা বিশেষ যোগাযোগ আছে বলে আমাদের দপ্তর মনে করে। আর আমরা যা মনে করি, তা খুব অল্প কথায় সেরে ফেলার জিনিস নয়। আপনার হাতে যথেষ্ট সময় আছে তো ?'

'যথেষ্ট, যথেষ্ট। কোনও অসুবিধে নেই। আপনি বলে যান।'

'বেশ। তবে শুনুন—' বলে কীভাবে শুরু করবেন মনে-মনে সেটা গুছিয়ে নেন মুখার্জি। তারপর আরম্ভ করেন, 'যত দিন যাচ্ছে, আমাদের কলকাতার বায়ুমণ্ডল ততই বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এসপ্ল্যানেডের বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম এরিয়া ও উল্টোডাঙার গোটা অঞ্চলটা। এসব জায়গায় বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৭৪ পার্টস পার মিলিয়ন সালফার ডায়ক্সাইড মিশে এক অতি-ক্ষতিকারক অ্যাসিডিক মিস্ট তৈরি করছে। তার ওপর মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট ওই এরিয়ায় পাতাল রেলের কাজ করতে গিয়ে মাটির সঙ্গে প্রচুর ধুলো ওই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে ময়দানের খোলা হাওয়া আর আগের মতো নিষ্কলুষ থাকতে পারছে না।'

একটু কাশলেন মিস্টার মুখার্জি। থামলেন একটু। পরে আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু এখানকার থেকেও খারাপ উল্টোডাঙার অবস্থা। এখানকার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে একটা কথাই বলা যায়, ইট ইজ হরিব্‌ল ! আপনারা যদি একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে খতিয়ে দেখেন, ওই অঞ্চলে দুর্ঘটনার সংখ্যা, কলকাতার অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশি। কারণ ? উল্টোডাঙাকে কেন্দ্র করে আপনি যদি চারধারে সমীক্ষা চালান, তাহলে দেখবেন, তার আশেপাশেই বড়-বড় অ্যাসিড ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট। যেখানে দিন-রাত্তির প্রোডাক্‌শনের কাজ চলছে। ফলে অ্যাসিড ভেপার প্রতিনিয়তই দূষিত করে চলেছে বায়ুমণ্ডলকে। এখানকার বাতাসে সালফার ডায়ক্সাইড তো এমনিতেই আছে, এর ওপর যোগ হচ্ছে এই অ্যাসিড ভেপার। এ-দুটির মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল হঠাৎ-হঠাৎ মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলা। কখনও-কখনও বা মানুষ সম্পূর্ণভাবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে।'

'কী বলছেন আপনি !' প্রায় চিৎকার করে ওঠেন সোমসাহেব।

'ঠিকই বলছি। খুব সম্প্রতি 'ন্যাশনাল এনভায়রন্‌মেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ

ইনস্টিটিউট' তাঁদের সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এই কলকাতায় কিছু না হোক, অন্তত ছ' হাজার কলকারখানা আছে। তারা সমবেতভাবে প্রতিদিনে ৩৯৬ টন ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গৃহস্থের জ্বালানি ছড়াচ্ছে ১২৬ টন। তা ছাড়া শীতকালে টায়ার পোড়া, কাঠ পোড়ানো তো আছেই। তাহলেই বুঝে দেখুন অবস্থাটা।'

'তাহলে আপনি বলতে চাইছেন—' ডাক্তার সমরেশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখার্জি বললেন, 'আমি কিছুই বলছি না, সমরেশবাবু। এ বলছে আমাদের সমীক্ষা, আমাদের নথিপত্র। শুধু দৃষ্টিশক্তি কেন, এই দূষিত বায়ুমণ্ডল এমন এক-একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, যাতে শ'য়ে-শ'য়ে লোক উজাড় হয়ে যাবে। রেফারেন্স হিসেবে ১৯৪৮ সালের ক্যালিফোর্নিয়ার ডোনোরা এয়ার পলিউশানের কথা বলতে পারি, যার দরুন এক ঘন্টায় পাঁচশো লোক মারা যায়। কিংবা ধরুন ১৯৫২ সালের গ্রেট লন্ডন ফগের কথা। লন্ডন শহরের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তখন।'

একটু থামেন মিস্টার মুখার্জি। কী যেন ভাবেন। পরে বলেন, 'শুধু সেখানেই বা কেন ? আমাদের এই কলকাতার উল্টোডাঙায় হয়নি ?'

'উল্টোডাঙাতেও হয়েছে!' সোমসাহেবের গলা আড়ষ্টভাবে ঘড়ঘড়িয়ে ওঠে।

'ও ইয়েস! উল্টোডাঙার স্টেশন এরিয়ার এয়ার পলিউশান এমনই সাঙ্ঘাতিক যে, কয়েক বছর ধরেই জায়গায়-জায়গায় নানারকম ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েই চলেছে। রেলওয়ে ড্রাইভাররা দিনের পর দিন ওপরওলার কাছে নালিশ করেই চলেছেন যে, তাঁরা সিগন্যাল ঠিকমতো দেখতে পান না। বিশেষ করে শীতকালে।'

চুপ করে থাকেন সোমসাহেব। তাঁর মাথার ভেতর একটা চিন্তার ছায়া আষাঢ়ের গুরুভার মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ে ধীরে-ধীরে। না, ঘড়ভরণের 'দেওতা'র দান নয়, এ তবে আজকের সভ্যতার দেওয়া বখেড়া। ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়েই চলেছে তার সংখ্যা।

মনে পড়ে ড্রাইভার রামজনম সিংয়ের জবানবন্দী। সে নাকি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্য। আরও কয়েকটা স্টেটমেন্ট মনে পড়ছে। কেউ-কেউ বলেছে, তাদের ব্রেন সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে পড়েছিল। বেশি কথা কী, তাঁর নিজেরই তো···

'তা বলে অবশ্য আমি এ-কথা বলতে চাইছি না যে—' মিস্টার মুখার্জি তখনও বলে চলেছেন, 'ড্রাইভাররা রাফ ড্রাইভিং করেন না। বেহিসেবি ড্রাইভিং থাকতেই পারে, সব দেশেই আছে। হাতে স্টিয়ারিং থাকলে আপনা হতেই মানুষকে একটা গতির নেশায় পেয়ে বসে। তবু যা ঘটে তার সবকিছুর জন্যে হতভাগ্যদের দায়ী করা যায় না।'

মুখার্জি থামতেই সোমসাহেব বলেন, 'আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি, এর কি কোনও বিহিত নেই ? বিদেশিরা এই ন্যুইসেন্স কীভাবে কন্ট্রোল করে ?'

'আরে মশাই, ওদের কথা ছাড়ান দিন। ওদের দেশে যা সম্ভব, আমাদের দেশে তা সম্ভব হতে অনেক দেরি। এখন আমাদের দেশে যে "স্মোক পলিউশন" আইন চালু আছে, সেটি প্রথম বলবৎ হয় ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই আইনকে শক্তিশালী করতে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট, অর্থাৎ সংশোধনী প্রস্তাব পর্যন্ত নেওয়া হয়নি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।'

আর কিছু বলতে পারেন না সোমসাহেব। মুখার্জিও চুপচাপ। সমরেশবাবুও নীরব। সকলের মনই এক ভীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় যেন কোণঠাসা। এরই মাঝে সোমসাহেবের একসময় মনে হয়, বিপদ যখন আছে অথচ বিহিত নেই, সেক্ষেত্রে বখেড়া তো থাকবেই। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্টটা কীভাবে খাড়া করা যায় ?

ছবি : অনুপ রায়

অণুঘ্রাণ যন্ত্র

রেবন্ত গোস্বামী



বারান্দায় ইজি চেয়ারে আধোশোয়া হয়ে রাস্তার দিকে আনমনা ভাবে চেয়ে থাকতে-থাকতে দশ বছর আগের চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁটার ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। পাশের ছোট সাইড টেবিলে চিঠিটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মতো। চিঠিটার সঙ্গে এক কাপ চা-ও চাকর ফুলচাঁদ দিয়ে গিয়েছিল। সেটা কখন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে খেয়ালই করিনি! দশ বছর আগে বাদলের সেই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের চিহ্নটাই এখন যেন খড়্গের রূপ ধরে মনের মধ্যে ঝলসে উঠছে।

'আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় কী-কী, বল তো সন্তু?'

হঠাৎ এ রকম প্রশ্নে অবাক হলাম।

বাদলের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে মোগলাই পরোটা খাচ্ছিলাম। বাদল তখন কলকাতার এক প্রথম শ্রেণীর কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর মিত্র, আর আমি এক দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙের কোম্পানির আঞ্চলিক বিক্রয় অধিকর্তা। কাজেই আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে পরিচিত কারও কাছে বিসদৃশ মনে হবে হয়তো। কিন্তু স্কুল-জীবন থেকে যারা আমাদের চেনে তাদের কাছে হবে না। কর্ম-জীবন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেও, আর কলকাতার দুই প্রান্তে দুজনে থাকলেও, ছুটিছাটার দিন একসঙ্গে আড্ডা দেওয়ার অভ্যেসে সেটা কোনও অন্তরায় হতে পারেনি। দুজনের আবাল্যের বন্ধুত্ব বজায় ছিল। দুজনেই অবিবাহিত ছিলাম বলে সাংসারিক দায়দায়িত্বও আমাদের আড্ডার পথে অন্তরায় হয়নি।

সেদিন বাদলের এই হঠাৎ-প্রশ্নে অবাক হলেও গুরুত্ব দিইনি। ভাবলাম, মোগলাই পরোটার সঙ্গে জিভ আর নাকের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। সেটাই হয়তো তার চিন্তাধারাকে এই স্কুলে-পড়া বিষয়টাতে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

পঞ্চভূত, পঞ্চপাণ্ডব আর পঞ্চনদীর মতো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নামও ছোটবেলা থেকেই মুখস্থ। চটপট উত্তরও দিলাম, 'চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।'

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল বাদল, 'তাদের কাজ?'

বন্ধু হলেও তো কলেজের একজন অধ্যাপক। বুড়ো বয়সে এসব কী ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছে এই লোকজনে-ভরা রেস্তোরাঁতে। একটু বিরক্তই হলাম। তবুও পরীক্ষার পড়া মুখস্থ বলার মতো বলে গেলাম, 'রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ উপভোগ করাই এদের কাজ।'

বাদল চোখ বুজে মাথাটাকে একটু নাড়াল। তারপর বলল, 'এটাকে এভাবে সাজালে ঠিক হত— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। তাহলে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নামগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি থাকত। কিন্তু একটা জিনিস কখনও লক্ষ করেছিস? এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এর প্রথম দুটোকে নিয়ে বিজ্ঞানীদের যত কারবার, যত আবিষ্কার। গ্রামোফোন বল, বায়োস্কোপ বা সিনেমা বল, রেডিও টিভি যা-ই বল, সবই ওই দেখা আর শোনার ব্যাপার। অথচ দ্যাখ, মানুষের এই দুটো ইন্দ্রিয়ই কথায়-কথায় নষ্ট হয়ে যায়। গন্ধশক্তি, স্বাদগ্রহণের শক্তি বা স্পর্শশক্তি একেবারে নষ্ট হওয়ার কথা খুবই কমই শোনা যায়। তবুও এই তিন ইন্দ্রিয়ের কাজের ওপরে তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়নি। করার চেষ্টাও বড় একটা কেউ করেনি।'

বুঝলাম, বাদল পদার্থবিজ্ঞানের কথাই তুলছে, আতর, সেন্ট বা মোগলাই পরোটার মতো রসায়নের ব্যাপার নয়।

একটু হেসে বললাম, 'আসল ব্যাপারটা হল, ওই তিন ইন্দ্রিয়ের কাজটা অনেকটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, তাই না? এই যেমন, একটু ভালমন্দ চেখেচুখে খেলাম, ভাল খাবারের ভুরভুরে গন্ধে জিভের জল টানলাম, আর খাওয়ার পরে নরম বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুম দিলাম। তখন অবশ্য নাসিকার আর একটা কাজও অনেক কুম্ভকর্ণের বেলায় শোনা যায়। যাই হোক, এই তো বাকি তিন ইন্দ্রিয়ের কাজ। বিজ্ঞানীরা এতে হস্তক্ষেপ না করলেই বাধিত হব। তাছাড়া এইসব খাওয়া আর ঘুমোনোর কাজগুলোকে তেনারা অলস লোকের স্থূল ব্যাপারই মনে করেন।'

আমার কথায় বাদল যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, 'ওটাই তো তোদের মতন সাধারণ মানুষের মনোভাব। মানুষের এই তিন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়েও অনেক কিছু আবিষ্কার করা যেতে পারে। কুকুরের কথা ধর। কী করে ওরা শুঁকে জিনিসের স্বরূপ বুঝে নেয়। আবার হাতি তো এই তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করেই বনেজঙ্গলে চরে বেড়াচ্ছে। শুনেছি, তারা শুধু কয়েক মাইল দূর থেকে মানুষের গন্ধই পায় না, তারা দেশি লোক না বিদেশি লোক সেটা পর্যন্ত গন্ধে বুঝতে পারে। আমাদের ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতাকে যদি এইভাবে বাড়িয়ে দিতে পারা যায়, তবে কত সুবিধে হয় বল তো? অন্ধদের বেলায় তো চলতে-ফিরতে কোনও সাহায্যই লাগবে না!'

'গন্ধবিচার'-এর প্রসঙ্গটা অবশ্য সেদিন আর এগোয়নি। তারপর তিন বছর বাদল দেশে ছিল, কিন্তু কুকুর বা হাতির সৌভাগ্য নিয়ে আর কোনও কথা বলেনি।

তারপর ও আমেরিকায় চলে গেলে অনেক বছর পরে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হল। চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল অবশ্য, কিন্তু তাতে কি আর সেই আড্ডার স্বাদ আছে!

তারপর যা হয়— আস্তে-আস্তে চিঠিপত্রও অনেক কমে গেল। বাদল লিখেছিল, সে গবেষণার ব্যাপারে ব্যস্ত বলে হয়তো ঠিকমতো চিঠিপত্র লিখতে পারবে না, তাতে আমি যেন কিছু মনে না করি।

চিঠি লেখার ব্যাপারে আমিও আলসে। কাজেই দু-দিক থেকেই ভারসাম্য হয়ে গেল, আর বাদলের সঙ্গে বিচ্ছেদের যে মনোকষ্টটা, সেটাও যেন অন্য কাজকর্মের মধ্যে ফিকে হয়ে গেল।

অনেককাল পরে বাদলের একটা চিঠি এল। চিঠিটা পড়ে তো অবাক হয়ে গেলাম! বাদল সত্যিই এসব করেছে? না কি আমাকে বোকা বানাচ্ছে? বাদল লিখেছে:

সন্তু,

মানুষের ঘ্রাণশক্তিকে আরও তীব্র করার ব্যাপারে অনেক বছর আগে তোকে একবার বলেছিলাম, মনে আছে কী? তুই ভাবিস না যে, আমি শুধু কতকগুলো কথার কথা বলেছিলাম। আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছি। নাম দিয়েছি, মাইক্রো-ওডোর। বাংলায় বলতে পারিস, অণুঘ্রাণ যন্ত্র। এটা নাকে লাগালেই সব জিনিসের গন্ধ এতে ধরা পড়বে। শুধু ফুল, আতর, পচা জিনিস বা তোর ওই ভুরভুরে খাবারের গন্ধই নয়। আমি এই যন্ত্র নাকে লাগিয়ে চোখ বুজে বলে দিতে পারি— সামনে গাছ আছে, না গাড়ি আছে, না মানুষ আছে। প্রতিটি জিনিসের গন্ধ চিনে নিচ্ছি। এরপর বলতে পারব, শুধু গাছ নয়— কী গাছ আছে, সেটাও। আকাশের গায়ে কেন টকটক গন্ধ— কথাটা হয়তো একেবারে আবোল-তাবোল নয়। হাইড্রোজেন বেশি থাকলে সত্যিই টকটক লাগে। আচ্ছা সন্তু, তুই কি জল পিপাসার সময় টিউবওয়েলের জল খেয়ে তার লোহা-লোহা গন্ধ পাসনি? বৃষ্টির পরে মাটির সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, বাগানে ঢুকে গাছের একটা হালকা ঠাণ্ডা গন্ধ, কি পুকুরের জলে শ্যাওলা আর মাছের গন্ধ?

আমি এখন সব গন্ধ পাই এই যন্ত্র নাকে লাগিয়ে। লোহার গন্ধ, তামার গন্ধ, সোনার গন্ধ— সবকিছু। এবার সেই রূপকথার রাক্ষসের মতন মানুষের গন্ধও মুখস্থ করে ফেলব। খুব চেনা মানুষের গন্ধও যে আমাদের চেনা থাকে, সেটা হয়তো আমরা নিজেরাই জানি না। ছোটবেলায় মায়ের শাড়িতে মায়ের গন্ধ পেতাম। বাবার গামছায় পেতাম বাবা-বাবা গন্ধ। একবার



অনেককাল পরে বাদলের একটা চিঠি এল। চিঠিটা পড়ে তো অবাক হয়ে গেলাম! বাদল সত্যিই এসব করেছে? না কি আমাকে বোকা বানাচ্ছে?

এ-কথা বলে ফেলাতে সবাই খুব হাসাহাসি করেছিল। মাইক্রো-ওডোর নাকে বসালে সবার হাসি বন্ধ হবে।

যন্ত্রটার দুটো অসুবিধে ছিল। একটাকে এতদিন পরে দূর করেছি। সেটা হল, প্রথমের দিকে ওটা পরলে বাতাসের গন্ধে, অর্থাৎ নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের গন্ধেই সবকিছু চাপা পড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে একটা ফিল্টার আবিষ্কার করে ওতে লাগিয়ে দিয়েছি। এতে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের গন্ধ মাইক্রো-ওডোরে ঢুকবে না। দ্বিতীয় অসুবিধেটা অবশ্য দর্শনধারী। নাকে ওরকম একটা যন্ত্র এঁটে রাখলে দেখতে খুব সুন্দর লাগে না। তবে মনে হয়, চশমার মতন এটা দেখতেও লোকে একদিন অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

তুই বাল্যবন্ধু বলেই তোকে মাইক্রো-ওডোরের কথা জানালাম। একজনকে না জানালে সেই 'হাজামের' মতন পেটটা ফুলে যাচ্ছিল। তুই এখনই কাউকে বলিস না। এ-ব্যাপারে আরেকটু এগিয়ে তবেই পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করব আমার আবিষ্কারের কথা। কারণ, এখনও এটাকে তেমন শক্তিশালী করা যায়নি। এরপরে আমার মনে আছে টেলি-ওডোরের পরিকল্পনা। অনেক দূরের জিনিসের গন্ধ ধরা পড়বে তাতে। হাতির শুঁড়ের মধ্যে প্রকৃতি যে টেলি-ওডোরের মালমশলা দিয়েছেন, আমার যন্ত্রের মধ্যেও থাকবে সেগুলোই।

আশা করছি বছর দেড়েক পরে যখন ভারতে যাব তখন মাইক্রো-ওডোরের খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে। তোকে একটা যন্ত্র উপহার দেব। তখন লোডশেডিং হয়ে গেলে অন্ধকারে গন্ধ শুঁকেই মোমবাতি পেয়ে যাবি। হাতড়াতে হবে না।

—বাদল

মাইক্রো-ওডোরের ব্যাপারটা আমার কাছে উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হল। কিন্তু কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করে একটু খোঁচা দিয়ে বাদলের চিঠির উত্তর দিলাম :

...বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতে জল্লাদ না থাকলেও পটাশিয়াম সায়ানায়েড তো আছে। তাই এক শিশি আমার জন্যে আনিস। গন্ধ শুঁকে মরার মতন আহ্লাদ আমার হয়নি। সত্যি কথা বলতে কী, মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধই আমার ভাল লাগে। সেইজন্যে জুঁই, বেল, চামেলির গন্ধ, চাঁপা, বকুলের গন্ধের চেয়েও আমার প্রিয়। আর তাছাড়া আশেপাশে ইঁদুর-টিদুর মরে পচলে তোর ওই.

মাইক্রো-ওডোর তো জল্লাদের কাজই করবে।...

এরপর অনেকদিন বাদলের কাছ থেকে আর কোনও চিঠি না পাওয়ায় ওই ধরনের চিঠি লেখার জন্য আমার একটু অনুতাপই হল। আমিই একমাত্র লোক যাকে সে বিশ্বাস করে তার ওই যন্ত্রের কথা লিখেছে। আমার ওভাবে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি।

নববর্ষের চিঠিটা এবার আমিই আগে লিখলাম। তার যন্ত্রটা কীরকম কাজ দিচ্ছে, টেলি-ওডোরের সাফল্য কতদূর, এইসব জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম ওই চিঠিতে। ভাবলাম, হয়তো সে খুশি হবে এতে।

চিঠির উত্তর পেলাম। কিন্তু কেমন একটা বিষাদের সুর যেন তাতে। বাদল লিখেছে :

সন্তু,

জানিস মাইক্রো-ওডোরে আমি বেশ কয়েকমাস ধরে একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছি। দিন-দিনই গন্ধটা বাড়ছে। খুব চেনা-চেনা মনে হয় গন্ধটা। কেমন একটা মনখারাপ করে দেয় সেটা। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না কিসের গন্ধ। কোনও জিনিসের গন্ধের সঙ্গে আরেকটা জিনিসের গন্ধের মিল নেই— যেমন, দুটো জিনিস একরকম দেখতে হয় না। এটা কিসের গন্ধ? নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা অন্য কোনও গ্যাসের গন্ধ নয়। সেসব গন্ধ আমার চেনা। অথচ এই গন্ধ আমি যেন কোথায় পেয়েছি। ছোটবেলায় কোথাও। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কাউকে বলতেও পারছি না। কারণ, আমার যন্ত্রের কথা এখনও কাউকে বলিনি। এই গন্ধটা কিসের, সেটা না জানা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

—বাদল

বন্ধুর চিঠিটা পেয়ে মনখারাপ হয়ে গেল। কোনও সন্দেহ নেই, ওর মাথাখারাপ হয়েছে। আমেরিকা থেকে একজন পরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁর কাছেও সেরকমটাই শুনলাম।

কয়েক মাস পরেই বাদল কলকাতায় ফিরল। বলা উচিত, ফিরিয়ে আনা হল।

কিন্তু তখন সে প্রায় স্মৃতিশক্তিহীন। দেখা করতে গেলে আমাকেও সে চিনতে পারল না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। আমেরিকার ডাক্তাররা বললেন, ব্রেন ক্যানসার। বাঁচার আশা নেই বললেই হয়। তাই চিকিৎসা বা অপারেশান যাই হোক, ভারতে এনে করাই ভাল— এটাই ছিল সবার অভিমত। তাতে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাটা অন্তত হবে।

বাদলের অপারেশান সাকসেসফুল হয়েছিল কিনা জানি না, কারণ ভেলোর থেকে শুধু তার মৃতদেহটা ফিরে এসেছিল।

খবরটা পেয়ে গুম হয়ে বসে ছিলাম দোতলার বারান্দায়। সেই ছোটবেলা থেকে সেদিন পর্যন্ত কত ঘটনা, কত কথা মনে পড়তে লাগল, যার সঙ্গে বাদলের স্মৃতি জড়িয়ে। বাদলের কি তবে সত্যিই মাথাখারাপ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই! মাইক্রো-ওভেনের ব্যাপারস্যাপার সবই কি তার অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা!

চুপচাপ ভাবছি, এমন সময় নিঃশব্দে চা দিয়ে গেল ফুলচাঁদ। সঙ্গে চিঠিটাও। ইউ-এস-এ ছাপ মারা এরোগ্রাম। এখন আবার ওখান থেকে কে আমাকে চিঠি লিখবে! অবাক হয়ে চিঠিটা খুললাম।

দেখি, বাদলের চিঠি! হয়তো অনেক আগেই আমাকে লিখে রেখেছিল, ডাকে দেয়নি। এতদিন পরে কারও নজরে পড়তে ওটা পোস্ট করে দিয়েছে।

অসংলগ্ন লেখা, হাতের লেখাও আঁকাবাঁকা। সাজিয়ে-গুছিয়ে পড়লে চিঠিটা এরকম :

আমি এতদিনে জানতে পেরেছি, ওটা কিসের গন্ধ। মৃত্যুর গন্ধ! ছোটবেলায় দাদুর মৃত্যুর আগে দাদুর ঘরে গেলেই ওই গন্ধ পেতাম। তখন অত খেয়াল করিনি। আজ মাইক্রো-ওভেনে সেই অল্পপরিচিত গন্ধটা আরও ভালভাবে ধরা পড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না...

এখানেই অসমাপ্তভাবে শেষ হয়েছে চিঠিটা।

খামটা হাতে ধরে হতভম্ব ভাবে বসে থাকলাম। বাদলের দাদুর কথা মনে পড়ল অস্পষ্ট ভাবে। তবে খুব ভালভাবেই জানি, বাদলের দাদুর মৃত্যু হয়েছিল কীভাবে। তাঁর ক্যানসার হয়েছিল, গলার ক্যানসার।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

চৈতন্যচরণ

পরেশ দত্ত



প্রায় পঁচিশ বছর পর সূর্যের চিঠি পেলাম।

দিল্লি ইউনিভার্সিটির চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। শুনেছি তুইও রাজ্য সরকারের চাকরি থেকে রিটায়ার করেছিস। আমাদের পিংলার জমিদারবাড়ির কথা তো তোর মনে আছে। রিটায়ার করে ওই বাড়িতেই উঠেছি। বহুকাল সংস্কারের অভাবে বার-মহলের এখন ভগ্নদশা। সমস্তটা সংস্কার করতে গেলে রিটায়ার করে যা পেয়েছি সবই বাড়ির পিছনে তলিয়ে যাবে। একটা অংশ কোনওরকমে মেরামত করে নিয়ে বাস করছি। অনেকদিন পড়ে থেকে বাড়িটা ভূতের বাড়ি হিসাবে এ-অঞ্চলে ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। এসে দিন পনেরো বেড়িয়ে যা। ভূত আছে কি নেই, ও পুরনো তর্কের ভেতর না গিয়েও বলতে পারি তোর কোনও অসুবিধে হবে না। শহর থেকে দূরে হওয়ার জন্যে এখানে আর যাই-ই পাওয়া যাক আর নাই যাক, এখনও খাঁটি দুধ আর ঘি পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় পুকুরের মাছ আর টাটকা শাকসব্জি। বাজি রেখে বলতে পারি শীতের দিনে এক মাসের মধ্যে তোর পাঁচ কেজি ওজন না বাড়লে হাজার টাকা হারব। রিটায়ার করার পরও যদি ত্রিশ বছর আগের জীবন ফিরে পেতে চাস দেরি না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়। তবে সন্ধের পর একটু অসুবিধে হবে—এদিকে এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয়নি। চেষ্টা করছি আনতে। খুব বেশি দেরি হবে না। পিংলার বাড়ি নিয়ে অনেকরকম গুজব আছে। গুজবে কান দিস না। নিজের চোখ ছাড়া অন্যের কথায় বিশ্বাস করিস না।

আশা করি শিগ্‌গিরই আসছিস। —তোর সূর্য

বর্ধমান জেলার গলসি রেলস্টেশন থেকে মাইল পনেরো বাসে। বাস থেকে নেমে আরও তিন ক্রোশ দূরে পিংলা। আগে যেতে হত গরুর গাড়িতে, এখন অবশ্য সাইকেল রিকশা চলছে পাকা সড়কে। এককালে পিংলার জমিদার ছিলেন সিংহরায়েরা। হরিনারায়ণ সিংহরায় তস্য পুত্র নরনারায়ণ সিংহরায় তস্য পুত্র সূর্যনারায়ণ— এই সূর্য ছিল আমার সহপাঠী। কলকাতায় সিমলার মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছে ও। একবার ওর খুড়তুতো বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে ওদের পিংলার বাড়িতে গিয়েছিলাম। প্রকাণ্ড চৌহদ্দির মধ্যে বাগানঘেরা দোতলা দু-মহলা বাড়ি। বিশাল ফটক পেরোলেই ফুলের কেয়ারির ভেতর ফোয়ারা। পথের দু-দিকে ডানাওয়ালা শ্বেতপরী। পেল্লায় উঠোন ঘিরে দালান আর সার-সার বড় ঘর। অন্দরমহলের উঠোনের মাঝ বরাবর শিবমন্দির। মার্বেলে বাঁধানো চওড়া সিঁড়ি দোতলার বারান্দা পর্যন্ত উঠে গেছে। সব ঘর আর বারান্দার মেঝে সাদা-কালো চৌকোনা পাথর দিয়ে বাঁধানো। পঙ্খের কাজ করা মোটা-মোটা থামের ওপর বারান্দার ছাদ। ঘরে-ঘরে শ্বেতপাথরের টেবিল। লাল-নীল ভেলভেট মোড়া পিঠ-উঁচু চেয়ার, আরামকেদারা, লাল গালচে মোড়া সিঁড়ির মাথার দিকে দেওয়ালে সাজানো প্রাচীন জমিদার বংশের পূর্বপুরুষদের অয়েল পেন্টিং।

কলকাতা থেকে গিয়ে পিংলার জমিদারবাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বোনের বিয়ের পরও ছাড়তে চায়নি সূর্য। আরও দিন পনেরো থেকেছি ওখানে। বাড়িতে সবসময় লোকজন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গমগম করছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমিদারি প্রথা উঠে গেছে। সূর্যের কাছে শুনেছি ওদের শরিকেরা জমিদারবাড়ি ছেড়ে বা সম্পত্তির অংশ অন্য শরিককে বেচে দিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। সংস্কারের অভাবে ভেঙে-ভেঙে পড়েছে প্রাচীন জমিদারমহল।

সূর্য ওর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সেই হিসাবে সদরমহলের একমাত্র মালিক। ওর বাবা-মাও বহুকাল আগে গত হয়েছেন।

সূর্য শুধু আমার মাসতুতো ভাই-ই নয়, বন্ধুও বটে। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। অন্য বিষয়ে মোটামুটি নম্বর পেলেও, অঙ্কে প্রায়ই ও ফেল করত। গ্রেস মার্ক না দিলে ক্লাসে উঠতে পারত না। ম্যাট্রিকেও অঙ্কে টেনেটুনে পাশ করেছিল। তাই ম্যাট্রিক পাশ করে আই. এস-সি পড়তে চাইলে আমাদের মামা বলেছিলেন, 'তুই বিজ্ঞানী হলে কাঁঠাল গাছে কুমড়ো ফলবে।' আমিও ডিটো দিয়েছিলাম মামার কথায়।

কিন্তু সকলের সব হাসি-তামাশাকে মিথ্যে করে দিয়ে এম. এস-সি পাশ করে দিল্লিতে ওর আই. সি. এস. দাদামশাইয়ের কাছে চলে গিয়েছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে প্রফেসর হয়েছিল।

সূর্য কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার পর বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। চিঠিপত্রেও তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে কেউই আমরা কাউকে ভুলিনি।



'কফি !' অবাক হয়ে তাকালাম লোকটির দিকে। আমি কফি খেতে চাই লোকটা বুঝল কেমন করে!

সূর্য বিয়ে-থাও করেনি।

আমার রিটায়ার্ড লাইফ। শুয়ে-বসে দিন আর কাটতে চায় না। পাড়ার একমাত্র লাইব্রেরির বই প্রায় শেষ করে এনেছি। তাই সূর্যকে চিঠির উত্তর দিয়ে দিন চারেকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি।

দুপুরের খাওয়া সেরে হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠেছি। শীতের ছোট বেলা। গলসিতে ট্রেন থেকে নেমে বাসে উঠেছি। বাসেই বেলা পড়ে এল। সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। আমাকে নামিয়ে দিয়ে লাল ধুলো উড়িয়ে বাস চলে গেল।

বাসস্ট্যান্ডের কাছে গোটা কয়েক দোকান। চায়ের দোকানও একটা আছে। ছ' মাইল দূরের পিংলায় কোনও সাইকেল রিকশাওয়ালাই যেতে রাজি নয়। পাকা সড়ক, কিন্তু আলো নেই। তার ওপর পিংলার জমিদারবাড়িতে যাব শুনে অনেকেই আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল।

একজন বলল, 'ওটা তো অনেককালের পোড়োবাড়ি, বাবু। কার কাছে উঠবেন ? কেউ থাকে না ওখানে।'

আর-একজন বলল, 'ও-বাড়িতে কে একজন বাবু কিছুদিন আগে উঠেছেন। লরিতে অনেক মালপত্র এনেছেন।'

শেষপর্যন্ত দশ টাকা কবুল করাতে একজন রিকশাওয়ালা পিংলার জমিদারবাড়িতে যেতে রাজি হল। সুটকেস নিয়ে রিকশাতে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও-বাড়ির বাবুর সঙ্গে আর কে থাকে যেন ?'

'ঠিক বলতে পারব না, বাবু।' জোরে প্যাডেল চালিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'জমিদারবাবুর ছেলে ছাড়া আর কাউকে বাড়ির বাইরে আসতে দেখিনি।'

পথের দু-দিকে ধানখেত। দূরে-দূরে গ্রাম। পৌষের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। পথেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। লণ্ঠন হাতে দু-একজন পথচলতি মানুষ ছাড়া আর কারওর চিহ্ন নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পিংলার জমিদারবাড়ি কি কেউ দেখাশোনা করত না ?'

'হ্যাঁ, বলাইখুড়ো দেখাশোনা করত। তবে রাতবিরেতে ওখানে কেউ থাকতে সাহস করত না। সন্ধে রাতেই জমিদারবাড়ি একেবারে শুনশান। পাশ দিয়ে যেতে আমাদেরই বুক দুরুদুরু করে।'

মনে হল কাজ নেই পিংলার পোড়ো জমিদারবাড়িতে গিয়ে। এখান থেকেই ফিরে যাই। সূর্য ভূতের সঙ্গে রাত কাটাতে পারলেও আমি পারব না।

রিকশাওয়ালা বলল, 'এসে গেছে, বাবু।' অন্ধকারে একটা নিরেট অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই পিংলার জমিদারবাড়ি।'

ইতিমধ্যে অন্ধকারে চোখ কিছুটা সয়ে এসেছে। গেটের ওদিকে অন্ধকার বার-মহলের একটা বন্ধ ঘরে যেন আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। রিকশা থেকে নেমে দাঁড়াতে রিকশাওয়ালা ছোকরাটি বলল, 'আমার ভাড়াটা মিটিয়ে দিন, বাবু। ভেতরে যেতে পারব না।'

সুটকেস হাতে নিয়ে দেউড়ির দিকে পা বাড়ালাম। ফটকের দুটো কাঠের

পাল্লার একটা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। আর-একটার কোনও চিহ্ন নেই।

টর্চ জ্বেলে ভেতরে এগিয়ে গেলাম। একটা কালো বেড়াল ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে তেড়ে এল। ডান দিকের একটা ঝাঁকড়া আমগাছের অন্ধকার ডালে পেঁচার ডাক শোনা গেল। বারান্দার সিঁড়িতে পা দিতে একটা বাদুড় কালো ডানা মেলে মাথার ওপর চক্কর দিয়ে উড়তে লাগল।

বারান্দায় একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। শীতের রাতে সব ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। সামনের একটা ঘরের বন্ধ জানলার ওদিক থেকে আবছা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কোনও মানুষের সাড়া নেই। সূর্যকে চিঠি পাঠিয়েছি, সে নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

দরজার কড়া নেড়ে ডাকলাম, 'সূর্য... সূর্য...'

কোনও সাড়া নেই।

আরও দুবার কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন এগিয়ে আসছে।

'কে?' অচেনা গলা।

'সূর্য, আমি।' সাড়া দিলাম।

খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল বছর ত্রিশেক বয়সের এক ছোকরা। মাথায় লম্বা চুল, পরনে ঢোলা ফুলপ্যান্ট, ঢলঢলে ফুলহাতা শার্ট। চোখে চশমা।

'কাকে চান?'

'সূর্য... সূর্যনারায়ণ সিংহরায় আছেন?'

'আপনি কি কিরণময় চন্দ্র?'

'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে আসছি—' হেসে জানালাম।

'ও, আসুন...আসুন... আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।' হাত থেকে আমার সুটকেসটা টেনে নিল লোকটি। ওর গলার স্বর কেমন যেন খনখনে।

কালিপড়া হারিকেনের হলদেটে আলোয় নজর পড়ল আশপাশে। ঘরের ভেতর একটা পুরনো আমলের পালঙ্ক। গোটা দুই উঁচুপিঠওয়ালা চেয়ার, একটা টিপয়। আগের সেই লাল ভেলভেট আর নেই।

'বসুন।' সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল লোকটি।

চেয়ারে আরাম করে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'সূর্যকে দেখছি না—'

'একটা বিশেষ দরকারে উনি সদরে গেছেন।' হাসল লোকটি : 'আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। আমার ওপর আপনার দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছেন উনি।'

'কখন ফিরবে সূর্য?'

'বেশি দেরি হবে না।'

ভাবলাম সারাদিন ট্রেনে-বাসে, খোলা রিকশায় এসেছি, গরম জলে চান করে

নিলে মন্দ হত না।

'আপনাকে গরম জল দেব ?'

লোকটির দিকে মুখ তুললাম। একেই বলে বুঝি মেঘ না চাইতেই জল।

'হ্যাঁ, দিন।'

স্নানের পর ভাবলাম, এই ঠাণ্ডায় এক কাপ কফি পেলে মন্দ হত না।

'স্যার, আপনার কফি আনছি।' চোখ তুলে দেখি কখন যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটি।

'কফি !' অবাক হয়ে তাকালাম লোকটির দিকে। আমি কফি খেতে চাই লোকটা বুঝল কেমন করে ! গরম জলে চান করতে চাই সেটাও বলার আগেই বুঝতে পেরেছিল।

লোকটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম কী ?'

'আজ্ঞে, চৈতন্যচরণ।' সবিনয়ে জানাল লোকটি, 'আমাকে তুমি করে বলবেন, সূর্যনারায়ণ আমার কর্মপিতা, আপনি তাঁর বন্ধু।'

কর্মপিতা...আরও অবাক হয়ে ভাবলাম, ধর্ম-ছেলে... ধর্ম-বাবা হয়, কিন্তু কর্মপিতা ! সে আবার কী ?

'স্যার, ধর্মটর্ম উনি মানেন না। শুধু কর্মই মানেন—তাই কর্মপিতা। মানে, ওঁর সব কাজকর্ম আমিই করে দিই।'

কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রেখে চৈতন্যচরণের দিকে তাকালাম। মাথার পিছনে একটা মোটা টিকি।

'চৈতন্যচরণ,' হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মাথার পিছনে দেখছি বিরাট চৈতন। একালের ছেলে হয়ে চৈতন রেখেছ !'

'চৈতনটা আছে বলেই বেঁচে আছি স্যার, নইলে সূর্যবাবু কবে তাড়িয়ে দিতেন।'

'তুমি কি ওর সব কাজকর্ম করে দাও— মানে কাজের লোক ?'

'তা বলতে পারেন, তবে শুধু কাজের লোক নই— সব কাজেই আমি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

'তা বেশ... তা বেশ... আজ রাত্রে কী রান্না করছ, চৈতন্যচরণ ?'

ভাবলাম শীতের রাতে খিচুড়ি, ডিমভাজা, টমেটোর চাটনি হলে মন্দ হত না।

চৈতন্যচরণ বলল, 'রাত্রে গরম ভাত, মুরগির ঝোল আর খেজুরের চাটনি রান্না হবে। স্যার, আপনি যা ভাবছেন তা আজ আর হবে না— ওঁর হুকুম নড়চড় হওয়ার নয়।'

'কী ভাবছি ?' চৈতন্যচরণের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওই যে ভাবছেন— খিচুড়ি... ডিমভাজা..'

'আমি কী ভাবছি তুমি জানলে কী করে ?'

'ওটা আমার জন্মগত ক্ষমতা বলতে পারেন।'

চৈতন্যচরণের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লক্ষ করলাম, চশমার ওদিকে ওর চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে। পাথরের চোখের মতো অনড়। লোকটা সত্যিই মানুষ কিনা কে জানে !

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল চৈতন্যচরণ।

'মিঃ সিংহরায় বাড়িতে নেই বলে ভয় পাচ্ছেন নাকি, স্যার ?' চৈতন্যচরণ আমার দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসল।

'না-না, ভয় পাব কেন,' আমতা-আমতা করে বললাম, 'ভয়ের কিছু আছে নাকি এ-বাড়িতে ?'

'ভয় পেলেই ভয়— নইলে কিছু নয়—' খিকখিক করে হেসে উঠল চৈতন্যচরণ। তারপর বলল, 'মিঃ সিংহরায় কিন্তু বাইরের তেনাদের ভয় পান না— তবে আমাকে ভয় পান।'

'সূর্য তোমাকে ভয় পায় !'

'তা পান বইকি ! কখন কাজে কী ভুলচুক করে বসি... তা আপনিই বলুন স্যার, কাজে ভুল কি হতে পারে না ! মানুষেরও তো কাজে ভুল হয়। বসুন, কিচেনে ভাতটা চাপিয়ে আসি।' কফির খালি কাপ-প্লেট হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চৈতন্যচরণ।

তাহলে সাইকেল রিকশাওয়ালা যা বলেছিল তাই কি ঠিক ! পোড়োবাড়ি, ভূতের বাড়ি— বিশেষ করে সূর্য বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে তেনাদেরই একজন হয়তো পোড়োবাড়িতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন।

'আপনি বোধহয় ভয় পেয়েছেন, স্যার—' বলতে-বলতে ফের ঘরে ঢুকল চৈতন্যচরণ : 'ভাবছেন আমি তেনাদেরই একজন !'

'না-না, ভয় পাইনি।' ঢোক গিলে বললাম, 'ভয় পাব কেন ?'

'ভয় যে পেয়েছেন, দেখতেই পাচ্ছি। এই শীতের রাতেও গলগল করে ঘামছেন।'

শুনেছি ভয় পেলে তেনারা আরও চেপে ধরে শেষপর্যন্ত জান খতম করে দেয়। তাই নিজের চেতনা যতটা সম্ভব ঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে।

বললাম, 'দরজা-জানলা একেবারে বন্ধ তো, তাই বোধহয় একটু ঘাম হচ্ছে।'

চৈতন্যচরণের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কই, তোমাকে তো ঘামতে দেখছি না !'

'না, আমার ঘামটাম হয় না। আপনাদের মতো হাঁচি, কাশি, হাই তোলা— ওসব বালাই আমার নেই।'

বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করতে লাগল। গলা শুকিয়ে এল। আমার সামনে যিনি বসে রয়েছেন, তিনি যে তেনাদেরই একজন, আর কোনও সন্দেহ নেই। ভগবান যেমন অন্তর্যামী, তেমনই তেনারাও মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন। ঢোক গিলে বললাম, 'চৈতন্যবাবু—'

'বলুন—' সামনে বসে চোখ বুজে পায়ের ওপর পা নাচাতে-নাচাতে বলল চৈতন্যচরণ, 'আপনি কী বলবেন জানি— এ-ঘরে একা থাকতে চান।'

উঠে দাঁড়াল চৈতন্যচরণ। বাইরে যাওয়ার আগে বলল, 'ঘরের দরজা বন্ধ করবেন না। আপনার বন্ধু যে-কোনও সময় এসে পড়তে পারেন।'

চৈতন্যচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে নিজেকে ধাতস্থ করতে কিছুটা সময় লাগল।

তারপর উঠে দাঁড়ালাম। ভয়ঙ্কর এই বাড়ি থেকে পালাতে হবে— যেমন করেই হোক— কিন্তু সদর দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। রান্নাঘরটা সদরের পাশেই— পালাতে গেলেই ধরা পড়ে যাব। কিন্তু পিছনে উঁচু পাঁচিল, আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। তারও পিছনে জঙ্গল। এই অন্ধকারে পালাতে গেলে বিষাক্ত সাপখোপের ঘাড়ে পা পড়তে পারে। ওনারাও তেনাদের চাইতে কিছু কম যান না।

রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁকছোঁক নানারকম শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার দেখলে হত তেনাদের তিনি কী করছেন। কোনদিকে মুখ করে বসে আছেন। যদি সাঁৎ করে ছুটে পালানো যায়!

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। স্টোভের ওপর ডেকচিতে কী যেন টগবগ করে ফুটছে। বেশ বড় রান্নাঘর। একটা মোড়ায় বসে রান্না করছে চৈতন্যচরণ। দেওয়ালের দু-দিকে শেল্‌ফে নানারকম মশলাপাতির কৌটো, শিশি, বোতল।

চৈতন্যচরণের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। ডেকচিতে ডান হাতে খুন্তি নাড়তে-নাড়তে বাঁ হাতটা পাঁচ-ছ'ফুট দূরের শেল্‌ফের দিকে বাড়িয়ে দিল। তাক থেকে নামিয়ে নিয়ে এল কী একটা মশলার কৌটো। তারপর সেটা রেখে ডান হাতটা ছ'ফুট দূরের শেল্‌ফের দিকে বাড়িয়ে আর-একটা কৌটো নামিয়ে নিল। বিস্ময়ে আতঙ্কে আমার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখের সামনে দেখছি একটা প্রেতাত্মা। জানলার নীচে পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে সেঁটে গেছে। এখনই এই পোড়োবাড়ি থেকে পালাতে না পারলে প্রেতের হাতে মৃত্যু অবধারিত। দেহের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ করে জানলার ধার থেকে সরে দাঁড়াতে গিয়ে পা লেগে একটা শিশি উলটে গেল।

'কে?' রান্নাঘরের ভেতর থেকে সেই খনখনে গলা শোনা গেল, 'কে ওখানে?'

ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। তবুও প্রাণপণে ছুটলাম বারান্দার দরজায়। কোনওরকমে এই ভুতুড়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই হবে। যেভাবেই হোক পালাতে হবে। সদরের দিকে ছুটে গেলাম। পিছনে খটখট পায়ের শব্দ পেলাম। দরজা খোলার আগেই পিছন থেকে কঙ্কালের মতো পাঁচ ফুট লম্বা একটা ঠাণ্ডা হাত সাঁ করে ছুটে এসে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। আর একটা

ঠাণ্ডা কনকনে হাত আমার কাঁধ খামচে ধরল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

সেই খনখনে গলা !

মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। তেনাদেরই একজনের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। আর চেতনা ধরে রাখতে পারলাম না। দরজার গোড়াতেই ঘাড় গুঁজে পড়লাম।

জ্ঞান হতে দেখলাম বিছানায় মাথার কাছে বসে রয়েছে সূর্য। আমাকে চোখ খুলতে দেখে সূর্য জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন বোধ করছিস ?'

সূর্যকে দেখে সাহস ফিরে পেলাম, ঘাড় নেড়ে বললাম, 'ভাল।' তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কখন ফিরেছিস ?'

'কিছুক্ষণ আগে। চৈতন্যচরণের কাছে শুনলাম তুই মাথা ঘুরে পড়ে গেছিস !'

'চৈতন্যচরণ !' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কি এখনও এই বাড়িতেই আছে ?'

'আছে।' সূর্য হেসে বলল, 'এখানে থাকবে না তো যাবে কোথায় !'

উঠে বসে বললাম, 'বিজ্ঞান ছেড়ে তুই কি আজকাল ভূতের ওঝা হয়েছিস নাকি ?'

'তার মানে ?'

'বাড়িতে তুই ভূত পুষছিস ?'

'কী যা-তা বলছিস— ভূত কোথা থেকে আসবে ?'

'কেন, চৈতন্যচরণ তোর পোষা ভূত নয় ?'

'চৈতন্যচরণ মানুষ নয় ঠিকই, তবে ও ভূতও নয়।'

'মানুষ নয়, ভূতও নয় ! তাহলে ও কী ?'

'রোবট— আমার তৈরি রোবট।'

'ভাঁওতা দেওয়ার জায়গা পাসনি। রোবট তো যন্ত্র, সে কখনও মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে !'

'আমার রোবট পারে। দুনিয়াতে আমিই একমাত্র এমন রোবট তৈরি করেছি যে শুধু মানুষের মতো কথা বলতে পারে তাই নয়, মানুষের মনের কথাও বুঝতে পারে।'

'মানে, থট্-রিডিং জানে ! কী করে, শুনি ?'

'চিন্তা করার সময় আমাদের ব্রেনে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। চৈতন্যচরণের দশ ফুটের মধ্যে কেউ কিছু চিন্তা করলে ওর ব্রেনের অ্যানটেনায় তা ধরা পড়বে।'

'অ্যানটেনা ?' অবাক হয়ে বললাম, 'কই, ওর বডিতে কোনও অ্যানটেনা দেখিনি তো !'

'চৈতন্যচরণের মাথার চুল তামার তারে তৈরি। মাথার মাঝখানে মেন অ্যানটেনা—'

'ওর মাথায় একটা বড় চৈতন দেখেছি।'

'ওটাই চৈতন্যচরণের মেন অ্যানটেনা— চুলে আর চৈতনে ধরা পড়ে অন্যের ব্রেনের বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গ। সঙ্গে-সঙ্গে সেটা ডিকোড করে নেয় ওর কম্পিউটার ব্রেন। বুঝতে পারে অন্যের মনের কথা। তোর মনের কথা বলে ও নিশ্চয় ভেলকি দেখিয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর ওর হাত চার-পাঁচ ফুট লম্বা করে কী করে ?'

'ওর হাত টেলিস্কোপের মতো ছোট-বড় করা যায়। ওতে কাজের অনেক সুবিধে। একই জায়গায় বসে না উঠেও অনেক কাজ করা যায়।'

'বুঝেছি, মেটাল বডি, তাই ঘাম হয় না। হাঁচি-কাশিরও বালাই নেই।'

রাগ করে বললাম, 'তোর চিঠিতে আমাকে এসব জানানো উচিত ছিল। বাড়িতে একটা বেয়াড়া রোবট পুষেছিস।'

চৈতন্যচরণ আমাকে কত হেল্প করে জানিস ! রান্নাঘরের কাজ থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরিতেও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, নইলে এই অজ পাড়াগাঁয়ে কোথায় আমি অল-পারপাস ইনটেলিজেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পেতাম বল ! আজ ওর ব্রেনের কম্পিউটারে ভাত, মুরগির ঝোল আর খেজুরের চাটনি প্রোগ্রাম করে দিয়েছিলাম।'

ভাবলাম, চৈতন্যচরণ তাই বলছিল খিচুড়ি রাঁধতে পারবে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন বাড়ি ফিরেছিস ?'

'বাড়ি থেকে কোথাও গেলে তবে তো ফেরার কথা আসবে।'

'তার মানে এতক্ষণ তুই বাড়িতেই ছিলি !'

'দেখছিলাম চৈতন্যচরণ কীভাবে গেস্ট অ্যাটেন্ড করে।'

'তার মানে আমি ভয় পাই কি না—'

'আমি ভেবেছিলাম—' সূর্য হেসে বলল, 'ও যে রোবট তুই ধরে ফেলবি। পারলি না তো !'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'স্কুলে তুই অঙ্কে কত নম্বর পেতিস ?'

'কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়।'

'আমি হলে তোকে রসগোল্লা দিতাম—'

'তার আগে চৈতন্যচরণের রসগোল্লা খেয়ে নে।'

দরজার দিকে চোখ পড়ল। দু-হাতে দুটো রসগোল্লার প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে চৈতন্যচরণ। পাঁচ ফুট দূর থেকে দুটো প্লেট এগিয়ে দিয়ে চৈতন্যচরণ খনখনে গলায় বলল, 'স্যার, গরম রসগোল্লা— এইমাত্র আমি নিজে তৈরি করেছি। কেমন হয়েছে টেস্ট করে বলবেন—'

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শেষ ফেরি

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়



মেঘের কড়কড় বা দূরাগত কামান গর্জনের গুরগুর শব্দের মধ্যে দিয়ে আচ্ছন্নের মতো হেঁটে চলেছিলেন দিঘা মহাকাশ বন্দরের বন্দর কমান্ডার ত্রিদিব রায়। তাঁর লক্ষ্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি নক্ষত্রযান। ওটিই পৃথিবীর শেষ নক্ষত্রযান। তাঁকে এবং আরও শেষ কয়েকশো মানুষকে নিয়ে ওটি উড়ে যাবে পঁয়ত্রিশ পারসেক দূরের অ্যালগল নক্ষত্রের উদ্দেশে। সূর্যের চেয়েও বড় মাপের ওই নক্ষত্রেরও রয়েছে পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ— পৃথিবীর মানুষ আদর করে তার নাম রেখেছে 'নতুন পৃথিবী'। পৃথিবীর স্মৃতি তারা ভুলতে চায় না।

গত সত্তর বছর ধরে কয়েক হাজার নক্ষত্রযান মহাশূন্যের সময়হীন পথ ধরে ক্রমাগত পৃথিবী আর 'নতুন পৃথিবী'র মধ্যে যাতায়াত করছিল। তাঁদের মহাকাশযানই হল শেষতম যান। সেটি আর কখনও ফিরে আসবে না পৃথিবীতে। সব মায়া, সব বাঁধন কাটিয়ে সে চিরকালের মতো বিদায় নেবে। পিছনে রেখে যাবে বরফে ঢাকা প্রাণহীন পৃথিবীকে। পৃথিবীর বুকে এখন হাজার-হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবে রাত্রি আর হিমশীতল বরফ। অকালে এসেছে হিমযুগ।

কমান্ডার রায় জানেন, সূর্য এখনও অস্ত যায়নি। তবু এখানে রাতের অন্ধকার। এখন গ্রীষ্মকাল— কিন্তু তাপমাত্রা শূন্যেরও পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে। আরও নামবে। ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করার পথে সূর্য ঢুকে পড়েছে পাঁচ আলোকবর্ষব্যাপী ধূলিমেঘ ভরা এক অঞ্চলে। নাম-না-জানা কোনও এক অতিকায় নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটেছিল সুদূর কোনও অতীতে। নক্ষত্রটির দেহাবশেষ সৃষ্টি করেছিল ওই ধূলিমেঘ। সূর্য একটু-একটু করে সেই ধূলিমেঘের গভীরে ঢুকেছে— ঢাকা পড়েছে। ফলে সূর্যহারা পৃথিবীতে নেমে এসেছে হিমযুগ।

কত হাজার বছরের পর সূর্য আবার দেখা দেবে, পৃথিবী আবার সজীব হয়ে উঠবে, তা জানেন না কমান্ডার রায়। তবে এটুকু জানেন, কুড়ি বছর ধরে

যে-চেয়ারে বসে তিনি অগণিত মানুষকে 'নতুন পৃথিবী'তে পাঠিয়েছেন, সেই চেয়ারে আর বসার সুযোগ পাবেন না কোনওদিন।

উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসা হিমবাহের ভয়ঙ্কর শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিশ্চয়ই কাছাকাছি এসে গেছে। উত্তর দিকে তাকালেন কমান্ডার রায়। কিন্তু আকাশছোঁয়া টারমিনাল বিল্ডিং আর অন্ধকারের জন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন ইনফ্রারেড গগল্‌স চোখে দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আবছা হলেও দেখতে পেলেন, এক বিশাল হিমপ্রাচীর বন্দর লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। কত আর দূর হবে ? ছ'শো কিংবা সাতশো মিটার। কতক্ষণই বা সময় লাগবে ? বড়জোর দু-ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা। তারপর উত্তর আর দক্ষিণ দিক দিয়ে এগিয়ে আসা বরফের দুটো পাঁচিল বন্দরের সবকিছু পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে।

পৃথিবীর মানুষ জানত এই পরিণতির কথা। পাঁচশো বছর আগেই জানতে পেরেছিল। তবে আতঙ্কে জ্ঞান হারায়নি মানুষ। শুধু নতুন কোনও বাসযোগ্য গ্রহের খোঁজ করেছিল তারা। আর সেইসঙ্গে তৈরি করা শুরু করেছিল অসংখ্য নক্ষত্রযান। আয়োজন করতে-করতে কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। তার মধ্যে খোঁজও মিলেছিল 'নতুন পৃথিবী'র। তারপর গত সত্তর বছর ধরে শুরু হয়েছে মানুষের মহাকাশ পাড়ি—'নতুন পৃথিবী'র পথে।

কমান্ডার রায়ের হাতের ওয়াকিটকি হঠাৎই সজীব হয়ে উঠল।

'হ্যালো, কমান্ডার, সিকিউরিটি চিফ দত্ত বলছি।'

'ইয়েস মিঃ দত্ত, বলুন।'

'একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'দুর্ঘটনা ! নতুন আবার কী হল, চিফ ?'

'আগের ফেরিতে দুজন যাত্রী উঠতে পারেনি— একটি মহিলা আর তার বছর সাতেকের ছেলে। ওরা ঠিক সময়ে রিপোর্ট করেছিল, কিন্তু জাহাজে চড়েনি।'

বিরক্ত হলেন কমান্ডার রায় : 'আশ্চর্য ! তাদের না নিয়েই স্পেসশিপ ছেড়ে চলে গেল ! আপনারা কি ঘুমোচ্ছিলেন ? যান, খুঁজে বার করুন ওদের। এ-অবস্থায় আমরা এখানে কাউকে ছেড়ে যেতে পারি না।'

'কমান্ডার, খোঁজ আমরা করেছি, কিন্তু পাইনি। এই অন্ধকারে পাবই বা কোথায় ? তাছাড়া, আমরা অপেক্ষা করতে পারিনি। পশ্চিম দিক থেকে একটা বরফের পাঁচিল স্পেসশিপের পাঁচ মিটারের মধ্যে এসে গিয়েছিল। দুজন দায়িত্বজ্ঞানহীন যাত্রীর জন্যে আমরা এক জাহাজ যাত্রীর জীবন বিপন্ন করতে পারিনি।'

সিকিউরিটি চিফের যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না কমান্ডার রায়। একটু নরম হয়ে বললেন, 'যাই হোক, খোঁজ চালিয়ে যান। আমাদের শেষ ফেরি ছাড়বার আগে ওদের খুঁজে পেতেই হবে।'



সর্বকিছু ছাপিয়ে মহিলাটির আর্তকণ্ঠ শোনা গেল, 'দয়া করুন, ক্যাপ্টেন। আমাদের বাঁচান!'

'ও কে, কমান্ডার। খোঁজ চলছে। আপনি তাড়াতাড়ি স্পেসশিপের কাছে চলে আসুন। সব যাত্রীই উঠে পড়েছে। হিমপ্রাচীরটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আর হ্যাঁ, সাবধান, অনেক হিংস্র জন্তু-জানোয়ার কসমোড্রোম এলাকায় ঢুকে পড়েছে।'

গা শিরশির করে উঠল কমান্ডার রায়ের। কোমরে ঝোলানো 'রে-গান'টার হাতল চেপে ধরে চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন। বরফের সমুদ্রের মধ্যে এই বন্দর এলাকাটুকুই কেবলমাত্র দ্বীপের মতো জেগে রয়েছে এখনও। বরফ-পাঁচিলের তাড়া খাওয়া কয়েকটা তুষার-চিতা আর পেঙ্গুইনকে তিনি কিছুক্ষণ আগেও দেখেছেন। আরও দেরি করার অর্থও তিনি বুঝতে পারছেন। তুষারপাত হলেও না হয় অন্য কথা ছিল। কিন্তু এখন বাতাসে একফোঁটা জলীয় বাষ্প নেই। যা ছিল তা জল হয়ে ঝরে গেছে অনেকদিন আগেই। এখন শুধু চলমান হিমবাহ। আর কিছু যদি নাও হয়, স্রেফ হিমবাহের ধাক্কায় তাঁদের মহাকাশযান অন্তত উলটে যেতে পারে।

তবু যাত্রী দুজনের কথা ভুলতে পারলেন না ত্রিদিব রায়। ইনফ্রারেড গগল্‌স চোখে চারদিকে তাকালেন তিনি— যদি জীবন্ত কিছুর নড়াচড়া দেখা যায়। না, কিছুই নজরে পড়ল না। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। ফ্লাডলাইটগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। দৈত্যাকার জেনারেটারগুলো থেমে গেছে কৃত্রিম জ্বালানির অভাবে। স্টোরেজ ব্যাটারিগুলোও ধুঁকছে। পরিবেশদূষণের ভয়ে পারমাণবিক চুল্লিগুলোকে বহুকাল আগেই বিদায় জানানো হয়েছিল। আর প্রাকৃতিক তেলের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই শক্তির উৎস হিসেবে প্রধানত ব্যবহার করা হচ্ছিল জল, বায়ু, সমুদ্র আর সৌরশক্তি। আজ সূর্য থেকেও নেই। তাই অন্যান্য শক্তির উৎসও অকেজো হয়ে গেছে। হিমযুগের শুরুতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল শক্তির সঙ্কট। আজ অবস্থা আরও ভয়াবহ। টারমিনাল বিল্ডিং, কন্ট্রোল টাওয়ার, সব জায়গাতেই অন্ধকারের রাজত্ব।

চিন্তিত হয়ে উঠলেন কমান্ডার রায়। বরফের মৃত্যুফাঁদে পা দেয়নি তো দুজন! যদি তাই হয়ে থাকে করবারও তো কিছু নেই। অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা চাপা পড়ে থাকবে বরফের নীচে। মনটা ভারি হয়ে উঠল কমান্ডার রায়ের। এ যেন তাঁর পরাজয়। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে তিনি পারাপার করিয়েছেন অসংখ্য মানুষকে। দেখেছেন কত বিভিন্ন মানসিকতার লোককে। কেউ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে টারমিনাল বিল্ডিং-এ লুকিয়ে বসে থেকেছে। কেউ বা আগের মহাকাশযানে যাওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি। যানের বহনক্ষমতাকে পাত্তাই দিতে চায়নি তারা। সিকিউরিটি চিফ দত্তকে হাত ধরে টেনে নামাতে হয়েছে বাড়তি মানুষজনকে। তাদের পরের জাহাজে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কত স্বার্থপর মানুষকেও দেখেছেন তিনি— যারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত— পরের সুবিধে-অসুবিধেটুকু গ্রাহ্যই করতে চায়নি। তবু তিনি দেখেশুনে খোঁজখবর করে শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে

এসেছেন বলে মনে একরকমের গর্ব অনুভব করতেন— আজ যেন সেই গর্ব মুছে যেতে বসেছে। চিরটাকাল তিনি ভেবে এসেছেন, এই মহাকাশ বন্দর যেন এক যাত্রিবাহী জাহাজ—অতল সাগরের বুকে বিপদে পড়া এক জাহাজ। চারদিক থেকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসা বরফের স্তূপ যেন সমুদ্রের ঢেউ। নক্ষত্রযানগুলো এক-একটি খেয়া। ডুবন্ত যাত্রীদের তিনি এতদিন খেয়ায় চড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যেতে সাহায্য করে এসেছেন। অথচ শেষ খেয়ায় তাঁকে দুজন যাত্রীকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে যেতে হবে! ত্রিদিব রায় ওয়াকিটকিতে বললেন, 'চিফ, পেলেন ওঁদের ?'

'না, কমান্ডার।' চিফ সিকিউরিটি অফিসার দত্তের নিরুত্তাপ গলা ভেসে এল, 'পাওয়া যায়নি। এদিকে হিমপ্রাচীরটা জাহাজের আরও কাছাকাছি এসে গেছে। তাড়াতাড়ি আসুন, প্লিজ— একটু পা চালিয়ে। সবাই দারুণ টেনশনের মধ্যে রয়েছে।'

কোনও কিছু ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ ভেসে এল। ভেসে এল এক জান্তব মৃত্যু-আর্তনাদ। চমকে উঠে দক্ষিণের দিকে তাকালেন তিনি। ইনফ্রারেড গগল্‌স চোখে তিনি দেখতে পেলেন, একটা স্নো-লেপার্ড একটা পেঙ্গুইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! সঙ্গে-সঙ্গে একটি ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা ত্রিদিব রায়ের মনে জেগে উঠল। শিকারে পরিণত হয়ে যায়নি তো মা ও ছেলেটি! বেঁচে থাকা অনেক জানোয়ারই বন্দরের দিকে পালিয়ে আসছে। সভ্যতার আদি যুগের নোয়ার মতো কিছু-কিছু পশু-পাখি নিয়ে যাওয়া হয়েছে 'নতুন পৃথিবী'তে। তবে সেই মহাপ্লাবনের দিনেও যেমন সবাইকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি— আজও তেমনই।

উত্তরের হিমবাহের শব্দটা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। মহাকাশযানের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালেন কমান্ডার রায়।

জাহাজের কাছে পৌঁছনোমাত্রই সিকিউরিটি চিফ দত্ত যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন : 'কমান্ডার, জলদি আসুন, আমরা উঠে পড়ি। দেখুন, ওই বরফের স্তূপটা আর মাত্র দশ মিটার দূরে— কী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে!'

কমান্ডার রায় বললেন, 'ভয় পাচ্ছেন কেন ? এখনও আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট সময় পাওয়া যাবে। যাত্রী দুজনকে কি পেলেন ? ওদের ফেলে যাই কী করে ?'

দত্ত বিব্রত হয়ে মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর দিকে তাকালেন সাহায্যের আশায়। তিনি জানেন, যাত্রী দুজনকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত কমান্ডার রায় জাহাজে উঠতে চাইবেন না। দুজন যাত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ছেড়ে চলে যাওয়াটা অমানবিক সন্দেহ নেই— কিন্তু উপায়ই বা কী ? এই ঘোর অন্ধকারে কোথায় খুঁজবেন ওদের ? তিনি বললেন, 'এটা কি পাগলামি হবে না, কমান্ডার ? যারা এই ঘোর দুর্যোগ জেনেও ইচ্ছে করে হারিয়ে গেছে— তাদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব কি আমাদের ? ছেলেটা না হয় ছোট, তার মা তো আর

ছোট নয় ! তার কি কোনও বোধ নেই ? ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে কি জাহাজের এই চারশো যাত্রী মারা পড়বে ? শুনছেন, উত্তরের এক্সটেনশন বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ল ? এই বিপদ আর অন্ধকারের মধ্যে কে ওদের খুঁজতে যাবে বলুন, কমান্ডার ? নেকড়ে— স্নো-লেপার্ড বা পোলার বিয়ারের দল কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে ! চলুন, চলুন, আমরা ভেতরে যাই। আর দেরি করা ঠিক নয়।'

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী কথাগুলো শুনছিলেন। দত্ত থামতেই তিনি এগিয়ে এলেন : 'কমান্ডার, আপনাকে আমিও বহুকাল ধরে দেখছি—জানি, যাত্রী দুজনকে ফেলে যেতে আপনার মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার স্পেয়ার ক্যাপাসিটির একশো পঁচিশ ভাগ ভর্তি হয়ে গেছে, আর সামান্য বাড়তি ওজন নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া জ্বালানির অবস্থাও ভাল নয়। আর বাড়তি লোক নিলে এসকেপ ভেলোসিটি অ্যাটেইন করাই হয়তো আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতা থেকেই আমরা হয়তো আর বেরোতে পারব না।'

অবিশ্বাস-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমান্ডার রায় বললেন, 'এ আপনি কী বলছেন, ক্যাপ্টেন ! দুটো মানুষকে আমি ওই বরফ আর স্নো-লেপার্ডদের মুখে ফেলে রেখে যাব !'

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বললেন, 'কেন মিছিমিছি মনখারাপ করছেন ? হয়তো ওরা এতক্ষণে মারাই গেছে। আর ওদের মারা যাওয়াটা আমাদের এই চারশোজন যাত্রীর জন্যে মঙ্গলজনক। মনে করে দেখুন, সেবারকার সেই স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটা। স্বামীটির জায়গা হচ্ছিল না, আমি জোর করেই তাকে নামিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু আপনি বাধা দিয়েছিলেন। তারপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটাতে গিয়ে আমাকে সে কী বেগ পেতে হয়েছিল— পথের মাঝখানে আমার জাহাজ কোর্স থেকে সরে যাচ্ছিল—এ-সবই তো আপনি জানেন। তখন প্রচুর জ্বালানি ছিল— ম্যানেজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ আর সম্ভব নয়, তাই ওদের ফিরে আসার আগেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত।' একটু থেমে ক্যাপ্টেন আবার বললেন, 'সামনাসামনি নিষ্ঠুরের মতো কাজ করতে হয় না তাহলে... ।'

সিকিউরিটি চিফ দত্ত বললেন, 'ওই দেখুন, বরফের পাঁচিলটা আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। আর দেরি করলে হয়তো আমাদের পক্ষেও বেরোনো মুশকিল হবে।'

চিন্তিতভাবে কমান্ডার বললেন, 'কিন্তু... ।'

'কোনও কিন্তু নয়, কমান্ডার,' ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী জোর গলায় বললেন।

একটা কিছু ভেঙে পড়ার শব্দে সবাই চমকে উঠল। চিফ দত্ত বললেন, 'দেখুন, কমান্ডার, অ্যানেক্স বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ল। কসমোড্রোমের চত্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা আইস ব্রেকারগুলো কেমন ঘষটে এগিয়ে আসছে, শুনতে

পাচ্ছেন ?' আতঙ্কভরা গলায় কথাগুলো বলে তিনি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন : 'ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী, কমান্ডারকে বলুন চলে আসতে। প্লিজ, আর দেরি করবেন না।'

চারদিকে ধ্বংসলীলার নানান শব্দ। তবু যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন কমান্ডার রায়। নিপাত্তা হয়ে যাওয়া যাত্রী দুজনের চিন্তা যেন তাঁকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। তাঁর ডুবন্ত অতিকায় জাহাজের শেষ দুজন যাত্রীকে রক্ষা করতে না পারাটা তাঁরই ব্যর্থতা। একটা যন্ত্রণাবোধ তাঁকে গ্রাস করছিল ক্রমশ।

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী কমান্ডার রায়ের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেও তাঁকে সিঁড়ির দিকে ঠেলতে বাধ্য হলেন : 'চলুন কমান্ডার, আর দেখবেন না কিছু। ভুলে যান— ঘটনাটা ভুলে যান।'

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর কথাগুলো কমান্ডার রায়ের কানে ঠিক ঢুকছিল না। তবু ক্যাপ্টেনের ঠেলায় তিনি নিজের অজান্তেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে ভাবছিলেন, হয়তো দূর ভবিষ্যতে কোনও একদিন শিকড়-সন্ধানী 'নতুন পৃথিবী'র কোনও অভিযাত্রী আবিষ্কার করবে ওদের মৃতদেহ। হয়তো মৃতদেহ দুটির চোখেমুখে তখনও ফুটে থাকবে ঘৃণা আর আতঙ্কের ছাপ। ওরা ইশারায় বলতে চাইবে, ওদের জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ওদের ফেলে পালিয়েছিল।

হ্যাচওয়ের মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন কমান্ডার রায়। শেষবারের মতো তিনি বাইরের চারদিকটা দেখে নিতে চাইলেন।

পিছন-পিছন উঠে আসা ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বললেন, 'ওই শুনুন, কন্ট্রোল টাওয়ারটা ভেঙে পড়ল। বরফের পাঁচিলটা আর মাত্র তিন মিটার দূরে। নিজের সিটে চলে যান, প্লিজ। আমি দরজা বন্ধ করব।'

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কমান্ডার রায় ভাবলেন, মানুষের সব কীর্তিই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে— যাক। কিন্তু 'নতুন পৃথিবী'তে যা গড়ে উঠছে তার চরিত্র কীরকম ? সেখানেও মানুষ কি এইরকম আন্তরিকতাহীন হয়ে গেছে— এইরকম ভাবলেশহীন ? জাহাজের এতজন যাত্রীর কারও মনে কি এই পুরনো পৃথিবীর জন্য কোনও দুঃখবোধ নেই, মায়া নেই, ভালবাসা নেই ?

হঠাৎই চমকে উঠে চিৎকার করে উঠলেন কমান্ডার রায়, 'ওই যে, ওরা আসছে ক্যাপ্টেন, একমিনিট ! ওদের তুলে নিন, প্লিজ !'

মনকে কঠিন করে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বললেন, 'সরে যান, আমি হ্যাচ বন্ধ করব। ওদের নিতে পারছি না, আমি সত্যিই দুঃখিত।'

আদেশের স্বরে কমান্ডার রায় বললেন, 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না— ওদের তুলে নিন। ওই দেখুন, ওদের পিছনে নেকড়ের দল.' মুহূর্তে রে-গান বার করে ফায়ার করলেন কমান্ডার রায়।

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লেন কমান্ডার রায়ের ওপর ;

'পাগলামি করবেন না। চলে আসুন, কমান্ডার, প্লিজ।'

হ্যাচওয়ের বাইরে অর্ধেক দেহ বার করে রেখে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন কমান্ডার রায়, 'প্লিজ ক্যাপ্টেন, ঠাণ্ডা মাথায় এভাবে আপনি ওদের খুন করতে পারেন না। আমি হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করব।'

ফারের পোশাক পরা একটি মহিলা আর তাঁর বছর সাতেকের একটি ছেলে আতঙ্কে পাগলের মতো ছুটতে-ছুটতে এসে সিঁড়িতে পা রাখল।

কঠিন গলায় ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বললেন, 'উঠবেন না। দাঁড়ান। এখন আর সময় নেই। কোথায় ছিলেন আপনারা?'

কাঁচুমাচু মুখে মহিলাটি বলল, 'ছেলেকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। ও ওর কুকুরছানাটাকে বরফে কবর দিচ্ছিল। তারপরে নেকড়ের ভয়ে টারমিনাল বিল্ডিং থেকে আমরা বেরোতে পারছিলাম না।'

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'মাফ করবেন। এ-জাহাজে আপনাদের আর জায়গা হবে না।'

বিবর্ণ স্বরে মহিলাটি বলল, 'প্লিজ ক্যাপ্টেন, দয়া করুন।'

টারমিনাল বিল্ডিং-এর খানিকটা অংশ বিকট শব্দ করে ধসে পড়ল। কয়েকটা তুষার-চিতা গর্জন করতে-করতে ছুটে পালাল।

সবকিছু ছাপিয়ে মহিলাটির আর্তকণ্ঠ শোনা গেল, 'দয়া করুন, ক্যাপ্টেন। আমাদের বাঁচান!'

'বিশ্বাস করুন, কোনও উপায় নেই। চারশোজন যাত্রীর জীবন নির্ভর করছে আমার ওপরে। প্লিজ, আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।'

সিকিউরিটি চিফ দত্ত সভয়ে বলে উঠলেন, 'ক্যাপ্টেন, পাঁচিলটা আর মাত্র দেড় মিটার দূরে...।'

চিৎকার করে উঠলেন কমান্ডার রায়, 'তা হয় না, ক্যাপ্টেন! প্লিজ, ওদের তুলে নিন, আর বেশি সময় নেই।'

ধমক দিয়ে উঠলেন সিকিউরিটি চিফ, 'চারশো লোকের জীবন বিপন্ন করে এই সেন্টিমেন্টালিটির কোনও মানে হয় না। আপনি ভেতরে চলে আসুন।'

'ক্যাপ্টেন, আমার ছেলেটাকে অন্তত বাঁচতে দিন।'

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'বেশ, ওকে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু আপনি ওঠার চেষ্টা করবেন না।'

'না। আমি মাকে ছেড়ে যাব না।' ছেলেটি তার মাকে আঁকড়ে ধরল: 'আমি মাকে ছেড়ে যাব না।'

অবাক চোখে মা আর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কমান্ডার রায়। মৃত্যুর আতঙ্কের চেয়েও তাহলে সম্পর্ক, ভালবাসা বড়। একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক ঠেলে।

'এনাফ— যথেষ্ট হয়েছে,' বিরক্ত মুখে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যাচে হাত রাখলেন: 'ভেতরে আসুন, কমান্ডার। হ্যাচ বন্ধ করব।'

আর কিছু বলার দরকার ছিল না। কমান্ডার রায় দেখতে পাচ্ছিলেন, সমুদ্রের ঢেউ তাঁর জাহাজের আপার ডেক ছুঁইছুঁই করছে। সেই নির্জন ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মা ও ছেলে। সমুদ্রের অতলে এদের বিসর্জন দেওয়াটা হবে মানবতার চোখে অপরাধ। বরং এরা 'নতুন পৃথিবী'তে যাক। সেখানে এমন মানুষের— এমন সব মানবিক গুণের নিশ্চয় দরকার হবে। এই গুণগুলোই তো তুষার-চিতাদের থেকে মানুষকে আলাদা করে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর হাতের ওপর হাত রেখে মৃদু চাপ দিলেন কমান্ডার রায় : 'ও. কে, ক্যাপ্টেন। ছেলেটাকে তুলে নিন, আর আমার জায়গায় তুলে নিন ওর মাকে।'

অবাক চোখে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বললেন, 'আর আপনি ?'

'আমি ?' মৃদু হাসলেন কমান্ডার ত্রিদিব রায়, 'আমি আমার জাহাজের সঙ্গে তলিয়ে যেতে চাই। সমুদ্রের ওপরে লেখা পুরনো গল্পগুলো কি আপনি কখনও পড়েননি ? যেখানে ক্যাপ্টেনরা ডুবে যাওয়া জাহাজ ছেড়ে কখনও...।'

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শচীদাসের খেল

সুধীন্দ্র সরকার



শহরের হই-হট্টগোল ছেড়ে নীলাম্বর সেন পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট গ্রাম বাতাসপুরে ডেরা বাঁধলেন। মাসআষ্টেক আগে চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন তিনি। অফিস থেকে পাওনা টাকা-পয়সার হিসেব বুঝে নিয়ে ঝাড়া হাত-পায়ে এসে পৌঁছলেন এখানে। অকৃতদার মানুষটির তিনকুলে কেউ ছিল না। এখানে এসে সাঁওতাল ছেলে শচীদাসকে মাসে পঁচিশ টাকা মাইনের বিনিময়ে রাখলেন সারাদিনের ফাইফরমাশ খাটার জন্য।

শচীদাসের বয়স বছর পনেরো। সাদাসিধে। স্বল্পভাষী। গায়ের রঙ তামাটে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। লম্বায় পাঁচ ফুটের মতো। মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে।

রাতের অন্ধকারে নীলাম্বরবাবু তাঁর বাংলো-প্যাটার্নের ছোট্ট বাড়ির বারান্দায় বসে ছিলেন। কেরোসিন ল্যাম্পের মৃদু আলো বারান্দা ছাড়িয়ে ফুলের বাগানের কাছে পৌঁছে মিলিয়ে গিয়েছিল। শচীদাসের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের গুণে ছ'মাসের মধ্যে ফুলের বাগানটা নজর কেড়েছিল সবার।

রাতের আকাশে অগুন্তি তারা। শহরের ধোঁয়াশা ফুঁড়ে পরিষ্কার আকাশ খুব কমদিনই দেখা যেত। ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন নীলাম্বর সেন।

ছোটবেলায় বই পড়ে জেনেছিলেন সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, বৃশ্চিক রাশি ইত্যাদির নাম। কাল্পনিক রেখা জুড়ে বইয়ে কেমন সুন্দর ছবির মতো ছাপা থাকত।

তিনি মনে-মনে কাল্পনিক রেখা জুড়ে কালপুরুষকে আকাশের বুকে খুঁজছিলেন।

কালপুরুষ শিকারি। হাতে তীর-ধনুক। মাথাটা ওর পৃথিবীর দিকে ঝোঁকানো। পায়ের নীচে একটা উজ্জ্বল তারা, শিকারি কুকুর।

কুকুরটার কী যেন নাম? মনে পড়েছে, লুব্ধক। মনে-মনে কাল্পনিক রেখা টানতেই পর-পর মিলে গেল। হেসে ফেললেন তিনি। আশ্চর্য! কালপুরুষ

কি চিরকাল পৃথিবীর দিকে ধনুক উঁচিয়ে থাকবে ? পৃথিবীর ওপর এত কিসের রাগ ওর ! পৃথিবী কি ওর শিকারের বস্তু ?

আচ্ছন্নের মতো নীলাম্বরবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ক্রমে ওঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। তিনি দেখলেন, কালপুরুষ দ্রুতগতিতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন তিনি। চোখের পাতা আতঙ্কে বন্ধ হতে চাইল। কালপুরুষ শাঁ করে নেমে এল ওঁর বাগানে !

হতচকিত নীলাম্বরবাবু ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে বাগানের দিকে চোখ ফেরালেন। দেখলেন, কালো কুচকুচে একমাথা ঝাঁকড়া চুল, তামাটে গায়ের রঙ, লম্বায় পাঁচ ফুটের মতো শচীদাস হাতে তীর-ধনুক নিয়ে হাসতে-হাসতে ওঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

শচীদাস এ-সময়ে এখানে কেন ! ওকে তো সেই সন্ধেবেলা ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক আগেই ওর বাড়ি চলে যাওয়ার কথা। বাড়িতে ওর বুড়ি-মা, এক রাতের জন্যও ওকে ঘরের বাইরে থাকতে দিতে চান না।

শচীদাস এগিয়ে এল। ধনুকটা হাতে দোলাতে-দোলাতে বলল, 'খরগোশ মারতে বেরিয়েছিলুম।'

'মা বেরোতে দিলেন ?' নীলাম্বরবাবুর চোখেমুখে কৌতূহল।

'ঘুমোচ্ছেন দেখে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।' বলতে-বলতে শচীদাস পেয়ারাগাছের আড়ালে গেল। ওখান থেকেই বলল, 'খরগোশটা ছুটে বাগানে ঢুকল, কিন্তু কোথায় যে গেল !' তারপর পাঁচিল টপকে যাওয়ার আগে চিৎকার করে বলল, 'কাল সকালে আসতে একটু দেরি হবে।' শচীদাসের কথা মিলিয়ে গেল পাঁচিলের ওপারে।

বিছানায় শুয়ে নীলাম্বরবাবু ভাবছিলেন শচীদাসের কথা। দামাল ছেলে। এত রাতে বেরিয়েছে খরগোশ শিকার করতে ! সাঁওতাল বলেই এত সাহস। কাল সকালে এলে, ওকে একটু ধমকে দিতে হবে। রাতবিরেতে একা পথে-ঘাটে যদি কোনও বিপদ ঘটায় ?

ভোরের দিকে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনে নীলাম্বরবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন। দৌড়ে গেলেন দরজা খুলতে।

পাল্লা খুলতেই দেখলেন, শচীদাস দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে।

'কী ব্যাপার ?' নীলাম্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল বলে গেলি দেরি করে আসবি ?'

শচীদাস হাঁ করে তাকিয়ে রইল নীলাম্বরবাবুর মুখের দিকে।

নীলাম্বরবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'খরগোশটা খুঁজে পেলি ?'

শচীদাস বোকার মতো ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।' তারপর কেঁদে ফেলল হাউহাউ করে : 'মা মারা গেছেন।'

'সে কী ?' নীলাম্বরবাবু ওকে কাছে টেনে নিলেন : 'কাল রাতে যখন বাগানে এসেছিলি, তখন তো কিছু বললি না ?' সান্ত্বনা দিলেন ওকে, 'কী আর করবি

বল ? মা তো কারও চিরকাল থাকেন না !’ তিনি পঞ্চাশটা টাকা দিলেন ওর হাতে : ‘যা, মায়ের সৎকারটা করে আয় ।’

শচীদাস টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে ঘাড় নেড়ে চলে গেল ।

নীলাম্বরবাবু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ওর চলার পথের দিকে । ভাবছিলেন, শচীদাস এবারে একা হয়ে গেল । বুড়ি মায়ের জন্য এতদিন যে-টানটা ছিল, সেটা চুকে গেল । শচীদাস এখন পুরোপুরি ওঁর মতো স্বাধীন । দুজনেরই কোনও পিছুটান নেই ।

ঘণ্টাচারেক যেতে-না-যেতেই শচীদাস ফিরে এল আবার ।

কৌতূহলী নীলাম্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী রে ? এর মধ্যে সব কাজ মিটে গেল ?’

শচীদাস হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওঁর দিকে ।

নীলাম্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘টাকা কম পড়েনি তো ?’

শচীদাস আরও অবাক হল ।

নীলাম্বরবাবু ফের বললেন, ‘যাক, সব ভালয়-ভালয় মিটেছে তাহলে—’

শচীদাস একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ।

‘কী হল ? কথা বলছিস না কেন ?’ নীলাম্বরবাবু ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলেন : ‘মায়ের হঠাৎ কী হয়েছিল ? অসুখ-বিসুখের কথা—’

নীলাম্বরবাবুর কথার মাঝখানে শচীদাস থতমত খেয়ে বলল, ‘জানি না । মা তো...’

‘নেই ।’ নীলাম্বরবাবু ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ‘সে তো আমিও জানি । বোকা কোথাকার ! অত ভেঙে পড়লে কি চলে ?’

আর কথা বাড়ালেন না তিনি । কী জানি, মা মারা যাওয়াতে হয়তো শচীদাসের মাথার ঠিক নেই । প্রসঙ্গ পালটে বললেন, ‘আজ কি কাজ করবি ? না কি, বাড়ি যাবি ?’

‘করব ।’ শচীদাস ভেতরের ঘরে গেল ।

নীলাম্বরবাবু সোফায় বসলেন ।

চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই এক কাপ গরম চা নিয়ে এল শচীদাস ।

নীলাম্বরবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ওর দিকে ।

শচীদাস রান্নাঘরে গেল । রাতের এঁটো বাসনগুলো পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে এল । তারপর টাকা আর থলে নিয়ে ছুটল হাটের দিকে ।

নীলাম্বরবাবু বাথরুমে ঢুকলেন । শচীদাস ব্যাগভরতি বাজার নিয়ে হাট থেকে ফিরে এল । নীলাম্বরবাবু চান করতে-করতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ভাঁজছিলেন । বেশ খুশি-খুশি লাগছিল ওঁকে । শচীদাস যেন বেমালুম পালটে গিয়েছে । মায়ের মৃত্যুর পর ওর আমূল পরিবর্তন । সকালে চা-টাও করেছিল দারুণ । অমন সুস্বাদু চা আগে কোনওদিন খেয়েছিলেন বলে মনে পড়ল না ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে নীলাম্বরবাবু ঘরে ঢুকে থ’ । সাতখানি বাটি সাজিয়ে



নীলাম্বরবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, বাইরের মেঠো-অন্ধকার ফুঁড়ে ছায়ার মতো একটা ছেলে ধীর-পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

শচীদাস ভাতের থালা বেড়ে অপেক্ষা করছে। আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালকের বাসী রান্না ছিল না কি ? কখন হাটে গেলি ? আর, এতসব করলিই বা কখন ?'

শচীদাস হাসল : 'এসব করতে কতক্ষণই বা লাগে !'

'এই কাজই তো মাঝে-মাঝে টিকির-টিকির করে করিস।' নীলাম্বরবাবু বললেন, 'তুই তো দেখছি কম্পিউটারকেও হার মানালি ?'

'কম্পিউটার কে ?'

'ও তুই বুঝবি না। যন্ত্র।'

'আমিও তাহলে যন্ত্র !' হেঁ-হেঁ করে হাসতে লাগল শচীদাস।

চর্ব্যচোষ্য খেয়ে নীলাম্বরবাবুর পেট জয়ঢাক। বিছানায় গা এলিয়ে ভাবছিলেন, বাড়ির পিছন দিকে যে-বিঘেটাক আবাদী জমি আছে, সেখানে চাষ করলে কেমন হয় ? শচীদাসের মতো কাজের লোক যখন রয়েছেই, তখন আর ভাবনা কী ?

শচীদাসের কছে কথাটা পাড়তেই সে গদগদ হয়ে বলল, 'আপনি বললে কি আর না করতে পারি ? চাষবাসের কাজ আমার ভালই জানা আছে।'

'তোকে আমি এর জন্যে আলাদা মজুরি দেব।' নীলাম্বরবাবু হাসলেন।

নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল শচীদাস, 'সে দেখা যাবে।' তারপর নিজে খেতে বসল।

নীলাম্বরবাবু এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। শচীদাসের মতো কাজের লোক যার ঘরে, তার তো কোনও চিন্তাই থাকতে পারে না। শচীদাস যেন কল্পতরু।

সন্ধের মুখে শচীদাস রান্নাবান্না সেরে, নীলাম্বরবাবুর খাবার ঢাকা রেখে, নিজের খাবার বেঁধে নিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'কাল সকালেই একজোড়া বলদ আর লাঙল জোগাড় করে আনব।'

রাতের খাওয়া শেষ করে নীলাম্বরবাবু পায়চারি করছিলেন বারান্দায়। ওঁর বাগানটা ফুলে-ফলে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। গাছের পাতায় বাতাসের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছিল। দূরে সাঁওতালদের গ্রাম থেকে ভেসে আসছিল মাদলের শব্দ।

কাকভোরেই শচীদাস একজোড়া বলদ নিয়ে হাজির। ওর হইচইতে ঘুম ভেঙে গেল নীলাম্বরবাবুর। চোখ ডলতে-ডলতে বিছানায় বসে ভাবছিলেন, শচীদাসকে কাজে লাগিয়ে আচ্ছা ঝামেলা হল তো! মুখের কথা পড়তে-না-পড়তেই বলদ এনে হাজির ! ছেলেটা পারে বটে ! এত তাড়াতাড়ি কাজ সারে যে, বলার কথা নয়। কোনও কাজে 'না' করে না। এমনকি, বিরক্ত পর্যন্ত হয় না।

'বাবু ! বাবু !' শচীদাস দুমদুম করে দরজা-ধাক্কা দিতে লাগল।

ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলদ দুটোও তারস্বরে চিৎকার করছিল 'হাম্বা হাম্বা'

করে।

নীলাম্বরবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন : 'দাঁড়া। দাঁড়া। ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস নাকি ? সাতসকালে এত তাড়া কিসের ?' বিরক্তিতে বিছানা ছাড়লেন উনি।

'বলদ দুটোকে রেখে লাঙল আনতে যাব।' বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে শচীদাস জবাব দিল।

নীলাম্বরবাবু দরজা খুললেন। শচীদাস বলদ দুটোর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছিল।

নীলাম্বরবাবু বলদ দুটোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি সত্যি তাহলে চাষ করবি ?'

'আপনি বললেন যে ?' শচীদাস উঠোনে খোঁটা পুঁততে-পুঁততে বলল, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকুন। দেখুন না কী করি আমি।'

নীলাম্বরবাবু কোনও উত্তর খুঁজে পেলেন না।

শচীদাস ফের বলল, 'বলদজোড়ার ওপর একটু নজর রাখবেন। আমি মংলু-মাঝির কাছ থেকে লাঙলটা নিয়ে এক্ষুণি আসছি।'

ঘাড় নাড়লেন নীলাম্বরবাবু। শচীদাস যা করতে চায় করুক। তিনি বাধা দেবেন না।

শচীদাস চলে যেতেই নিজে চা তৈরি করে খেলেন। ভাল লাগল না। মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল। শচীদাসের তৈরি চা খেয়ে মুখের স্বাদ কেমন যেন পালটে গিয়েছে। খারাপ জিনিস আর মুখে রোচে না।

একটু পরেই শচীদাস লাঙল কাঁধে লাফাতে-লাফাতে ফিরে এল। ওর সর্বাঙ্গ ভিজে। চুল দিয়ে জল পড়ছিল টুপটুপ করে।

নীলাম্বরবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই। অথচ শচীদাস ভিজে জবজবে হয়ে এল কোত্থেকে ?

'বড্ড ধকল গেল আজ। তাছাড়া বেশ দেরি হয়ে গেল ফিরতে।' বলতে-বলতে শচীদাস লাঙল রেখে দাওয়ায় বসল।

নীলাম্বরবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পুকুরে ডুব দিয়ে এলি নাকি ?'

'একরকম তাই।' শচীদাস ধপধপে কাগজের মতো সাদা দাঁত বার করে হাসল : 'মংলু-মাঝির বাড়ি পৌঁছে দেখি, কান্নাকাটি পড়ে গেছে। ওর ছোট নাতিটা পুকুরে তলিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে ওখানে হাজির হয়েছিলাম ! নইলে কী কাণ্ডটাই না হত ! বাচ্চাটাকে জল থেকে উদ্ধার করে এখানে আসছি। না, মারা যায়নি।'

নীলাম্বরবাবু সহানুভূতির সুরে বললেন, 'মাথাটা মুছে আমার একটা লুঙ্গি পর। আর, গেঞ্জিটা খুলে রোদে শুকোতে দে।'

শচীদাস হেসে উঠল হাঃ-হাঃ করে : 'না, না। এক্ষুণি সব গায়েই শুকিয়ে

যাবে।'

'যা ভাল বুঝিস কর।' নীলাম্বরবাবু বাগানের দিকে গেলেন।

শচীদাস রান্নাঘরে গেল। সকালের সব কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর নীলাম্বরবাবুর সঙ্গে জমির সীমানা দেখে এল। কাল সকাল থেকেই মাঠে লাঙল দেবে বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে এল।

সন্ধের মুখে শচীদাস চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, ঠিক তক্ষুণি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন নীলাম্বরবাবু। শচীদাস তখনও চৌকাঠ পেরোয়নি। নীলাম্বরবাবু বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, বাইরের মেঠো-অন্ধকার ফুঁড়ে ছায়ার মতো একটা ছেলে ধীর-পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মাথা নিচু করে হাঁটছিল।

ছেলেটি দরজার কাছাকাছি পৌঁছে মাথা তুলতেই নীলাম্বরবাবুর ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা! বিড়বিড় করলেন নিজের মনে। দরজার বাইরে ও কে! অবিকল শচীদাসের মতো দেখতে! মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি হুবহু মিল। মানুষের এরকম কার্বনকপি হয় নাকি?

আগন্তুক ছেলেটি ঘরের ভেতরে ঢুকতেই শচীদাস দু-পা পিছনে সরে এল। একেবারে নীলাম্বরবাবুর পাশে।

ব্যাপার দেখে হতভম্ব নীলাম্বরবাবু চোখ দুটো বড়-বড় করে শচীদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর যমজ ভাই ছিল, বলিসনি তো!'

শচীদাস কোনও উত্তর দিল না। নীলাম্বরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে।

ছেলেটি ঘরে ঢুকেই আছড়ে পড়ল নীলাম্বরবাবুর পায়ের ওপর, 'দু-দিন কাজ করতে আসিনি বলে তাড়িয়ে দেবেন না, বাবু! আপনি না রাখলে খেতে পাব না। মাগ্‌গির বাজারে না খেয়ে মরব।'

'কে তুই?' নীলাম্বরবাবু চিৎকার করে উঠলেন।

'আমায় চিনতে পারছেন না, বাবু?' ছেলেটির কণ্ঠে আকুতি, 'আমি শচীদাস।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠলেন নীলাম্বরবাবু।

'মা মরে গেলে পর আপনি আমায় পঞ্চাশটা টাকা দিলেন মায়ের সৎকারের জন্যে। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, "মা তো কারও চিরকাল থাকেন না!"' আগন্তুক শচীদাস কেঁদে ফেলল, 'মা মরে যেতে মনটা বড্ড খারাপ লাগত, তাই দু-দিন আসতে পারিনি।'

নীলাম্বরবাবু এবারে ঘরের শচীদাসের দিকে তাকালেন: 'তুই তাহলে কে?'

'শচীদাস!' ঘরের শচীদাস নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

আগন্তুক শচীদাস চমকে উঠে ঘরের শচীদাসের মুখের দিকে তাকাল। ঘরের শচীদাসের অবস্থা তখন কাহিল। নিজেকে যে নিজেরই সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে, ও যেন তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

আগন্তুক শচীদাস এগিয়ে গেল ঘরের শচীদাসের কাছে।

নীলাম্বরবাবু গম্ভীর স্বরে দুজনকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আসল শচীদাস ? তোমরাই বলো ! নইলে আমি দুজনকেই পুলিশে দেব।'

ঘরের শচীদাস দৃপ্তকণ্ঠে বলল, 'আমিই আসল। আমিই আপনার কাজকর্ম করি। ফাইফরমাশ খাটি। তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করি বলে আপনি আমাকে কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করেন। আমিই রাতের অন্ধকারে খরগোশ শিকার করতে বেরোই। আপনার ফুলের বাগান আমারই হাতে গড়া। আমিই লাঙল আর বলদ এনেছিলাম চাষ করার জন্যে। আমিই মংলু-মাঝির ডুবন্ত ছেলেকে পুকুর থেকে উদ্ধার করেছিলাম।' লম্বা একটা শ্বাস টেনে ফের বলল, 'তবে হ্যাঁ ! ও যদি এখানে থাকতে চায় থাকুক ! আমি চলে যাব। দুটো হাত যখন রয়েছে, খেটে খাব। না খেয়ে মরব না।'

নীলাম্বরবাবু কোনও জবাব দিতে পারলেন না। ওঁর দু-চোখে বিস্ময়। এতদিন শচীদাস ওঁর কাছে কাজ করছে, অথচ উনি আসলটিকে চিনে নিতে পারছেন না ?

আগন্তুক শচীদাস নীলাম্বরবাবুর মুখের দিকে করুণ চোখে তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে বলল, 'ওর কথাই ঠিক। আসল শচীদাস ও। আমি ওর কপি। ভিন্ গ্রহের প্রাণী। নাম বলব না। ধরুন, মহাকাশের কোনও এক গ্রহ থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল আপনাদের পৃথিবীতে।'

'মহাকাশ থেকে ?' নীলাম্বরবাবুর চোখেমুখে আতঙ্ক, 'কেন ?'

'আমাদের নক্ষত্রে এখন কাজের লোকের খুব অভাব। কাজের লোক বলতে যে-রোবটই একমাত্র ভরসা, তারা কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফলে, আমাদের গ্রহ এখন ধ্বংসের মুখে। তাই মহাকাশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাজির হয়েছিলাম, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অধিবাসীদের কাজকর্ম কীভাবে চলে, জানতে, শিখতে। আমার দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর।' কপি-শচীদাস গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল।

ঝাঁঝিয়ে উঠল আসল শচীদাস, 'বাঃ, বেড়ে গল্প বানাতে পারিস তো !'

নকল শচীদাস শুকনো হাসি হাসল, 'তোমার চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম, তোমরা কীভাবে কাজকর্ম করো জানতে। কিন্তু, তোমার মতো হতে পারলাম কই ? তোমার মতো গুণের অধিকারী হওয়া কোনওমতেই সম্ভব হল না আমার। ধরা পড়ে গেলাম। দেখলাম, পৃথিবীর মানুষ যন্ত্রকেও হার মানায়। তোমরা বিজ্ঞানকে জয় করেছ, কিন্তু আমাদের মতো বিজ্ঞান তোমাদের জয় করেনি। তোমরা যেভাবে কাজ করো, আমরা তা কোনওদিনই করতে পারব না। একেই আমরা ক্লান্ত, তাই তোমাদের মতো কাজকর্ম করতে হলে দু-দিনেই ফুরিয়ে যাব।'

নীলাম্বরবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল। নকল শচীদাসের কথা ওঁর মগজে ঢুকল না। পা টলছিল ওঁর। আসল শচীদাস ওঁকে ধরে বারান্দায় রাখা

ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিল। তড়িঘড়ি একটা হাতপাখা জোগাড় করে বাতাস করতে লাগল।

নকল শচীদাস পিছনে বলতে-বলতে এল, 'পৃথিবীর মানুষের সত্যি তুলনা নেই ! মহাকাশে একটা কথা প্রায়ই শুনতাম, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রবাসীদের মধ্যে পার্থিব জীবরা সবদিক দিয়ে, সবার চেয়ে উন্নত। কথাটা দেখলাম অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি !' নকল শচীদাস গেঞ্জিটা গা থেকে টেনে খুলে ফেলল।

নীলাম্বরবাবু দেখলেন, নকল শচীদাসের বুকের ওপরে রেডিয়োর মতো দুটো নব। একটা লাল, অন্যটা সবুজ। ও নব দুটোতে হাত রেখে হাসল : 'আমার কোনও বিপদ হলেই লাল নবটা ঘোরালে বিস্ফোরণে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

নীলাম্বরবাবু হাত বাড়িয়ে নকল শচীদাসকে থামাতে গেলেন।

'উঁহু !' নকল শচীদাস বলল, 'আমি সবুজ নবটাই ঘোরাব এবং আমার নিজের গ্রহে ফিরে যাব।'

ও সবুজ নবটা ঘোরাতেই একটা উজ্জ্বল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল নীলাম্বরবাবুর।

তিনি দেখলেন নকল শচীদাস চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে একটা উজ্জ্বল আলোর পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে গেল। যেন উবে গেল কর্পূরের মতো।

নীলাম্বরবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিল ওঁর দিকে।

ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে আচ্ছন্নের মতো শুয়ে রইলেন তিনি।

আসল শচীদাস ভয় পেয়ে হাত-পাখাটা মেঝেতে ফেলে দিল।

তারপর উদ্বিগ্ন গলায় চিৎকার করে উঠল, 'বাবু ! বাবু !'

'বাবু ! বাবু !'

শচীদাসের ডাক শুনে নীলাম্বরবাবু ইজিচেয়ারে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দু-হাতে চোখ রগড়ে সামনের দিকে তাকালেন। চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বাগানের গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। চমকে উঠলেন তিনি। এতক্ষণ কি বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলেন ?

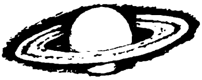
'বাবু !...বাবু !' আবার কানে এল শচীদাসের ডাক। বাগানের পাঁচিল টপকে শচীদাস ওঁর সামনে এসে বলল, 'দরজা খোলা না পেয়ে পাঁচিল টপকে এলুম।' তারপর হাউহাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'মা মারা গেছেন !'

'সে তো আমি জানি।' বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না নীলাম্বরবাবু।

ছবি : দেবাশীষ দেব

রঙের রহস্য

চঞ্চল পাল



দুপুরের পর থেকে অয়নকে কি ভূতে পেয়েছে ? বাবা, মা, ঠাকুমা, পিসিমার মুখে হাসি নেই, উচ্ছ্বাস নেই। অয়নের সঙ্গে সকলেই বেশি কথা বলছে বটে, কিন্তু চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে। যেন অয়ন অন্য গ্রহের একটা আশ্চর্য জীব। বোন ঝিমলি তো কাছেই আসতে চাইছে না। ওর সন্দেহ, দাদা যদি কামড়ে-টামড়ে দেয় !

তেমন কিছু তো ঘটেনি দুপুরবেলা ! অয়ন তার টেবিলে বসে মন দিয়ে কী যেন একটা লিখছিল। হঠাৎ ঝিমলি পিছন থেকে চুপিচুপি এসে দাদার কলমটা কেড়ে নিয়ে দে ছুট। ঝিমলির স্বভাবই এইরকম। দাদাকে খেপাতে তার খুব মজা লাগে। কিন্তু সেদিন অয়ন এত রেগে গিয়েছিল যে, ঝিমলিকে হাতের কাছে পেলে কান দুটো হয়তো ছিঁড়েই নিত। সেজন্য ঝিমলিকে তাড়াও করেছিল। কিন্তু ঘরের ওই চৌকাঠটা সব ভেস্তে দিল। অয়ন হোঁচট খেয়ে এত জোরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল যে, রান্নাঘর থেকে মা আর পিসিমা দৌড়ে না এসে থাকতে পারলেন না।

কিন্তু এ কী ! অয়ন যে নিঃসাড় ! এত জোরে মাথায় লেগেছে যে, অজ্ঞান হয়ে গেল ! মা দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এসে কপালে ছেটাতে লাগলেন, পিসিমা একটা হাতপাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে শুরু করলেন।

মিনিটতিনেক পরেই জ্ঞান ফিরে এল অয়নের। চোখ খুলেই ধড়মড় করে উঠে বসল, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু মায়ের হাতে জলের ঘটি, পিসিমার হাতে হাতপাখা আর নিজের সারা মুখ ভেজা দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ?' পরক্ষণেই কপালে হাত দিয়ে সে বলে উঠল, 'উঃ, কী ব্যথা !'

'কী করে পড়ে গেলি, বাবা ? খুব লেগেছে ?' মা অয়নের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলতে লাগলেন।

'বউদি, এক্ষুণি দাদাকে ফোন করো। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। যদি মাথায় কিছু ইন্টারনাল হেমারেজ হয়ে যায়...। আঘাতটা বোধহয় খুব সিরিয়াস, না হলে অজ্ঞান হয়ে যাবে কেন ?' পিসিমা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন।

'অ্যাঁ, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ? তা হবে। ওঃ, মাথাটা দপদপ করছে দ্যাখো না পিসিমা, ঝিমলিটা শুধু আমার পিছনে লাগে। মন দিয়ে লিখছি, সেই সময় কলমটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।' বলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ধরতে গেল ঝিমলিকে। রাগটা তার তখনও কমেনি।

এত কাণ্ড হয়ে যাবে জানলে ঝিমলি কি কলম নিয়ে পালাত ? ভয়ে তার চোখ-মুখ যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এইবার হয়তো মা তার বিনুনিটা ধরে পিঠে তিন ঘা কষিয়ে দেবেন। তাই দরজার পাশে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে ধরা রয়েছে সেই কলমটা।

ঝিমলির হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিয়ে অয়ন ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল ঝিমলির গালে। ঝিমলিও কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

কিন্তু এ কী ! কলমটা হাতে নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিল অয়ন। রাগটা যেন আরও বেড়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় রেখেছিস আমার কলম ? নিয়ে আয় এক্ষুণি, না হলে তোকে আজ...'

ঝিমলি রীতিমত ঘাবড়ে গেল, কান্নাও থেমে গেল হঠাৎ। আমতা-আমতা করে বলল, 'ওটাই তো তোর কলম, ওটা দিয়েই তো লিখছিলি।'

'মা, তুমি ঝিমলিকে এখনও কিছু বলবে না ? এত কাণ্ডের পরেও ও আমার লাল কলমটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছে !' অয়ন চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

শুনে ঝিমলি আর স্থির থাকতে পারল না। সেও রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাকে দিয়ে মার খাওয়ানোর জন্যে মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে !' তারপর মায়ের দিকে ফিরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'বিশ্বাস করো মা, এটাই সেই লাল কলমটা, অন্য কোনও কলম আমি নিইনি।'

'কী, আমাকে হাঁদা পেয়েছিস ? কালো কলমকে বলছিস লাল !' বলে আবার একটা চড় কষাতে গিয়েছিল অয়ন।

মা আর পিসিমা তার হাতটা ধরে ফেললেন, নিজেদের মধ্যে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন, তারপর একটু আদরের সুরে পিসিমা বললেন, 'অয়ন, কী বলছিস তুই, ভাল করে দ্যাখ, ওটাই তো সেই লাল কলমটা, যেটা আমি তোকে গতবার জন্মদিনে দিয়েছিলাম।' পিসিমার স্বরে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল।

'পিসিমা, তুমিও কি পাগল হয়েছ ? এটাকে বলছ লাল কলম ?' বলে অয়ন খুব নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল কলমটা। তারপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আশ্চর্য ! একই রকম দেখতে, গায়ের ওপর ছাপ মারা WILSON। শেষের N অক্ষরটা লাল কলমটার মতোই মুছে গেছে। পিছন দিকটায় ঠিক সেইরকম দাঁতে কামড়ানোর দাগ ! হুবহু সেই কলমটা ! অথচ রঙটা কালো হয়ে গেল কী করে ?'

পিসিমা বারবার বলতে লাগলেন, 'ওটা তো লালই রয়েছে, কালো তো হয়ে যায়নি !' কিন্তু অয়ন কিছুতেই যেন বিশ্বাস করে না।



অয়ন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল উত্তর আকাশের দিকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'মামা, একটা অদ্ভুত রঙের রামধনু।'

✱

সেই শুরু। তারপর থেকে একটার পর একটা অদ্ভুত কথা বলে চলেছে অয়ন। তার চোখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন এক নতুন জগৎ হয়ে গেছে। বারান্দায় হলুদ গাঁদাফুল মিশমিশে কালো হয়ে ফুটে আছে, টেবিলের ওপর রাখা কমলালেবুগুলো যেন কালো মাটির তৈরি, রাস্তায় লাল রঙের সরকারি বাসগুলোর গায়ে কে যেন আলকাতরা লেপে দিয়েছে। অথচ আকাশ তার চোখে সেই আগের মতোই নীল, গাছের পাতা আগের মতোই সবুজ, টেবিলের ওপর দোয়াত-ভর্তি কালির রঙও পালটায়নি। অর্থাৎ, এ-পৃথিবীতে লাল, হলুদ, কমলা বলে কোনও রঙ নেই, আছে শুধু সবুজ, নীল আর বেগুনি। শুধু তাই নয়, কয়েকটা নতুন রঙও সে দেখতে পাচ্ছে মাঝে-মাঝে। হঠাৎ একবার বলল, 'মা, তোমার আর পিসিমার চুলের রঙ তো ছিল একই—কালো, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের চুলের রঙে বেশ তফাত!'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলছিস তুই!'

পিসিমা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও বউদি, তোমার চুলের ডগা থেকে একটু চুল ছিঁড়ে দাও তো।'

মা মাথা থেকে একটু চুল ছিঁড়ে দিলেন। তারপর পিসিমা নিজের মাথা থেকেও একগাছা ছোট চুল ছিঁড়ে দৌড়ে চলে গেলেন বাবার ঘরে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'অয়ন! এ-ঘরে আয়! দ্যাখ, দুটো চুল আমি টেবিলের ওপর রেখেছি। বল তো কোনটা কার?'

অয়ন মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বলে দিল, 'পিসিমা, বাঁ দিকেরটা তোমার, ডান দিকেরটা মায়ের।'

মা-ও ততক্ষণে অয়নের পিছনে চলে এসেছেন। দুজনেই হতবাক। না, অয়ন তো মিথ্যে কথা বলছে না।

মায়ের ফোন পেয়ে বাবা প্রায় ছুটতে-ছুটতে বাড়ি ফিরে এলেন। সব শুনে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। পিসিমা বললেন, 'দাদা, এক্ষুণি অয়নকে কোনও আই স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাও, ও কালার ব্লাইন্ড হয়ে গেছে।'

'আজকাল স্পেশালিস্টদের যা বাজার, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে কথাই বলতে চান না। তার ওপর রুগির ভিড় এত যে, এক মাসের কমে ডেট পাওয়াই যায় না।' নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে অয়নের বাবা ভাবতে লাগলেন। একটু পরে মায়ের দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ গো, অনুকে একবার আসতে বলো তো, ওর সঙ্গে অনেক বড়-বড় লোকের চেনাজানা আছে। বাবার চোখ অপারেশান যিনি করেছিলেন, কী যেন নাম তাঁর, ভুলে গেছি, সে তো অনুই ঠিক করে দিয়েছিল, দু-দিনের মধ্যে।'

অনু মানে ডঃ অনুতোষ চক্রবর্তী, অয়নের মামা। রেডিয়ো ফিজিক্সের রিডার, থাকেন শ্যামবাজারে। অয়নদের যত আত্মীয় আছেন, তাঁদের মধ্যে এই

অনুমামা বাড়িতে এলে অয়ন সবচেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কী সুন্দর গল্প করতে পারেন অনুমামা! আকাশের কত না অজানা তারার কথা বলেন, অদ্ভুত সব জগতের কথা শোনান, আর সবচেয়ে বড় কথা, এ-বাড়িতে এলে একটা-না-একটা ছবিওলা বই নিয়ে আসবেনই।

আজ কিন্তু বই আনেননি অনুমামা। তাঁর দিদির ফোন পেয়ে সটান চলে এসেছেন সায়েন্স কলেজ থেকে। বুঝতেই পেরেছেন যে, অয়নের সিরিয়াস কিছু হয়েছে, তাই উপহার কেনার সময় এটা নয়। হাতে শুধু একটা অফিসের ফাইল। অবশ্য অনুমামা দরজায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে অয়নের চোখ পড়ে গিয়েছিল তাঁর হাতের দিকে।

'মামা, ওটা কী এনেছ কালো মলাট দেওয়া, আমার বই!' অয়ন লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল।

'না অয়ন, কাল একটা সুন্দর বই এনে দেব ঠিক। এটা আমার অফিসের ফাইল। কিন্তু, কিন্তু এটাকে তুমি কালো রঙ বললে কেন? ফাইলটা তো হলদে!' মামা ফাইল নাড়াতে-নাড়াতে জিজ্ঞেস করলেন।

'নাঃ, এমনই।' অয়ন বুঝে গেছে, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। তবু একবার আমতা-আমতা করে না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'আচ্ছা মামা, তোমার চুলের রঙ কি পালটে গেছে?'

মামা মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'চুলের রঙ? কই, না তো, কালোই তো আছে। কেন বলো তো?'

'না, এমনই।'

মামার গলা পেয়ে অয়নের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এসো অনু, এই ঘরে। ওর সঙ্গে পরে কথা বোলো। একটা ভীষণ জরুরি দরকারে তোমাকে ডেকেছি।' বলে অয়নের বাবা অনুমামাকে নিয়ে গেলেন শোয়ার ঘরে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুমামাকে সব খুলে বললেন অয়নের বাবা, আর বললেন, কিছু একটা ব্যবস্থা করতে।

সব শুনে অনুমামা নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন, চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না। একটু পরে হাঁটুতে একটা থাপ্পড় মেরে তড়াক করে উঠে পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, জামাইবাবু, আপনি অয়নকে রেডি করে দিন, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসছি। আই স্পেশালিস্ট ডাঃ অম্বরীশ ঘোষ আমার স্কুলের বন্ধু, ওঁর চেম্বারে যেতে হবে।'

ডাঃ অম্বরীশ ঘোষ যা বললেন, তা আগেই সন্দেহ করেছিলেন অনুমামা। কালার ব্লাইন্ডের কেস এটা নয়। 'রঙ-কানা' লোকেরা একটা কি দুটো রঙ ভাল করে বুঝতে পারে না, তাও যদি খুব হালকা শেড হয়। কিন্তু তাই বলে অয়নের মতো গোটা তিনেক রঙ পুরোপুরি দৃষ্টি থেকে লোপ পেয়ে যাওয়া আজ পর্যন্ত ঘটেনি। ইন্টারনাল হেমারেজ একটা ধরা পড়েছে বটে ই-ই-জি মেশিনে, কিন্তু

তাতে মস্তিষ্কে কোনও রক্তক্ষরণও হয়নি, মস্তিষ্কের অন্য নার্ভগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর পরের কথাগুলো অনুমামা কিছুতেই মানতে পারছেন না। ডাঃ ঘোষ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেসটা সাইকোলজিক্যাল। অর্থাৎ মানসিক কোনও আঘাত বা উত্তেজনায় সে ভুল বকছে বা ভুল দেখছে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, কোনও লাল জিনিসের প্রতি তার বিরক্তি বা কালো জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি বা রঙ নিয়ে কোনও মানসিক ধাক্কা...ইত্যাদি-ইত্যাদি।

কিন্তু অনুমামার সংশয় যায় না। একবার ভাবেন, 'এতটুকু ছেলের এইসব মানসিক জটিলতা!' আবার পরক্ষণেই মনে হয়, 'কী জানি, হতেও পারে!'

অয়ন আর জামাইবাবুকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার পর থেকে অনুমামা কেবলই ভাবছেন এইসব কথা। কেবলই মনে হচ্ছে, এইটুকু একটা ছোট্ট ছেলে হঠাৎ পাগল হয়ে যাবে কী করে! অথচ এটাও জানেন যে, পাগলের ভুল বকা আর অয়নের ভুল বকার মধ্যে তফাত অনেক। পাগলের কথায় কোনও সঙ্গতি থাকে না, আজ যাকে বলে 'সাদা', কাল তাকে বলে 'কালো'। কিন্তু অয়ন তো তা নয়। অয়ন যে সকলের কালো চুলের রঙ একরকম দেখছে না তা তো প্রমাণ করেছে ওর মা আর পিসিমার চুল ঠিক-ঠিক বলে দিয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কালো রঙের মধ্যে সে কয়েকটা নতুন রঙও দ্যাখে, যার নাম বলতে পারে না। কোনও কালার ব্লাইন্ড লোক এ রকম নতুন কিছু দেখবে না।

ভাবতে-ভাবতে বাড়িতে এসে গা ধুয়ে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েন অনুমামা। অফিস থেকে ফাইলটা এনেছিলেন একটা কাজ করবেন বলে। কিন্তু কাজে মন লাগছে না—একদিকে ছেলেটার ট্র্যাজেডি, আর-একদিকে রহস্যের গন্ধ তাঁকে বিছানায় কেবলই এপাশ-ওপাশ করাচ্ছে। বাইরে তারাদের চুমকি বসানো অনন্ত আকাশ তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে অপলকে। এখনও কত রহস্য লুকিয়ে আছে জানলা দিয়ে দেখা ওই একচিলতে মহাকাশে। মানুষ যা দেখছে তার কিছুটা সত্যি কিছুটা মিথ্যে। এ ছাড়া আরও অনেক কিছু তো চিরকালই তার অগোচরে রয়ে যাবে। কারণ কত তারা বহুকাল আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তবু আমাদের চোখে তার শেষ আলো এখনও আসছে আর আমরা ভাবছি তারাটা বুঝি রয়েছে। আবার কত বস্তু থেকে বেরোচ্ছে শুধু অবলোহিত, অতিবেগুনি বা রেডিয়ো-তরঙ্গ। তাদের চোখে দেখা যায় না, কারণ আমাদের চোখ শুধুমাত্র একটা সীমাবদ্ধ কম্পাঙ্কের আলোকতরঙ্গ ধরতে পারে, তার বাইরে হলেই আর তা চোখে পড়বে না।

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ কী হল অনুমামার! দরদর করে ঘামতে শুরু করলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়। তারপর খাট থেকে লাফিয়ে নেমে আলোটা জ্বাললেন। টেবিল-ঘড়িটা আলমারির ওপর টিকটিক করে

বলছে ১২টা ৩৫ মিনিট। রাত অনেক হয়েছে। তা হোক। উত্তেজনায় দেরাজটা খুলে ফেললেন ঝপাং করে। পাজামাটা ছেড়ে একটা প্যান্ট পরলেন, তারপর একটা হাওয়াই শার্ট গলিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে চেঁচাতে লাগলেন, 'ভজুয়া, এই ভজুয়া। দরজাটা বন্ধ করে দে। আমি আসছি।'

কাজের লোক ভজুয়া সিঁড়ির ঘরে শোয়ার আয়োজন করছিল। দাদাবাবু এইরকম হন্তদন্ত হয়ে এত রাতে বেরিয়ে যাওয়ায় সেও কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল। তারপর সদর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিধান সরণি দিয়ে প্রায় ছুটতে লাগলেন অনুমামা। অয়নের বাড়ি বেশি দূরে নয়, দরজিপাড়ায়। তবু মনে হচ্ছে কয়েক মাইল পথ। ঘামতে-ঘামতে হাঁফাতে-হাঁফাতে অয়নদের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নেড়েই চললেন।

কড়া নাড়ার শব্দে অয়নের বাবাও হাঁকপাঁক করে ছুটে এলেন। দরজা খুলেই বললেন, 'কী ব্যাপার, এত রাতে ? কোনও বিপদ ?'

'না, না, বিপদ কিছু নয়। অয়ন কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?' বলেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন অনুমামা। সিঁড়ির মুখে অয়নের মা দাঁড়িয়ে। তাঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে শুধু বললেন, 'ভয় নেই, কিছু হয়নি, পরে সব বলব।' বলেই সটান অয়নের শোয়ার ঘরে।

অয়নেরও আজ ঘুম আসছে না। মনে-মনে শুধু ভাবছে, 'কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না। আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি ? আমি কি ভূত দেখছি ?'

হঠাৎ অনুমামাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে ধড়মড় করে উঠে বসল। অনুমামা তাড়াতাড়ি তার ডান হাতটা খপ করে ধরে বললেন, 'অয়ন, আয় তো একবার ছাদে।' বলেই ওকে প্রায় হিড়হিড় করে টানতে-টানতে নিয়ে চললেন। অয়নের মা-বাবাও কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর পিছন-পিছন ছুটলেন ছাদের দিকে।

অনুমামা অয়নকে উত্তর দিকের পাঁচিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'দ্যাখ তো, ওইদিকে আকাশে কোনও কিছু অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ছে কি না।'

অয়ন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল উত্তর আকাশের দিকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'মামা, একটা অদ্ভুত রঙের রামধনু।'

অনুমামার গলা উত্তেজনায় প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। শুধু অয়নের বাবার দিকে তাকিয়ে ধরাগলায় বললেন, 'জামাইবাবু, কাল প্লিজ, অফিসে যাবেন না। আমি সকালে আসব। তখন সব বুঝিয়ে বলব। আমাকে বাড়ি গিয়ে এক্ষুণি একটা অ্যাস্ট্রোনমির বই ঘাঁটতে হবে। শুধু এটুকু বলে যাচ্ছি যে, ঘাবড়াবার কিছু নেই।' বলেই যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনভাবে এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

★

পরদিন সওয়া ১২টা হবে। অনুমামা বাড়িতে এসে হাজির। সঙ্গে দুজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অয়নের বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—রেডিয়ো ফিজিক্সের প্রোফেসর, ভারতবিখ্যাত বিজ্ঞানী। তারপর বললেন, 'এঁরা এসেছেন অয়নের সঙ্গে কথা বলতে।'

অয়নের বাবা বললেন, 'বসুন, বসুন। ও বাথরুমে ঢুকেছে, এক্ষুণি বেরোবে। বুঝলে অনু, সুখবরটা আগে তোমাকে দিয়ে দিই। ওর রঙের গোলমালটা একদম ভাল হয়ে গেছে। আজ ঘুম থেকে উঠে যা-যা দেখেছে তা নাকি আগের মতো—সেই কলমটা, আমাদের চুল, গাঁদাফুল...।' বলেই হো-হো করে হাসতে লাগলেন অয়নের বাবা।

'জামাইবাবু!' বলে একটা আর্তনাদ করে ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়লেন অনুমামা : 'ভাল হয়ে গেছে! বিজ্ঞানের এত বড় একটা বিস্ময় এঁদের আর দেখাতে পারব না?'

অয়নের বাবার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'কী ব্যাপার অনু, কাল থেকে তুমি কীসব বলে যাচ্ছ, কিছু বুঝতে পারছি না।'

অনুমামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে সব খুলেই বলি!'

'নিশ্চয়ই জানেন যে, আমাদের চোখ কিছু নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলো ধরতে পারে। সবচেয়ে বেশি কম্পাঙ্কের আলো হচ্ছে লাল, তারপর ক্রমশ কমতে-কমতে কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, কালচে নীল ও বেগুনি। ইংরেজিতে যাকে VIBGYOR বলে আর কি। পৃথিবীর যাবতীয় রঙ এই রঙগুলোর মিশ্রণ।

'আমাদের মস্তিষ্কে "রড্‌স" আর "কোন্‌স" নামে যে দু-দল স্নায়ুপুচ্ছ আছে তারাই আসলে রঙের সংবেদন ঘটায়। মাথায় আঘাত পেয়ে অয়নের মস্তিষ্কের এই রঙ-সংবেদনশীল স্নায়ুগুলো কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটু এদিক-ওদিক হয়ে পড়েছিল। ফলে ওর রঙের সংবেদন সরে যায় অন্য কম্পাঙ্কের দিকে। এই অন্য কম্পাঙ্কের শুরু লাল থেকে নয়, সবুজ থেকে। ফলে কম্পাঙ্কটা শেষ হয়েছে বেগুনির আরও অনেক পরে। এই শেষের দিকের রঙগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এদের বলা হয় আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি। কিন্তু অয়ন কাল এই অতিবেগুনি রশ্মির রঙগুলোই দেখতে পাচ্ছিল, যা ওর কাছে অচেনা।

'আবার, যে-রঙ বা আলোকরশ্মি আমরা দেখতে পাই না, তাকে আমরা দেখি কালো। আমাদের চুলে হয়তো অতিবেগুনি কয়েকটা রঙ আছে যা আমরা দেখতে পাই না বলে মনে হয় সবারই একই রকম কালো চুল। কিন্তু অয়ন ঠিক বুঝতে পারছিল এই রঙের পার্থক্য। তাছাড়া, লাল, কমলা ও হলুদ রঙ ওর চোখে ধরাই পড়ত না বলে ওই রঙের জিনিসগুলোকে মনে হত কালো।

'হঠাৎ কাল রাতে এ-কথাগুলো মাথায় খেলে যায় বলে আমি ছুটে এসেছিলাম। কারণ, উত্তর আকাশে যে-ভ্যান অ্যালেন বেল্ট ঘিরে আছে, তা

একটা বিকিরণ বলয়। খালি চোখে দেখা যায় না, রেডিয়ো টেলিস্কোপে শুধু ধরা পড়ে। অথচ ওখান থেকে অতিবেগুনি রশ্মিও আসছে। তাই ভাবলাম, আমার সন্দেহ যদি ঠিক হয় তাহলে অয়ন নিশ্চয়ই ওটাকে দেখতে পাবে। দেখলও তাই। আমরাও যদি দেখতে পেতাম তা হলে আমাদের মনে হত যেন একটা রামধনু।

'পশুপাখিদের মধ্যে এই রঙ দেখার ব্যাপারটা অনেকরকম। কেউ শুধু বিভিন্ন শেডের সাদা-কালো দ্যাখে, কেউ আবার তিন-চারটে রঙ ছাড়া বাকি সব সাদা-কালো দ্যাখে। কিন্তু মানুষের মধ্যেও যে এটা হতে পারে, ভবিষ্যতে বিবর্তনের ফলে আমাদের চোখেও যে অতিবেগুনি বা অবলোহিত রশ্মি ধরা পড়তে পারে, তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ আমাদের অয়ন। ওকে নিয়ে অনেক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেত।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে অনুমামা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অয়নের মা ও পিসিমা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কানখাড়া করে শুনছিলেন। অয়নের মামার কথা শেষ হতেই পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বুঝলে, বউদি ?'

অয়নের মা গটগট করে রান্নাঘরের দিকে চলে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'বলিহারি ব্যারাম বাপু ! থাকলেও জ্বালা, সারলেও জ্বালা।'

ছবি : দেবাশীষ দেব

অচেনা শত্রু

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়



রাত্রি গভীর হলেই এখানকার চেহারাটা কেমন বদলে যায়। আশপাশে জনমনিষ্যির বাস নেই। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। পাহাড় বলতে অবশ্য বড় পাহাড় নয়, টিলা। কিন্তু জঙ্গলটা ঘন। রাত্রি হলেই ছোপ-ছোপ গভীর কালো অন্ধকার চারদিকটাকে ঢেকে নেয়। তখন শুধু আকাশটুকুই খোলামেলা। পরিষ্কার আকাশে আলো ফুটে থাকে। রাত্রির নিজস্ব আলো। আর ঝাঁক-ঝাঁক তারা।

গভীর রাত্রির এই কালোর দিকে, চোখ পিটপিট আলোর দিকে, চেয়ে থাকতে ভাল লাগে লছমনের। ওদের গাঁয়ের থেকে, কিংবা কলকাতা শহর থেকে এখানকার পরিবেশে বিস্তর তফাত হলেও ওই আকাশটুকু লছমনকে শান্তি দেয়—আপন করে নেয়। কতদিন হয়ে গেল লছমন এখানে রয়ে গেছে। দেশ-গাঁয়ে ফেরা হয়নি। লছমনের ছুটি নেই। অথচ দাদাবাবুর ওপর রাগ করতে পারে না লছমন।

আকাশে চেনা তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় বসে-বসে এ-সবই ভাবছিল সে। বারান্দা পেরিয়ে একফালি চত্বর। তার ওপারে বড় বাড়িটা। একতলা। ওর একেবারে পুবের বড় ঘরটা দাদাবাবুর। সে-ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। দাদাবাবু জেগে আছে। এই নির্বান্ধব পুরীতে দাদাবাবু আর দাদাবাবুর লোকজন কী করে, ভেবে পায় না লছমন। একটা বিরাট কারখানার মতো বিস্তর জিনিসপত্তর আছে ওই বাড়িটার প্রতিটি ঘরে। তা-ও যে কী কাজে লাগে ভগবান জানেন! এমনই জায়গাতে লছমন রয়ে গেছে শুধু দাদাবাবুর মুখ চেয়ে।

খুব মৃদু খসখসে এক ধরনের আওয়াজে লছমনের চিন্তার রশি ছিঁড়ে গেল। আওয়াজ অবশ্য এখানে হরেকরকম পাওয়া যায়। কী দিনে কী রাত্রে। গত কয়েক বছরে সেটা জেনে গেছে লছমন। জঙ্গলে বুনো ভালুক, দাঁতাল শুয়োর ছাড়াও দু-একটা বাঘটাঘের দেখা মিলতেই পারে। তাদের ডাকও শোনা যায় হামেশাই। আসলে কালো রাত্রির সঙ্গে ওইসব আওয়াজগুলো মিশে থাকে।

কোনওটাই আলাদা মনে হয় না লছমনের। কিন্তু এই খসখসে আওয়াজটা লছমনের কানে কেমন যেন অচেনা ঠেকল।

উঠে দাঁড়াল লছমন। হাতের কাছেই বড় টর্চটা রাখা ছিল। টর্চটা নিয়ে বারান্দা থেকে চত্বরে নেমে এল সে। শব্দটা বাড়ছে। বাঁধানো চত্বরের ওপারে বাগান। খুব সাজানো। বাগানের চারদিক বিরাট উঁচু পাঁচিল ঘেরা। কংক্রিট-বাঁধানো চওড়া রাস্তা বাগান ভেদ করে সোজা লোহার বিশাল গেটের কাছ পর্যন্ত চলে গেছে। বড়-বড় গাড়ি প্রায়ই আসে ওই রাস্তা ধরে। চলে আসে একেবারে এই বড় বাড়ির সামনে। অনেক লোকজন আসে দাদাবাবুর কাছে। সরকারি লোক, সায়েবসুবো। দাদাবাবু খুব মানী লোক। সবাই সম্মান করে। আর লছমনের মনে-মনে দারুণ গর্ব হয়। আজকের এই মানী লোকটিকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। তা দাদাবাবুও ওকে ভালবাসে। নইলে কি আর সঙ্গে নিয়ে আসত এতদূর!

বড় বাড়ির কাছে গিয়ে সারা বাড়ির বাইরে-বাইরে চক্কর দিয়ে পিছনের বাগানে এসে দাঁড়াল লছমন। এদিকে আওয়াজটা যেন অনেকটা জোর। বাড়িতে এতগুলো লোক, কারও কানে আওয়াজটা যাচ্ছে না কেন? অনেকটা ঝিঁঝির ডাকের মতো। কিন্তু তার থেকেও কর্কশ। বাগানে আলো আছে। কিন্তু সচরাচর নেভানো থাকে। শুধু বড় বাড়ির মাথার ওপর উঁচু লোহার গম্বুজে লাল আলো জ্বলে সারারাত। গার্ডও আছে। কিন্তু কাছে-পিঠে কাউকে দেখছে না লছমন। লোকগুলো ফাঁকি দেয়। লছমনের সঠিক কোনও কাজ নেই এখানে। কিন্তু সবই দেখাশোনা করে লছমন। সবাই ভালবাসে ওকে, কথা শোনে। লছমন দাদাবাবুর খাস লোক।

পায়ে-পায়ে বাগানের শুঁড়িপথ পেরিয়ে একেবারে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়াল লছমন। টর্চের জোরালো আলো ফেলল চারদিকে। কোথাও কিছু নেই। কিন্তু আওয়াজটা আছে। আরও তীব্র, আরও বিশ্রী। ঠাওর করবার চেষ্টা করল লছমন, আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে। তারপর পাঁচিলের ধার দিয়ে পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেল।

বাগানের পুবধারে লোহার গেটের পাশে ছোট খুপরিতে বসে ঝিমোচ্ছিল দুজন রক্ষী। আরেকজনেরও থাকবার কথা, সারা বাগানে টহলদারি করবার কথা। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে এমন সুরক্ষিত দুর্গের মতো জায়গায় বিপদের তেমন কোনও সম্ভাবনা কোনওদিনই দেখা দেয়নি। কাজেই তৃতীয়জন নিশ্চিন্তে তার ডেরায় নাক ডাকাচ্ছিল অন্য রক্ষীদের সঙ্গে।

ঠিক এমন সময়েই হঠাৎ বীভৎস ভয়ার্ত চিৎকার চারপাশের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে দিল। রক্ত-হিম-করা সেই মরণ আর্তনাদে চমকে উঠল ওরা দুজন। তারপরেই রাইফেল আর ভোজালিটা নিয়েই একজন ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। চিৎকারটা থেমে গেছে। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর গোঙানির একটানা আওয়াজ কেঁদে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে। লোকটি ছুটল শব্দ লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়

লোকটি প্রথমে সুইচ টিপে বাগানের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল, তারপর বিপদ-ঘন্টির সুইচটা টিপে ধরল প্রাণপণে। গোঙানির আওয়াজ ছাপিয়ে ধাতব ঘণ্টার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তৃতীয় রক্ষীটি সদ্য ঘুম ভেঙে ভয়বিহ্বল মুখে ছুটে এসে দাঁড়াল লোহার গেটের সামনে। ঘন্টির শব্দ থেমে গেছে, বড় বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছে। চারদিক আলোয় ঝলমল করছে। ঠিক এমন সময় দ্বিতীয়বার অমানুষিক মরণ-চিৎকার ভেসে এল বাগানের প্রান্ত থেকে। রাত্রির নিস্তব্ধতা, বন-জঙ্গলের গাম্ভীর্য সেই কুঁকড়ে ওঠা আওয়াজে ফাটা কাচের টুকরোর মতো গুঁড়িয়ে গেল। সকলেই ছুটল সেই শব্দ লক্ষ্য করে বড় বাড়ির পিছনদিকে। ছুটতে-ছুটতে সকলেই শুনতে পেল একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ। বিচিত্র ভঙ্গিতে বারদুয়েক শিসটা বেজে উঠেই চারদিক নিস্তব্ধ হল। যেন কুটোটি পড়লেও শোনা যাবে।

রজতশুভ্র রায় গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসে ছিলেন নিজের ঘরে। গত দু-দিন কোনও কাজই করতে পারেননি। লেখাপড়া না জানা প্রৌঢ় লছমন সত্যি ওঁর আপনজন। কোনওদিনই মাইনে করা কাজের লোক ভাবতে পারেননি তাকে। কিন্তু এটাই সব নয়। দু-দিন আগের সেই রাতে প্রায় একই সঙ্গে দুটো মানুষের বীভৎস মৃত্যু গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে রজতশুভ্রকে। চোখ বুজলেই ছবিটা ভেসে উঠছে। চাপ-চাপ রক্তের মাঝখানে পড়ে ছিল লছমনের মৃতদেহ। শুধু পড়ে থাকা টর্চ আর পোশাকের কিছু অংশ ছাড়া শনাক্ত করবার মতো কিছুই ছিল না। কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে সারা শরীরটা পেঁচিয়ে কাটা হয়েছে যেন। আর খুবলে-খুবলে মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে শরীর থেকে। হাড় পর্যন্ত বাদ যায়নি! একেবারে পাঁচিলের ধারে পড়ে ছিল দেহটা। পাঁচিলের সেই অংশটায় একটা গর্ত। দুটো মানুষ স্বচ্ছন্দে গলে বেরিয়ে আসতে পারে। নেপালী রক্ষীটি বেঁচে থাকলে হয়তো বলতে পারত ঘটনাটা। কিছু একটা ওরা দেখেছিল নিঃসন্দেহে। নেপালীটি নিশ্চয়ই পাঁচিলের গর্ত গলে বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। সেখানেই সে আক্রান্ত হয়। তাকে অবশ্য চেনা যাচ্ছিল। কিন্তু বড় ভয়াবহ মৃত্যু। ওরও শরীরের অংশবিশেষ খুবলে নিয়েছিল যেন কোনও হিংস্র জন্তু। বিশাল কাতানের মতো ধারালো কিছু দিয়ে গলাটা চেপে ধরে দু-ভাগ করে দেওয়া হয়েছে—ডান হাতটাও।

সঙ্গে-সঙ্গে সরকারি ওপরমহলে যোগাযোগ করেছিলেন রজতশুভ্র। জাঁদরেল অফিসাররা পরের দিন কোনও হদিসই করতে পারেননি। এমনকি কংক্রিটের দশ ইঞ্চি পুরু পাঁচিল এফোঁড়-ওফোঁড় করা অত বড় গর্তটা কেমন করে হল, তাও বলতে পারলেন না ওঁরা। শুকনো মাটিতে পায়ের ছাপ বা ওই ধরনের কোনও সূত্রও পাওয়া গেল না। পাঁচিলের দু-পাশে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া সিমেন্ট, বালি পড়ে ছিল। অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে ফরেনসিক



…নেপালি রক্ষীদের একজন কোথা হতে ছুটে এল হাতে একটি বর্শা নিয়ে, আর মুহূর্তের মধ্যে উড়ন্ত প্রাণীটার হাঁ করা মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল বর্শাটা। বর্শাটা গিয়ে আমূল বিঁধে গেল জীবটির মুখের মধ্যে।

বিশেষজ্ঞরা তা নিয়ে গেছেন। সারা অঞ্চলটা পুলিশবাহিনী তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে।

সরকারি আমন্ত্রণে প্রবাস ছেড়ে আসার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর মধ্যপ্রদেশের এই জঙ্গলে নতুন ধরনের পারমাণবিক জ্বালানির ওপর গবেষণা করছেন ডঃ রজতশুভ্র রায়। সফলও হয়েছেন। সে-জ্বালানির উৎস লুকিয়ে আছে এই জঙ্গলের ভূস্তরে। শুধু পরমাণু বিজ্ঞানই নয়—রজতশুভ্রর গবেষণার বিষয় বিজ্ঞানের অনেক শাখাতেই বিস্তৃত।

স্থির ধীর মানুষটি কোনওদিনই নিজের কাজের বাইরে কিছু ভাবেননি। অবশ্য ভাববার মতো কিছু ঘটেওনি। কিন্তু এখন—দু-দিন আগের ঘটনার কথা ভাবতে-ভাবতে বিচলিত বোধ করলেন রজতশুভ্র।

সহকারী নিরুপম বোস এসে খবর দিলেন ফরেনসিক ল্যাবরেটরির মিঃ চোপরা দেখা করতে চাইছেন। দেখা করলেন রজতশুভ্র। কিন্তু নিরাশ হতে হল। সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি ওঁরা। আরও কিছুটা সময় চেয়ে নিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে মিঃ চোপরা বললেন, 'আপনাকে বলবার মতো কিছু খবর অবশ্য আছে। সিমেন্টের গুঁড়োতে কোনও প্রাণীর লালার সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-লালা মিশে আছে মৃতদেহ দুটোতেও। অথচ আমাদের চেনা কোনও প্রাণীর সঙ্গে ওই লালা রাসায়নিক বিশ্লেষণে মিলছে না। সবচেয়ে আশ্চর্য, ওর মধ্যে কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়েছে।'

মিঃ চোপরা চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুটা সময় চুপচাপ বসে ভাবলেন রজতশুভ্র। কোনওদিক দিয়েই কোনও কিছু মেলাতে পারা যাচ্ছে না। ধীরে-ধীরে উঠে পায়ে-পায়ে বাগানের দিকে এগোলেন রজতশুভ্র। নিরুপম সঙ্গে আসতে চাইল। ওঁকে নিবৃত্ত করলেন তিনি। বুঝতে পারছেন একটা অজানা ভয় সংক্রামিত হয়েছে সকলের মধ্যেই। নিরুপম সঙ্গে না এলেও একটা রাইফেল দিতে চেয়েছিল—তাও সঙ্গে নেননি রজতশুভ্র।

যেখানে লছমনের ক্ষতবিক্ষত দেহটা পড়ে ছিল, সেখানে খানিক দাঁড়ালেন রজতশুভ্র। তারপর কী মনে করে সামনের পাঁচিলের গর্তটা গলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। কিছুটা এগোলেই জঙ্গল ঘন হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় পাথরের টুকরো আর লম্বা হলুদ ঘাসে ছেয়ে আছে চারদিক। তার মধ্যে দিয়েই কিছুটা এগিয়ে এলেন রজতশুভ্র। বিকেল হয়ে আসছে। একটা বড় পাথরের টুকরোর ওপর বসে লক্ষ্যহীনভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন রজতশুভ্র।

পুলিশ অফিসারদের একজন বলছিল, কোনও ভারি জিনিস এখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—কোনও-কোনও জায়গার থেঁতলানো ঘাস দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু কী জিনিস তা অনুমান করা যায়নি।

বসে-বসে এলোমেলো ভাবনা ভাবতে-ভাবতে কতক্ষণ কেটে গেছে জানতে পারেননি রজতশুভ্র। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে সন্ধে নেমে

আসার ইঙ্গিত। চারদিক এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে আসছে। নানারকম জানা-অজানা পাখির সুর ভেসে আসছে। সেদিনের ঘটনার, সেই ভয়াবহ রাত্রির কোনও চিহ্ন, কোনও বৈসাদৃশ্যই আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় নেই। প্রকৃতি আপনমনেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, মানুষের জীবনের কোনও ঘটনাতেই তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

উঠে পড়তে গিয়ে যে-পাথরের ওপর উনি বসে ছিলেন তারই তলার দিকে নজর পড়ল ওঁর। একটা ছোট্ট জিনিস ঝকমক করছে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন, একটি টাইপিন। হিরে বসানো, নকশার মধ্যে খোদাই করা দুটো অক্ষর—আর. কে.। নেড়েচেড়ে দেখতে-দেখতে স্বাভাবিকভাবেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—আশ্চর্য! স্মৃতি কোনওদিনই রজতশুভ্রর বিরোধিতা করেনি। এই বিশেষ আকারের হিরে বসানো টাইপিনের মালিকের কথা খুব সহজেই মনে পড়ল ওঁর।

প্রায় বছর দশেক আগে পারী শহরে বিজ্ঞানীদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় আলাপ হয়েছিল রবার্ট কিংসলের সঙ্গে। তরুণ বিজ্ঞানী। সত্যিই কৃতী। কিন্তু ছেলেটির মনোভাব ঠিক ভাল লাগেনি রজতশুভ্রর। উনি নিজে তখন জেনেটিক্সের একটি বিশেষ শাখায় কাজ করছিলেন। ওঁর বক্তৃতা শোনবার পরই রবার্ট ওঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিল। একই বিষয়ে গবেষণা করছিল রবার্ট। বিশেষ জেনেটিক পদ্ধতির সাহায্যে একটি প্রাণীর চরিত্র বা শারীরিক গঠন সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া যায়। রজতশুভ্রর সাহায্য চেয়েছিল রবার্ট। বলেছিল, 'আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমরা পৃথিবীর সব শক্তিকে হার মানাতে পারব।'

রজতশুভ্র বলেছিলেন, 'আমি শুধু সম্ভাবনার কথা আমার বক্তৃতায় বলেছি। কিন্তু ব্যাপারটার কিছু খারাপ দিকও তো আছে। কাজেই যতক্ষণ না নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে, ততক্ষণ সরাসরি তোমাকে সাহায্য করবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। মানুষের কল্যাণ হবে এমন কিছু করলে তোমাকে নিশ্চয় সাহায্য করব। কিন্তু ক্ষমতা বা অর্থের লোভ আমার নেই।'

রবার্ট কিন্তু আশা ছাড়েনি। সম্মেলনের প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা করেছে রজতশুভ্রর সঙ্গে। তাঁকে পাওয়ার জন্য প্রচুর টাকার লোভও দেখিয়েছিল শেষপর্যন্ত। কঠিন হয়েছিলেন রজতশুভ্র। বলেছিলেন, 'তুমি যে-ক্ষমতার কথা ভাবছ, তার জন্যে গবেষণায় আমি বরং তোমার বিরোধিতাই করব এবং তোমার এই ঘৃণ্য মনোভাবের কথা আমি বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাশ করে দেব।'

রবার্টের কথা ভোলেননি রজতশুভ্র। তার সঙ্গে এই টাইপিনটাও। ছেলেটির তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টির সঙ্গে বুকের ওপর এই ঝকমকে বহুমূল্য টাইপিনটাও মনে রাখার মতোই। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার সেই তরুণের টাইপিন এই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে রজতশুভ্রর নিভৃত গবেষণাগারের কাছে কেন? বিগত দশ বছরে রবার্ট কিংসলের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তার কোনও খোঁজও

পাননি রজতশুভ্র। তাহলে কি এই নির্মম ঘটনার সঙ্গে রবার্ট জড়িত ? টাইপিনটা হাতে নিয়ে খুবই চিন্তান্বিতভাবে নিজের ঘরে ফিরে এলেন রজতশুভ্র।

সারা অঞ্চলটাতে সরকারি প্রহরার বন্দোবস্ত হয়েছে। রজতশুভ্রর নির্দেশে বাগানের আলো রাতে যথারীতি নেভানোই থাকছে। দুটি নিরীহ লোকের হত্যাকাণ্ড কখনওই শেষ নয়—ওটা শুরু। হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য আরও বড় কিছু—কাজেই সচেতন সকলেই। এমনকি গবেষণাগারের মধ্যে রজতশুভ্রর ষাটজন সহকর্মীও। রজতশুভ্র ঘুমোতে পারেননি। রবার্টের কথাটা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না। রাত বেশি হয়নি। গবেষণাগারের পুবপ্রান্তে নিজের ঘরে বসে রজতশুভ্র ভাবছিলেন, রবার্টের কী এমন স্বার্থ থাকতে পারে যার জন্য এখানে ছুটে এসেছে !

ঠিক এমন সময়ে একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ আর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার কানে এল, অসহায় কোনও কণ্ঠের আকুতি : বাঁচাও—বাঁচাও !

প্রায় ছুটতে-ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এলেন রজতশুভ্র। চিৎকারটা শুনেছে অনেকেই। সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। রজতশুভ্র দেখলেন প্রহরীদের একজন বাগানের পিছনের দিক থেকে প্রাণপণে ছুটে আসছে, তার পিছনে একটি বিচিত্র জীব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাকে তাড়া করে আসছে। প্রথমটায় রজতশুভ্র বুঝতেই পারলেন না, ওটা কী ! দেখতে আরশোলার মতোই প্রায়। সামনের পা দুটো বেশ লম্বা। কালচে-বাদামী পুরু আবরণে ঢাকা সারা শরীরটা। দুটো লম্বা শুঁড় ছড়ানো আছে সামনের দিকে। হাঁ-করা মুখের সবটাই ঘিরে শক্ত চোয়াল—ধারালো করাতের মতো খাঁজকাটা। জীবটি প্রায় ফুট চারেক লম্বা।

শুধু রজতশুভ্র নন, অনেকেই এগিয়ে এসেছে সামনে। প্রহরীদের ক্যাপ্টেন বাক্যব্যয় না করে রাইফেল তুলে ফায়ার করলেন অব্যর্থ নিশানায়। গুমগুম করে গর্জে উঠল রাইফেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, কিছুই হল না জীবটির। বরং ফল হল উলটো। বিচিত্র তীক্ষ্ণ সী-সী একটা আওয়াজ করে দু-পাশে দুটো বিশাল ডানা মেলে দিয়ে প্রায় উড়ে এসে পালিয়ে আসা লোকটির একটি পা কামড়ে ধরল সেই বীভৎস প্রাণীটা। তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল অসহায় মানুষটা। দুটো শুঁড় পেঁচিয়ে ধরেছে লোকটার গোটা শরীর। সামনের লম্বা কাঁটাওয়ালা পা দিয়ে মানুষটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে জীবটি, আর চক্ষের নিমেষে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল গোটা মানুষটা। রক্তে ভেসে গেল সবুজ ঘাসের লন।

দু-তিনজন প্রহরী তাদের সহকর্মীকে বাঁচাবার জন্য ছুটে গেল মরিয়া হয়ে ; বেয়নেটের খোঁচা আর রাইফেলের বাঁট দিয়ে অবিরাম আঘাত করতে লাগল

সেই প্রকাণ্ড কালো শয়তানের শরীরে। কিন্তু তার ডানা গোটানো রয়েছে, আর সে-আবরণ বোধ হয় ইস্পাতের চেয়েও শক্ত। কোনও আঘাতেই কোনও ক্ষতি হল না বিচিত্র প্রাণীটার। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে-চিরে যেতে লাগল মরণাপন্ন মানুষটির অসহায় যন্ত্রণার কাতরানিতে আর হিংস্র জীবটির অপার্থিব সী-সী ডাকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকটির দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে রইল ঘাসের ওপর, আর সঙ্গে-সঙ্গে পোকাটি ঘুরে গিয়ে কামড়ে ধরল আরেকজন প্রহরীর হাত। কনুইয়ের কাছ থেকে হাতটা কেটে চলে গেল জীবটির মুখে। লোকটি ছটফট করতে-করতে কোনওক্রমে পালিয়ে আসতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

রজতশুভ্র আর বাকি সকলেই নির্বাক দর্শকমাত্র। ভয়ের একটা হিমেল স্রোত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মানুষগুলোকে। তাদের যেন নড়বার ক্ষমতাও নেই। তিনটি নির্ভীক যোদ্ধা সমানে চেষ্টা করছে অপরিচিত বিশাল আগন্তুকটিকে ঘায়েল করবার। তিনজন একই সঙ্গে আক্রমণ করায় জীবটি একটু বেকায়দায় পড়েছে বটে, কিন্তু তার গায়ে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি সাহসী মানুষগুলো।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ শিসের মতো একটা বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল জীবটি। তারপরই দুটি ডানা মেলে ধরল দু-দিকে। ঠিক যেন একটি অতিকায় আরশোলা। সবে ডানা ঝাপটে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠেছে বিচিত্র জীবটি, সেই সময় নেপালি রক্ষীদের একজন কোথা হতে ছুটে এল হাতে একটি বর্শা নিয়ে, আর মুহূর্তের মধ্যে উড়ন্ত প্রাণীটার হাঁ করা মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল বর্শাটা। বর্শাটা গিয়ে আমূল বিঁধে গেল জীবটির মুখের মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্য ভারসাম্য হারিয়ে বিশাল প্রাণীটা গোত্তা খেয়ে পড়ল মাটিতে। ক্যাপ্টেন রণধীর রাইফেল বাগিয়ে ধরে চলে গেলেন প্রাণীটার কাছে। ছুটে এলেন রজতশুভ্রও। প্রাণীটার হাঁ করা মুখের মধ্যে গুলি করবার জন্য রাইফেল উঁচিয়ে ধরলেন রণধীরজী। কিন্তু তার আগেই সে তার ইস্পাত চোয়াল বন্ধ করল আর বর্শাটার লাঠি কেটে পড়ে গেল মাটিতে। এই সময়েই আবার শোনা গেল সেই বাঁশির আওয়াজ। সেটা শুনতে পেয়েই যেন প্রাণীটা সী-সী শব্দে ডেকে উঠল দ্বিগুণ জোরে। আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। চোখের পলকে প্রাণীটা ডানা মেলে উঠে গেল শূন্যে। বোঁ-ও-ও একটা শব্দ শোনা গেল এবং রাত্রির কালো আকাশে কালো প্রাণীটা কতদূরে উড়ে চলে গেল, বোঝা গেল না।

ক্যাপ্টেন রণধীরের মতো সাহসী লোকও ভয় পেয়েছেন। বাকি সকলে তো বটেই। আহত চারজনের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রণধীর বললেন, 'এমন দুশমনের বিরুদ্ধে তো লড়া যাবে না, স্যার। রাইফেলের গুলিও বেমালুম হজম করে নিল। এমন জীব মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আছে বলে কোনওদিন

শুনিনি। ওটা কী জিনিস, স্যার ?'

রজতশুভ্র ম্লান হাসলেন : 'ওটা একরকমের পোকা, রণধীরজী।'

'পোকা ? এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, স্যার।'

'ঠাট্টা নয়, রণধীরজী। সত্যি একরকমের পোকা। ওদের নাম টাইট্যান বিট্‌ল। টাইট্যানাস জাইগানটিয়াস। এই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের বাসিন্দা ওরা নয়। ওদের বাস দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন নদের ধারের ঘন জঙ্গলে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী, স্যার ?'

'আমি ভাবছি, এই পোকাটা কিছুটা আলাদা। এমন হল কী করে ?'

'কী হল, স্যার ?'

'আসলে ওরা হয় বড়জোর দশ-বারো ইঞ্চির মতো। ওরা এমনিতে বলতে গেলে বেশ নিরীহই। কিন্তু এমন দানবিক আকারের এমন হিংস্র হল কেমন করে পোকাটা ?'

দু-একটা কথা বলে চলে গেলেন রণধীরজী। যাওয়ার আগে শুধু বললেন, 'আমার লোকেরা তো, স্যার, এখানে আর থাকতে চাইছে না। মানুষের সঙ্গে লড়তে পারি। এমনকি বাঘ-ভালুকের মুখোমুখি হয়ে জান কবুল করতে পারি—কিন্তু এক্ষেত্রে কী করি বলুন তো, স্যার ?'

অন্যমনস্কভাবে রজতশুভ্র বললেন, 'সত্যি, আপনাদের করবার কিছু নেই। আজ রাতটা আপনারা আমাদের গেস্ট হাউসে কাটিয়ে দিন। কাল সকালে না হয় চলে যাবেন। আমি ওপরওয়ালাদের বলে দেব।'

রণধীর চলে যাওয়ার পর গম্ভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন রজতশুভ্র।

আরও তিনটে দিন কেটে গেল নিরুপদ্রবে। যদিও গবেষণাগারে দিন-রাত্রিই কাজ চলে, তবু রজতশুভ্রর নির্দেশে এ-ক'দিন শুধুমাত্র দিনের বেলা কাজ চলেছে। রাত্রিতে বিশাল বাড়িটা খাঁ-খাঁ করে। পুবের অংশটুকু ছাড়া। সেখানে রজতশুভ্র আর ওঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কেউ-কেউ থাকেন। বাকিরা বাগানে গেস্ট হাউসে আশ্রয় নিয়েছেন। রণধীর আর তাঁর রক্ষীদলকে জোর করেই ফেরত পাঠিয়েছেন রজতশুভ্র। আরও উচ্চপদস্থ দু-একজন অফিসার এসেছিলেন বটে, কিন্তু অমন একটা পোকার অস্তিত্বের কথা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু এতগুলো লোক একসঙ্গে মিথ্যে বলছে বা পাগল হয়ে গেছে—এটা সম্ভব নয় বলেই ব্যাপারটাকে কোনও অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা বলে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন ওপরমহলে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে জরুরি তদন্তের সরকারি আদেশের কথাও শুনেছেন রজতশুভ্র।

ক'টা দিন আশঙ্কা নিয়ে কাটলেও পোকাটাকে আর দেখা না যাওয়ায় এখানকার লোকেদের মধ্যে ভয়ের ভাবটা কিছুটা কমে গেছে। শুধু রজতশুভ্র জানেন, এখানেই শেষ নয়। যে-কোনও মুহূর্তে আরও ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে—কারণ রবার্ট কিংসলে যদি সত্যি এইসব ঘটনার নেপথ্য-নায়ক হয়,

তাহলে খুব সহজে ছেড়ে দেওয়ার ছেলে সে নয়।

চতুর্থদিন সকালবেলা রজতশুভ্র সবেমাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করে পা বাড়িয়েছেন গবেষণাগারের দিকে, ভয় পাওয়া বিকট চিৎকার ভেসে এল গবেষণাগারের মূল হলঘরের দিক থেকে। ছুটতে-ছুটতে গবেষণাগারের দরজার সামনে গিয়ে রজতশুভ্র দেখলেন, ওঁর দুজন সহকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দরজার সামনে। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেলেন রজতশুভ্র। সেই একই পোকা তৃতীয় একজনকে শুধুমাত্র আক্রমণই করেনি, তার দেহটাকে ধারালো চোয়ালের ফাঁকে চিবোচ্ছে। সম্ভবত ওই লোকটিই প্রথম খুলেছিল দরজাটা, আর অতর্কিত আক্রমণে চিৎকার করবার সুযোগটুকুও পায়নি। পোকাটা লোকটির গলা দু-ভাগ করে দিয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

ঘরের ভেতরে আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় আর কিছু বুঝতে পারলেন না রজতশুভ্র। গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছে আরও অনেকে। কিন্তু সামনে এগোবার মতো সাহস পাচ্ছে না কেউই। নিরুপম চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হবে, স্যার ?'

রজতশুভ্র বললেন, 'বুঝতে পারছি না, নিরুপম। তবে এদের দুজনকে বাঁচাতে হবে।'

দুজনে ধরাধরি করে অজ্ঞান লোকদুটিকে কিছুদূরে টেনে এনে অন্যদের বললেন ওদের বাইরে নিয়ে যেতে।

পোকাটি নির্বিকারভাবে রক্তাক্ত দেহটিকে ছিন্নভিন্ন করছে। সামনাসামনি এ-দৃশ্য সহ্য করা শক্ত।

কিছুক্ষণ পর রজতশুভ্র বুঝতে পারলেন, আরও কিছু ঘটছে গবেষণাগারের ভেতরে। কিন্তু কিসের এত শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে ? সেই অদ্ভুত শব্দের দল রজতশুভ্রর মস্তিষ্কে যেন একটা ঝাঁকুনি দিল। বহুমূল্য যন্ত্রপাতি এবং ওঁর কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফল রাখা আছে পরপর তিনটি হলঘরে। তীব্র চ্যালেঞ্জ আর অদম্য কৌতূহল রজতশুভ্রকে যেন চাবুক মেরে ফিরিয়ে নিয়ে এল বাস্তবে। নিরুপমকে বললেন রজতশুভ্র, 'তোমরা চলে যাও এখান থেকে...যতদূরে সম্ভব...এক্ষুণি।'

'আপনি ?'—বিস্মিত নিরুপম জানতে চাইলেন।

'আমার কথা ভাবার প্রয়োজন নেই, আমি এখানেই থাকব।'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, স্যার ? এ হতে পারে না। ওই দানবের মুখে আপনাকে একা ছেড়ে...'

জলদগম্ভীর গলায় আদেশের সুরে রজতশুভ্র বললেন, 'সময় নেই। এক্ষুণি তোমরা চলে যাও এখান থেকে। আমি মারা গেলেও তুমি অন্তত গবেষণা শেষ করতে পারবে। কিন্তু যেভাবে হোক, ল্যাবরেটরিটা বাঁচাতেই হবে।'

রজতশুভ্রর কথা অমান্য করবার সাহস হল না কারও। কাজেই একে-একে সকলেই চলে গেল। রজতশুভ্রও দাঁড়ালেন না ওখানে। পাশের সরু করিডর পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন দ্বিতীয় হলঘরের দরজার সামনে। ওই দানবকে কীভাবে মোকাবিলা করবেন, কেমন করে নিধন করবেন, তা জানেন না রজতশুভ্র। শুধু মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটে ক্রমাগত বলছে কিছু একটা করতেই হবে।

শান্তভাবে ধীরে-ধীরে দরজাটা খুললেন রজতশুভ্র। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তিনি। এক-পা এক-পা করে সাবধানে এসে দাঁড়ালেন ঘরের মধ্যে।

ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ টিপে ধরলেন রজতশুভ্র। হঠাৎ একরাশ উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে অন্ধকার লাফিয়ে পালিয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ইংরেজিতে বলে উঠল, 'স্বাগতম, মিঃ রে। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

চমকে উঠলেন রজতশুভ্র। রবার্ট কিংসলের কণ্ঠস্বর। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন, লম্বা ডেস্কের অপরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট। প্রচণ্ড ক্রোধের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে রজতশুভ্র বললেন, 'আমিও তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। বলো ভারতের জলহাওয়া কেমন লাগছে?'

হা-হা করে হাসল রবার্ট। বলল, 'দারুণ। কিন্তু তার থেকেও ভাল লাগছে আপনার সাজানো ল্যাবরেটরি। বাজে কথা বলবার মতো সময় কিন্তু আমার হাতে নেই। আপনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলেই আমি চলে যাব। আপনার নতুন চুল্লির পারমাণবিক অবশেষ কোথায় রেখেছেন? সারা ল্যাবরেটরি আমি তন্নতন্ন করে দেখেছি, কিন্তু কোথাও পেলাম না।'

একটু ব্যঙ্গের সুরে রজতশুভ্র বললেন, 'সে কী? ওই সামান্য ছাইটুকু খুঁজে পেলে না? কিন্তু ও আবর্জনা কোন কাজে লাগবে তোমার?'

আবারও হেসে উঠল রবার্ট।

'আবর্জনা কাজে লাগবে না, লাগবে ওর ভেতরের "আর. এস. আর. থ্রিটুয়েন্টিফাইভ" নামের আইসোটোপ, যা দিয়ে সারা পৃথিবী ধ্বংস করবার মতো পারমাণবিক বিস্ফোরক তৈরি করতে পারব আমি।'

ভীষণরকম বিস্মিত হলেন রজতশুভ্র। বললেন, 'আর. এস. আর.-এর কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

ক্রূর মুখে রবার্ট বলল, 'বলছি। কিন্তু কোনওরকম বেয়াদবি করবার চেষ্টা করবেন না। সে-চেষ্টা করলে আপনার অবধারিত মৃত্যু। আপনার পিছনে আমার প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে রজতশুভ্র দেখলেন, একটি অতিকায় টাইট্যান বিট্‌ল কখন যেন কোথা দিয়ে তাঁর পিছনে এসেছে, উনি জানতে পারেননি। উজ্জ্বল কালো দুটো

গোল চোখ মেলে সে যেন তাঁকেই দেখছে।

রবার্ট বলল, 'মনে পড়ে, একদিন আমার গবেষণায় আমি আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম। আপনি সাহায্য না করলেও আজ আমি সফল। ওই পোকাগুলোকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই। টাইট্যানাস জাইগানটিয়াস। ওদের পরিবর্তিত করেছি আমি। ওরা অজেয়। সবচেয়ে বড় কথা, ভাল জাতের কুকুরের থেকেও ওদের মস্তিষ্ক এখন উন্নত। ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। আমার নির্দেশ পালন করে। আশা করছি আরও কিছুদিনের মধ্যে আরও উন্নত অমন এক কীট সৈন্যবাহিনী তৈরি করতে পারব আমি, যাদের ধ্বংস করবার ক্ষমতা এ-পৃথিবীতে কারও থাকবে না। আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সে-ক্ষোভটুকু ভুলতে পারিনি আমি। তাই আমার স্মৃতি হিসেবে কিছু চিহ্ন রেখে গেলাম। আপনার ল্যাবরেটরির প্রায় সবটাই তছনছ করে দিয়েছে আমার প্রিয় টাইট্যানেরা।

'সবচেয়ে মজার কথা কী জানেন ? ওরা তেজস্ক্রিয় ভস্ম খেতে ভালবাসে এবং সেটা খেয়ে অবিকৃতভাবে বহন করতে পারে ওদের শরীরে। সেজন্যেও আমি ওদের সঙ্গে এনেছিলাম। আর. এস. আর. বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

'আর একটা কথা। আর. এস. আর. থ্রিটুয়েন্টিফাইভের খবর আমাকে দিয়েছে আপনারই সহকারী নিরুপম বোস—অবশ্যই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে।'

'সে কী ! নিরুপম...'

'হ্যাঁ, মিঃ রে। টাকার লোভ আপনার না থাকলেও ওদের আছে। অবশ্য আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আমি তার জন্যে ব্যবস্থা করি। নিরুপম বোস এইমাত্র ইহলোক ত্যাগ করেছে। ওই যে দেখছেন আরেকটি টাইট্যান, ও শেষ করে এসেছে তাকে।'

সত্যি-সত্যি একটি কদাকার টাইট্যান প্রথম হলঘরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। তার মুখে নিরুপমের পোশাকের ছেঁড়া টুকরো।

রাগ, দুঃখ এবং ঘৃণা মিলেমিশে অস্থির করে তুলছে রজতশুভ্রকে। যদিও পিছনে এক মূর্তিমান মৃত্যুকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে শয়তান রবার্ট, তবু এখন আর একটুও ভয় করছে না তাঁর।

রবার্ট অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'কিন্তু আর নয়, মিঃ রে। আমার সময় সত্যি কম। আপনি বলুন। পারমাণবিক ভস্ম কোথায় রেখেছেন ? আপনি না বললে আমাকে একটু কষ্ট করে খুঁজতে হবে। এবং আর. এস. আর. না পেলে যাওয়ার আগে আমি এই জায়গাটা ধ্বংস করে দিয়ে যাব।'

দ্রুত চিন্তা করছেন রজতশুভ্র। বললেন, 'সে-ভস্ম রাখা আছে ঠিক এই ঘরের তলায় মাটির নীচের একটি ঘরে। বুঝতেই পারছ, তেজস্ক্রিয়তা নিবারণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে সেখানে এবং—' একটু থেমে রজতশুভ্র বললেন, 'আমি ছাড়া সেখানে কেউ যেতে পারবে না।'

হা-হা করে হাসল রবার্ট : 'আমার অগম্য কোনও জায়গা নেই, যতক্ষণ আমার সঙ্গে আমার প্রিয় টাইট্যানেরা আছে। বিশেষত আপনার এখানকার বাড়ি তৈরির মালমশলা খুবই পলকা। সেটা আমি প্রথমদিনেই পরখ করে নিয়েছি। তবু আপনি আমাদের নিয়ে গেলেই আমি খুশি হব। আমার সঙ্গে পাঁচটি বিট্‌ল আছে। ওরা যতটুকু ভস্ম খেতে পারবে, সেটুকুতেই আমি আপাতত কাজ চালিয়ে নেব। আপনি চলুন।'

খুব নির্বিকারভাবে রজতশুভ্র এগিয়ে চললেন সামনে। একটি বিশেষ কন্ট্রোল বোর্ডের দুটি সুইচ অন করার পর মেঝের খানিকটা অংশ সরে গিয়ে একটি সিঁড়ি দেখা গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামলেন রজতশুভ্র। পিছনে-পিছনে রবার্ট কিংসলে আর তার ইঙ্গিতে পাঁচটি বীভৎস টাইট্যান।

সিঁড়িটি শেষ হয়েছে একটি প্রশস্ত জায়গায়। সেখানে বিশেষ ধরনের ধাতব কাচের তৈরি একটি বড় ঘর। তার মধ্যে বিশেষভাবে তৈরি সীসের আধারে ভরা পারমাণবিক ভস্ম রাখা আছে।

দরজাটা রজতশুভ্র খুলে দিতেই রবার্টের ইঙ্গিতে একটি-একটি করে বিট্‌ল ঢুকে গেল ভেতরে। অবলীলায় সীসের আধার ফুটো করে তারা সেই ধাতব-অবশেষ গলাধঃকরণ করতে লাগল নেশাচ্ছন্নের মতো। রবার্ট দাঁড়িয়ে আছে দরজার ঠিক সামনে। রজতশুভ্র দেখলেন, একটি বিশেষ পোশাক রবার্ট পরে আছে। নিশ্চয় তেজস্ক্রিয়তা-নিরোধক। তেজস্ক্রিয়তা-নিরোধক পোশাক অবশ্য রজতশুভ্রও পরে আছেন। কাজের সুবিধার জন্য উনি এই পোশাক প্রায় সবসময়েই পরে থাকেন। শুধু বাড়িতে থাকার সময়টুকু ছাড়া।

অতর্কিতে রবার্টকে এক ধাক্কা দিলেন রজতশুভ্র। রবার্ট ছিটকে গিয়ে পড়ল কাচের ঘরের মধ্যে। দ্রুত পাশের সুইচটা টিপে ধরতেই দরজাটা সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় আছে রজতশুভ্রর হাতে। রবার্টের ইঙ্গিতে পোকাগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই দেওয়াল ফুটো করে বেরিয়ে আসতে পারে। তার আগেই যা করবার করতে হবে।

প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে ওপরের হলঘরে এলেন রজতশুভ্র। কন্ট্রোল বোর্ডের একটা সুইচ চালু করতেই সামনের ক্লোজ্‌ড সার্কিট টেলিভিশন স্ক্রিনে পরিষ্কার ফুটে উঠল নীচের স্টোররুমের ছবি। রজতশুভ্র দেখলেন রবার্ট উঠে দাঁড়িয়েছে এবং পোষা পোকাগুলোকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে।

রজতশুভ্র উত্তেজনায় ঘামছেন। দ্রুত হাতে আর-একটি সুইচ টিপে ধরলেন তিনি। পাশের একটি ডায়ালের কাঁটা নড়ে উঠে এগোতে লাগল একটি লাল বিন্দুর দিকে। খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে রজতশুভ্র লক্ষ করছেন কী ঘটছে স্টোররুমে।

অস্থির হয়ে উঠেছে রবার্ট। ঘরের তাপমাত্রা বাড়ছে। বাড়ছে খুব দ্রুত। রবার্ট ছটফট করতে-করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। পোকাগুলোকে বারবার আদেশ করছে কিছু করতে। কিন্তু আশ্চর্য, পোকাগুলো রবার্টের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য

করে শোষণ করে চলেছে তেজস্ক্রিয় ভস্ম, মদ্যপের মতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রবার্ট সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে পড়ল ঘরের এককোণে। পাগলের মতো কাচের ঘরের তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে চলেছেন রজতশুভ্র। ঘরের চারদিকে যেন লালচে আভা ফুটে বেরোচ্ছে।

এইবার পোকাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠছে। শুঁড় নেড়ে আবহাওয়ার বিপদ সঙ্কেত বোঝবার চেষ্টা করছে। কোনওটা ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরের চারদিকে। একটা পোকা চেষ্টা করছে ধাতব কাচের দেওয়াল ফুটো করবার। সীচের আধারগুলো গলে গেছে অনেক আগেই। তরল সীসের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরময়। পোকাগুলো ওপরে ছাদের দিকে উঠে আসতে চেষ্টা করছে। পারছে না, পড়ে যাচ্ছে নীচে, ফুটন্ত ধাতুর মধ্যে। সারা শরীরটা কুঁকড়ে প্রচণ্ড শক্তিতে সবক'টা পা নাড়তে-নাড়তে আবার উঠে আসতে চাইছে। একটা পোকা পাগলের মতো উড়ে-উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরময়। দেওয়ালে-দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে ক্রমাগত। তরল ধাতুর তলায় রবার্টের দেহ হারিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তার আর বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা নেই—কোনও মানুষের পক্ষেই ওই উত্তাপে গলিত ধাতুর মধ্যে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। রজতশুভ্রর মনে হচ্ছে প্রচণ্ড উত্তাপে সারা ঘর জুড়ে লালচে আভা বেরোচ্ছে। সে-আঁচ ওপরে বসে-বসেও রজতশুভ্র যেন অনুভব করছেন। উনি নিজেই বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবেন এক্ষুণি। পোকাগুলো এখনও বাঁচবার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

এমনই তোলপাড় চলল আরও কিছুক্ষণ। তারপরই হঠাৎ একসঙ্গে সবক'টি পোকা ডানাগুলো ছড়িয়ে দিল। ওদের শক্তি বুঝি শেষ হয়ে গেছে। রজতশুভ্র দেখছেন, কুয়াশার মতো এক বাষ্পের মেঘ ক্রমাগত উঠে আসছে ঘরের নীচ থেকে ওপরে। প্রচণ্ড উত্তাপে তরল সীসে, তেজস্ক্রিয় ভস্মের নানা উপাদান, আর. এস. আর.-এর মধ্যে কী বিক্রিয়া ঘটছে তা ভাবার মতো অবকাশ এখন নেই রজতশুভ্রর। ফুটন্ত ধাতুর মধ্যে পাঁচটি অতিকায় দানব ধাতব বাষ্পের স্তর পেরিয়ে গিয়ে পড়ল, তারপর হঠাৎ একেবারেই স্থির হয়ে গেল ওরা।

এরপরেও কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রজতশুভ্র। এখন টেলিভিশন স্ক্রিনে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝাপসা ধাতব কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সবকিছু। তাপ পরিমাপের কাঁটা সাড়ে তিন হাজার ডিগ্রি-সেলসিয়াসের ঘর ছুঁয়েছে। যখন রজতশুভ্রর মনে হল ওই ঘরে আর একটিও জীবিত প্রাণী নেই, তিনি জয়ী হয়েছেন,— কেমন এক ধরনের ক্লান্তি আর শৈথিল্যে তাঁর শরীর অবশ হয়ে এল। নিয়ন্ত্রণহীন শরীরটা তিনি এলিয়ে দিলেন চেয়ারে।

ঠিক এই সময়েই অপার্থিব, অস্বাভাবিক এক কণ্ঠস্বর বলল, 'চমৎকার, মিঃ রে, চমৎকার। আপনার সক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

ভীষণভাবে চমকে উঠে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন রজতশুভ্র। মুহূর্তের মধ্যে

ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেল। রবার্ট কিংসলে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক দু-হাত দূরে —তার হাতের অতি উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র রজতশুভ্রর দিকেই তাক করা!

রবার্ট হিংস্রভাবে বলল, 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপনি ভেবেছিলেন রবার্ট কিংসলেকে বন্ধ কাচের ঘরে জীবন্ত সমাধি দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানতাম আপনি সহজে ছেড়ে দেবেন না আমাকে। যাকে আপনি স্টোররুমে কবর দিয়েছেন, সে একটা রোবট—মেটাল ফাইবার দিয়ে তৈরি, আমার নকল। তবে হ্যাঁ, টাইট্যানগুলোকে আপনি ধ্বংস করতে পেরেছেন। তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই। ওদের মৃতদেহগুলো নিয়ে গেলেই আপাতত আমার কাজ চলবে। ওই থেকেই আমি আমার প্রয়োজনীয় আর. এস. আর. পেয়ে যাব। কিন্তু তার আগে—' ক্রূর হাসল রবার্ট : 'সাড়ে তিন হাজার সেলসিয়াসে, ধাতব বাষ্পের মধ্যে সেদ্ধ হতে কেমন লাগে, আপনার জানা দরকার, মিঃ রে। ঠিক যেমন আছেন সেভাবেই চলুন নীচে।'

অসহায় রজতশুভ্র কথা বলতে পারছেন না। সমস্ত চেতনা যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পুতুলের মতো দু-হাত মাথার ওপর তুলে ধীরে-ধীরে নীচে নামার সিঁড়ির দরজা খোলার কন্ট্রোল বোর্ডের সামনে দাঁড়ালেন রজতশুভ্র। পিছনে নিষ্ঠুর শিকারীর মতো রবার্ট। রজতশুভ্র বুঝলেন, এত চেষ্টা করেও বাঁচবার কোনও আশাই নেই। মরতে যখন হবেই তখন রবার্টকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করবেন তিনি। দরজা খোলার সুইচ অন করার সঙ্গে-সঙ্গে রবার্টের অলক্ষ্যে নীচের দিকের একটি ছোট্ট লাল বোতাম টিপে দিলেন রজতশুভ্র। বিশেষ বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যই ওই বোতামটি আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল।

মেঝের ধাতব ঢাকনা খুলে গেল। তীব্র তাপের হলকা উঠে এল সিঁড়ির মুখে। রবার্টের তীক্ষ্ণ গলা শুনলেন রজতশুভ্র : 'নেমে যান নীচে।'

এক-পা এক-পা করে নামতে লাগলেন রজতশুভ্র। চেতনা অবশ হয়ে আসছে। বিশেষ পোশাক পরে থাকা সত্ত্বেও এ-তাপ সহ্য করা শক্ত। রজতশুভ্র বুঝতে পারছেন রবার্ট ফিরে গেল কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে। মাথার ওপরের দরজাটা বন্ধ করে দেবে সে। চোখের সামনে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না রজতশুভ্র। হাতড়াতে-হাতড়াতে নেমে যাচ্ছেন নীচের দিকে...প্রচণ্ড তাপের ঝলকানির দিকে।

রবার্ট কিংসলের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রজতশুভ্র। দীর্ঘ চার মাস বিশেষ যত্নে হাসপাতালে কাটাবার পর মাত্র কিছুদিন হল তাঁর গবেষণাগারে আবার ফিরে এসেছেন তিনি। যে-বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল তার কিছুটা পূরণ করেছেন সরকার। মেরামতির কাজ এখনও চলছে।

সেদিন কয়েক ধাপ নামার সঙ্গে-সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন রজতশুভ্র। রবার্ট ফিরে গিয়েছিল মেঝের দরজাটা বন্ধ করার জন্য। এবং কন্ট্রোল বোর্ডটি ছোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় ভস্মীভূত হয়েছিল রবার্ট কিংসলে। সারা বোর্ডটি জুড়ে সুতীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। চরম ব্যবস্থা হিসেবে ওইজন্যই লাল বোতামটি টিপে দিয়েছিলেন রজতশুভ্র। উনি জানতেন নীচে নামার দরজা বন্ধ করতে রবার্ট ওই বোর্ডে হাত দেবেই।

নীচে নামার দরজা আর বন্ধ হয়নি। সহকর্মীরা এসে উদ্ধার করে রজতশুভ্রকে।

তাঁরই নির্দেশে পোড়া কাঠকয়লার মতো রবার্টের মৃতদেহের অবশেষটুকু সমাধিস্থ করা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গার পাশে, যেখানে লছমনের মৃতদেহ পড়ে ছিল। সমাধির ওপর টাইট্যান বিট্‌লের একটি বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি রাখা হয়েছে।

সমাধি আর মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে রজতশুভ্র আপনমনেই বললেন, 'রবার্ট, তোমার প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করি। শুধু তুমি যদি মানব-কল্যাণের জন্যে তোমার গবেষণাকে কাজে লাগাতে!'

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

‘আ—’ মানে

শুভমানস ঘোষ



ভদ্রলোক বললেন, ‘গাছের কথা শোনানোর যে-যন্ত্রটা আপনি আবিষ্কার করেছেন সেটা একবার দেখব।’

সেটা অবশ্য আগেই আন্দাজ করেছিলেন জ্যোতির্ময়। একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। এই সাতদিনে কতরকমের লোকজন যে তাঁর বাড়িতে এসেছে হিসেব নেই। তাঁর প্ল্যান্টোভোকামিটারকে একবার চোখে দেখার নাম করে এসে শুধু বকিয়ে মারতে বাকি রেখেছে জ্যোতির্ময়কে। গত বুধবার তাঁর যন্ত্রের প্রেস ডেমনস্ট্রেশান দেওয়ার পর থেকেই উৎপাত শুরু। পরের পর ফোন। মাঝরাতেও রেহাই নেই! খোদ বি.বি.সি. থেকে একদল সাংবাদিক এসে হাজির তাঁর বাড়িতে। তাদের ডেমনস্ট্রেশান দিতে হল ফের। সেইসঙ্গে রকমারি প্রশ্নের জবাব। গাছের ভাষা শোনানোর যন্ত্রটা তাদের যে দারুণ অবাক করেছে, বুঝতে বাকি ছিল না। বিশেষ করে তাদের আশ্চর্য করেছিল সাধারণ একটা ফোর্থ জেনারেশান মাইক্রো-কম্পিউটারের সাহায্যে কী করে উদ্ভিদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতি-স্পন্দনকে সরাসরি ধ্বনিরূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

‘চিনতে পারছ না আমায়?’

‘আপনি’ থেকে একেবারে ‘তুমি’! চমকে উঠলেন জ্যোতির্ময়। ভদ্রলোককে ভাল করে দেখার জন্য মুখ তুলেই দেখলেন একগাল হাসি। বড় বিচিত্র এই হাসি জিনিসটা। তক্ষুণি মনে পড়ে গেল জ্যোতির্ময়ের, এ তো নীলেশ। নীলেশ কী যেন? ইউনিভার্সিটিতে তাঁরই ব্যাচ ছিল। তবে কাছের বন্ধু বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমন ছিল না। তবু পুরনো সহপাঠী যখন, তখন একটু আলাদা রকম ব্যবহার ও পেতেই পারে।

‘এসো, এসো’ বলে জ্যোতির্ময় খাতির করে বসালেন তাঁকে। জ্যোতির্ময় লক্ষ করছিলেন, এত বছর পরেও খুব একটা পালটায়নি নীলেশের চেহারা। সেইরকম রোগা-রোগা গড়ন। একমাথা চুল। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ। পাক ধরে গেলেও দাড়ি রাখার অভ্যাসটা যায়নি। সেইসঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি।

'চিনতে পেরেছ তা হলে !'

'তুমি আমার ঠিকানা পেলে কী করে ?'

সোফায় বসে বুকপকেট হাতড়াচ্ছিলেন নীলেশ। বেরিয়ে এল সিগারেটের প্যাকেট। সেইসঙ্গে প্রবল হাসি। বললেন, 'দ্যাট মাস্ট আ জোক। তুমি তো এখন ফেমাস লোক হে।' বলে প্যাকেটের মুখ খুলে বাড়িয়ে দিলেন জ্যোতির্ময়ের দিকে, 'উড ইউ প্লিজ ট্রাই আ সিগ্রেট ?'

ইম্পোর্টেড ব্র্যান্ড। আড়চোখে তাকিয়ে 'নো থ্যাঙ্কস্' বলে মাথা নাড়িয়ে দিলেন জ্যোতির্ময়। ধূমপানের অভ্যাস নেই ওঁর।

লাইটারটাও দামি। ফ্ল্যাশ করার সঙ্গে-সঙ্গে বিলিতি সুর বেজে উঠল। কিন্তু তার সঙ্গে তামাকের কটু গন্ধ এতটাই মাত্রাছাড়া যে, নড়েচড়ে উঠলেন জ্যোতির্ময়। তৎক্ষণাৎ ধোঁয়ার ওপর হাত চালিয়ে বলে উঠলেন নীলেশ, 'আসলে তোমার ইনভেনশানটা আমাকে ভীষণভাবে মুভ করেছে। এটা…'

'ইনভেনশান নয়, ডেভালাপমেন্ট।' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন জ্যোতির্ময়।

'ইয়েস ডেভালাপমেন্ট ! বাট ইটস আ ওয়ান্ডারফুল অ্যাচিভমেন্ট !' এতটুকু অস্বস্তির ছাপ নেই নীলেশের কণ্ঠস্বরে। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলে যাচ্ছিলেন : 'আমার ইচ্ছা আমার ইউনিভার্সিটিতে তোমার একটা লেকচার অর্গানাইজ করার। উইথ ডেমনস্ট্রেশান অফ ইয়োর এক্সাইটিং প্ল্যান্টোভোকামিটার !'

ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল জ্যোতির্ময়ের। চশমা খুলে অন্যমনস্কভাবে কাচ মুছতে-মুছতে ছুঁড়ে দিলেন প্রশ্ন, 'তোমার ইউনিভার্সিটি ?'

'কেন, জানো না ? আমি তো এখন স্টেট্সে আছি। রেগুলার গ্রিন কার্ড হোল্ডার। সেখানকার বার্কলে ইউনিভার্সিটির বায়োফিজিক্সের লেকচারার। দিন পনেরোর জন্যে ইন্ডিয়ায় এসেছিলাম। লাকিলি এই সময়েই তোমার ব্যাপারটা পেপারে ফ্ল্যাশ হল।'

'রিয়েলি !'

অবাক হয়ে গেলেন জ্যোতির্ময়। এত বড় খবর একটা, তাঁর জানাই ছিল না !

মুহূর্তে জ্যোতির্ময়ের চেহারা বদলে গেল। অবশেষে তাঁর যন্ত্র একজন যোগ্য পরীক্ষক পেতে চলেছে ! সেইসঙ্গে এ-ও প্রমাণ হয়ে যাবে, দীর্ঘ বিশ বছর ধরে অধ্যাপনার ফাঁকে-ফাঁকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে স্বহস্তে যে-যন্ত্র তিনি গড়ে তুলেছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু !

ল্যাবের এককোণে রাখা ছিল যন্ত্রটা। দেখতে আর-পাঁচটা সাধারণ কম্পিউটারের মতোই। তফাতের মধ্যে কম্পিউটারের সি.পি.ইউ. জোন থেকে একজোড়া ইনপুট লাইন বেরিয়ে এসেছে। খানিক তফাতে টবের ওপর রাখা আছে একটা গোলাপ গাছ। ডালপালা নিয়ে ফুট দুয়েক উঁচু বড়জোর। ইনপুট লাইনের একটা ছুঁয়ে আছে তার একটি পাতাকে। অন্যটা টবের মাটির ভেতরে

ঢুকিয়ে দেওয়া।

জ্যোতির্ময় বলছিলেন, 'বিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল আমার এই যন্ত্র। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ মূলত কম্পিউটার টেকনোলজির সঙ্গে সাবেককালের সিম্পল মেশিনারির নো-হাউ মিলিয়ে এই যন্ত্রটা ডেভোলাপ করেছি। এতে গাছের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াকে হিউম্যান নোটসে ট্র্যান্সফর্ম করা হয়েছে।'

'হিউম্যান নোটস ? ক্লিয়ার করে বলো,' কৌতূহলের তাপে ঝকমক করছিল নীলেশের মুখখানা।

জ্যোতির্ময় বললেন, 'মিউজিক অফ হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজেস। যাকে আমরা ইন্টারজেকশান বলি। ভাববাচক অব্যয়। উঃ, আঃ, ইস, ছিঃ—এইসব এক্সক্ল্যামেটরি সাউন্ড। এগুলো তো প্রতিক্রিয়া প্রকাশের মাধ্যম। এক-একটা ধ্বনিতে এক-একরকম প্রতিক্রিয়া বোঝায়।' বলে দম নিয়ে জ্যোতির্ময় শুরু করলেন ফের, 'কোনও-কোনও ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন আদিমকালে মানুষের ভাষায় এখনকার মতো পূর্ণ শব্দ ছিল না। তখন মানুষ এই জাতীয় ধ্বনিময় ভাষাতেই কথা বলত। এখনকার ইন্টারজেকশানগুলোতে তার কিছু নমুনা এখনও রয়ে গেছে। এগুলোকেই আমি হিউম্যান নোটস নাম দিয়েছি। আমার যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এইরকম এক-একটা নোটসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে।'

থামলেন জ্যোতির্ময়। নীলেশের প্রশ্নসঙ্কুল চোখের দিকে এক ঝলক নজর ছুঁয়ে 'দ্যাখো' বলে এগিয়ে গিয়ে যন্ত্রটি চালানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার স্ক্রিনে ফুটে উঠল পরস্পর সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি লেখচিত্রের পঙ্‌ক্তি।

চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেছেন জ্যোতির্ময়। স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছেন কিছু। এইরকম কিছুক্ষণ। তারপর 'অলরাইট' বলে যন্ত্রের কি-বোর্ডের একটা বোতাম টিপে এগিয়ে গেলেন গাছটার কাছে।

অদ্ভুত কাণ্ড ! জ্যোতির্ময় তাঁর মুখখানা পাতার মধ্যে ডুবিয়ে আদর করতে শুরু করেছেন গোলাপ গাছকে। যেন কোনও বাচ্চাকে আদর করছেন।

নীলেশ হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যন্ত্রের স্পিকারটা কড়কড় করে উঠতেই স্ক্রিনের দিকে চোখ চলে গেল ওঁর। লেখচিত্রের গঠন পালটে গেছে। দীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ত্রিকোণগুলো। শীর্ষকোণযুক্ত ত্রিভুজ একটার পর একটা। শুধু তাই ? নীলেশ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ! যন্ত্রের স্পিকার থেকে মৃদুভাবে বেরিয়ে আসছে একটা টানা ধ্বনি : 'আ !'

টুলের ওপর বসে ছিলেন নীলেশ। প্রবল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সটান। চোখ দুটো তাঁর গোল হয়ে গেছে একদম। কিন্তু ততক্ষণে জ্যোতির্ময় আর একটা কাণ্ড করে বসেছেন।

'এইবার দ্যাখো গাছের কষ্ট,' বলে আদরের বদলে গাছের একটা পাতা মোচড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। এবার আর কান খাড়া করার দরকার হল না নীলেশের। তাঁকে চমকে দিয়ে বেজায় শব্দ করে স্পিকার থেকে বেরিয়ে এল



অদ্ভুত কাণ্ড ! জ্যোতির্ময় তাঁর মুখখানা পাতার মধ্যে ডুবিয়ে আদর করতে শুরু করেছেন গোলাপ গাছকে । যেন কোনও বাচ্চাকে আদর করছেন ।

একটা প্রবল শ্বাসাঘাত : 'উঃ !'

স্ক্রিনে তখন লেখচিত্রের চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। এতক্ষণ রেখাগুলো ছিল নিয়মিত বিরতিযুক্ত ও আকৃতিতে সুনির্দিষ্ট। এখন একটার সঙ্গে আর একটার কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা রেখা এত দীর্ঘ হয়ে গেছে যে, তার চূড়ান্ত-বিন্দু স্ক্রিনের প্রান্ত ছুঁয়ে ফেলেছে। সেটা লক্ষ করে সহসা উত্তেজিত গলায় নীলেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ক্রেসকোগ্রাফ ! ক্রেসকোগ্রাফ ! জে সি বোস !'

ঘুরে দাঁড়ালেন জ্যোতির্ময়। চশমাটা তুলে নিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, 'ব্রাইট ইউ আর ! ক্রেসকোগ্রাফ। টু সে ফ্র্যাঙ্কলি, এটা জগদীশ বোস উদ্ভাবিত যন্ত্রের কিছুটা পরিবর্ধিত সংস্করণ। বাট মোর মডার্ন অ্যান্ড ডেলিকেট টু সাম এক্সটেন্ট। উনি গাছের ভাষার ছবি এঁকেছিলেন। আমি সেটারই ধ্বনি-রূপ দিয়েছি।'

'বাট হাউ ?' সাঙ্ঘাতিক উত্তেজিত লাগছিল নীলেশকে। অবিশ্বাসের একটা কালো ছায়াও ছিল তাঁর চোখে।

এবার শব্দ করে হাসলেন জ্যোতির্ময়। চশমাটা চোখের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'দ্যাট ইজ মাই সিক্রেট : বিশ বছর ধরে মাথা খাটিয়েছি এর পিছনে। সব বলব না। স্লাইট হিন্টস্ দিচ্ছি। ভি ইজকল্টু এন ইন্টু ল্যামডা। লেখচিত্রের এক-একটা পয়েন্টে কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে তার এক-একটা সম্ভাব্য সাউন্ড প্রোডাক্ট তৈরি করেছি। এক্ষেত্রে ট্রিগোনমেট্রির ফরমুলার সঙ্গে রেশিও প্রোপোরশানের তত্ত্ব কাজে লাগাতে হয়েছে খুব বেশি করে। তা ছাড়া ভাষা-বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি সম্পর্কেও প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে। মোট পঁচিশটা ধ্বনিকে "বেস" করে বিভিন্ন তরঙ্গবেগ অনুসারে তারও আবার নানারকম পারমুটেশান কম্বিনেশান করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে ইটস আ হারকিউলিয়ান টাস্ক।'

দ্রুত বদলে যাচ্ছিল নীলেশের চেহারা। ঝকঝক করছে চোখজোড়া তাঁর। সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'দ্যাট ইজ ইম্‌পসিব্‌ল। গাছের ভাষা ! ইটস টু ফার ! মানসিক উপাদান ছাড়া কোনও প্রাণীর পক্ষে ভাষা ইনভেন্ট করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু নীলেশ, তুমি ভুল করছ। আমি ভাষা টার্মটা ব্যবহার করেছি বোঝানোর সুবিধের জন্যে। আসলে এটা সেনস্যুয়াস রিঅ্যাকশান। আহত পশু একভাবে যন্ত্রণা প্রকাশ করে, কিন্তু মানুষ "উঃ ! গেলুম ! বাবা গো" বলে। দুটোই রিফ্লেক্স, যা মানসিক উপাদানের অপেক্ষা করে না।' এই বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড় মুছতে-মুছতে শুধোলেন, 'বলো, আর কিছু জানার আছে ?'

'সার্টেনলি !' চেঁচিয়ে উঠলেন নীলেশ, 'তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও, তোমার ওই রিফ্লেক্স রেসপন্সের ধ্বনি বাংলা হবে কেন ? তোমার গাছ বাঙালি নাকি

হে ?’

হা-হা করে হেসে উঠলেন জ্যোতির্ময়। বললেন, ‘কথাটা বোকার মতো হয়ে গেল, নীলেশ। আসলে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ আছে। শুধু শরীর কেন, ইন ফ্যাক্ট, এক জাতির মানুষের সঙ্গে অন্য জাতির আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক প্রবণতা, এমনকি ভাষার দিক থেকেও এক-এক শ্রেণীর মানুষ এক-এক ধরনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। আমার প্ল্যান্টোভোকামিটারে আমি ভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির নিজস্ব অভিপ্রকাশ-রীতিকে কাজে লাগিয়েছি। ইচ্ছা করলে এটাকে ইংরেজি বা অন্য যে-কোনও ভাষার নিজস্ব ধ্বনি প্রক্ষেপণ রীতি অনুসারে প্রোগ্রাম করা যায়।’

তবু ভুরু গুটিয়ে আছে নীলেশের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন বুদ্ধিজীবীর তফাত এখানেই। তারা সবদিক জেনে-বুঝে নিতে চায়। যতক্ষণ না তারা শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হবে ততক্ষণ প্রশ্ন করে যাবে।

ওঁকে প্রশ্ন করার সময় করে দিতেই জ্যোতির্ময় এবার চলে গেলেন একটু অন্য প্রসঙ্গে। জানিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁর এই যন্ত্র উদ্ভাবনের মূলে এক অতি প্রাসঙ্গিক ও গুরুতর কারণ হল বৃক্ষ নিধন। ‘এ সমস্যা আগেও ছিল, কিন্তু ইদানীং এটা যেন বিষাক্ত ক্ষতের মতো হয়ে উঠেছে। কিছুকাল যাবৎ লক্ষ করা যাচ্ছে, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মুনাফার জন্যে সবুজ হত্যার নোংরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই নিয়ে কাগজেও খুব লেখালিখি হচ্ছে। কিন্তু তাতেও টনক নড়ছে না ব্যবসায়ীদের। শোনা যাচ্ছে, সুন্দরবনের ওপরও নজর পড়েছে তাদের। খুব শিগ্‌গির সেখানে বিস্তীর্ণ জঙ্গল সাফ করে ফরেন কোলাবরেশানে একটা মদের কারখানা গড়া হবে। এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁর প্ল্যান্টোভোকামিটারকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে চান জ্যোতির্ময়। শুকনো লেকচার বা আবেদন-নিবেদনের চেয়ে এটি মানুষের সেন্টিমেন্টকে অনেক বেশি হার্ট করতে পারবে বলে তাঁর বিশ্বাস। তা ছাড়া—’

আরও কিছু বলার ছিল জ্যোতির্ময়ের। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন নীলেশ, ‘দ্যাট ইজ ননসেন্স। ইউ আর এ সায়েন্টিস্ট, জ্যোতির্ময়। কেন এসব পলিটিক্যাল ব্যাপারে নিজেকে জড়াচ্ছ ? জেনেশুনে নিজের কেরিয়ার ডুম করতে চাও ?’

এরপরেই পরিস্থিতি বদলে গেল কেমন। নীলেশের কথা পছন্দ হয়নি জ্যোতির্ময়ের। চোয়াল শক্ত করে সপাটে জবাব দিলেন, ‘নিজের কেরিয়ারের চেয়ে মানুষ-জাতির সুস্থভাবে বাঁচার অধিকারকে আমি বেশি মূল্য দিই, নীলেশ। আমার বিশ্বাস, যে-কোনও সৎ বিজ্ঞানীই আমার সঙ্গে একমত হবেন।’

নীলেশ তাকিয়ে আছেন জ্যোতির্ময়ের দিকে। ক্ষোভ আর অসন্তোষের একটা রেখা ক্রমেই গভীরতর হয়ে উঠছিল ওর মুখেচোখে। মাথাটা জোরে-জোরে দুপাশে নাড়িয়ে বলে উঠলেন, ‘হোয়াট আ ফুল ইউ আর !

দু-দশটা গাছ কাটা পড়লে কিছুই আসে-যায় না। প্রকৃতির নিজের "হিলিং পাওয়ার" অনেক বেশি শক্তিশালী। এটা খুবই হাস্যকর ধারণা যে, তোমাদের ওই সুন্দরবনের ওপর গোটা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করে আছে।'

জ্যোতির্ময় হতবাক হয়ে গেলেন। চোখ বড়-বড় করে দেখছিলেন নীলেশকে। তাতে উৎসাহ পেয়ে নীলেশ গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন ফের, 'বুঝলে, বিজনেসম্যানরা যে ভেঞ্চারটা হাতে নিয়েছে তাতে দেশেরই মঙ্গল। কত বেকার ছেলে চাকরি পাবে। দেশের পঙ্গু অর্থনীতি চাঙ্গা হবে কিছুটা। তা ছাড়া প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশানের টেকনিক তো মানুষের হাতের বাইরে নয় এখন।'

জ্যোতির্ময় চুপ। একটু বিভ্রান্তও বটে। নীলেশের সব কথা না শুনে কোনও মন্তব্য করবেন না। যতই হোক, দুনিয়ার অতি মর্যাদাসম্পন্ন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক ও। খটকা লাগলেও এমন হতেই পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানের সবচেয়ে লেটেস্ট থিয়োরির ওপর দাঁড়িয়েই এইসব কথা বলছে নীলেশ।

অনেকক্ষণ একতরফা বকে নীলেশ এবার এগিয়ে এলেন জ্যোতির্ময়ের কাছে। প্রাক্তন সহপাঠীর কাঁধে হাত রেখে ঘনিষ্ঠতার সুরে বলে উঠলেন, 'এসব পাগলামি ছাড়ো, জ্যোতির্ময়। আমার কথা শোনো ; আমি ব্যাক করছি পরশু। আমি চাই তুমিও চলো আমার সঙ্গে। আমার বিশ্বাস, তোমার প্ল্যান্টোভোকামিটার বিশ্বের তাবড়-তাবড় বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে।'

এই বলে বাহবা দেওয়ার ভঙ্গিতে নীলেশ ভোকামিটারের সঙ্গে সংযুক্ত গোলাপ গাছের পাতার ওপর হাত ছোঁয়াতেই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল একটা। যন্ত্রটা তখনও চালানোই ছিল। নতুন হাতের স্পর্শে আচমকা কম্পিউটারের স্ক্রিনের গ্রাফগুলো অস্বাভাবিক চেহারা ধারণ করল।

ছবিগুলো লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছিল। যেন তীব্র আতঙ্কে কাঁপছে থরথর করে। ওদিকে স্পিকারও চুপ করে নেই। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল একটা বুকফাটানো আর্তনাদ : 'আ-আ-আ !!'

ভীষণভাবে চমকে উঠে চকিতে লাফ দিয়ে নীলেশ সরে গেলেন দূরে। তাঁর চোখে ভয়। ভয় আর বিস্ময়ও। যেন বিভীষিকা দেখছেন। ঠেলে বেরনো চোখ স্থির যন্ত্রের দিকে।

এদিকে একটু-একটু করে মুখচোখ বদলে যাচ্ছিল জ্যোতির্ময়ের। তাঁর যন্ত্র ভুল করবে না। গাছের শত্রু যারা, তারা মানুষেরও শত্রু। অতি ঘৃণ্য নীচ শত্রু। এইবার তিনি বুঝতে পারছেন এতক্ষণ খটকা লাগছিল কেন।

চোখের পলক ফেলতে যেটুকু সময়। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলেশের কাঁধ দুটো চেপে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন জ্যোতির্ময়, 'কে তুমি ? কী মতলবে এসেছ এখানে ?'

নীলেশ মুখ খুলছিলেন না কিছুতেই। কিন্তু জ্যোতির্ময়ের সুঠাম শরীরের

মোক্ষম দুই ঘুষিতেই কাজ হয়ে গেল। চোয়ালের ওপর হাত ঘষতে-ঘষতে নীলেশ জানিয়ে দিলেন যে, এতক্ষণ নিজের যা পরিচয় দিয়েছেন সব মিথ্যে। তিনি কলকাতাতেই থাকেন। চাকরিও করেন এখানকার এক নামকরা বিজনেস ফার্মে। এই ফার্মের সঙ্গেই যৌথ উদ্যোগে এক বহুজাতিক জাপানি সংস্থা সুন্দরবনে মদের কারখানা গড়তে চলেছে। সেটা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্টারপার্টের টেকনিক্যাল সুপারভাইজার হিসেবে নীলেশের এখানে আসা। কেননা জ্যোতির্ময়ের যন্ত্র এবং তাঁর বিবৃতি তাদের বেজায় চিন্তিত করে তুলেছিল।

এরপরে জ্যোতির্ময়ের অনেক কিছুই করার ছিল। কিন্তু পুরনো সহপাঠী বলে কথা! তার ওপর শরীরখানাও তার তেমন শক্তপোক্ত নয়। ঘাড়টি ধরে দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে স্ট্রেট পদাঘাত। দেখা গেল বার্কলে ইউনিভার্সিটির স্বঘোষিত লেকচারার অন্যদের চেয়ে পালানোর মাহাত্ম্য কিছু কম বোঝেন না।

তখনও একটা চমক বাকি ছিল। সেখানেও আবার যৌথ উদ্যোগের ব্যাপার আছে। গাছে আর যন্ত্রে। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়। তাঁর বাহাদুর গাছ কী আশ্চর্য ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাঁকে। ভুল করে যদি নীলেশের খপ্পরে পড়তেন, রক্ষে ছিল! ভাবতে-ভাবতে বাচ্চার চুল ঘেঁটে দেওয়ার মতো গাছের পাতায় আদরের ছোঁয়া দিয়েছেন কি, যন্ত্র বলে উঠল, 'আ—।' কিন্তু এই 'আ' মানে আর্তনাদ নয়। শুনে জ্যোতির্ময়ের বুঝতে বাকি রইল না, এই 'আ—' মানে আনন্দ।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বুদ্ধি যদি বৃদ্ধি পায়

অনীশ দেব



'সোমা ! সোমা ! শিগ্‌গির একটু বরফ নিয়ে এসো—' গলা ফাটিয়ে হাঁক ছেড়েছেন পুরন্দর, আর ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে একবার যাচাই করে নিয়েছেন ওটা ঠিকঠাক ফুল স্পিডে ঘুরছে কি না। পুরন্দরের মাথার ভেতরটা কিরকম অস্থির-অস্থির করছিল। মনে হচ্ছিল, দুজন ধুনুরি তাঁর মাথার ভেতরে বসে তোশক তৈরির কম্পিটিশান লাগিয়ে দিয়েছে।

বিকুন বেশ ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাবার দিকে। বরফ দিয়ে কী করবেন বাবা ? মুখচোখ লালচে, থমথমে। বিকুনকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আজ বোধহয় তাঁর অফিসটাই কামাই হয়ে যাবে !

এর মধ্যে মা-ও এসে হাজির হয়ে গেছেন অকুস্থলে। আটপৌরে শাড়ি পরে রান্না করছিলেন। হাতে হলুদের রঙ, মুখে বিনবিন ঘাম। বোঝা যায়, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও জরুরি হাঁক শুনে ছুটে এসেছেন।

সোমা বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে ! ও-মা ও-মা করে ডাকছিস কেন ? এখন আমার মরবার সময় নেই—'

ও, রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দের জন্য মা তাহলে বরফ আনার ব্যাপারটা শুনতে পাননি ! বিকুন ভাবল। আর বাবার 'সোমা' ডাককে বিকুনের 'ও-মা' বলে ভুল করেছেন।

পুরন্দর রাগ-থমথমে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'ও ডাকেনি, আমি ডেকেছি। জলদি ফ্রিজ থেকে একটু বরফ দাও—একটা রুমালে জড়িয়ে দিয়ো।'

'বরফ ! বরফ দিয়ে এখন কী করবে ? তুমি চান করতে যাবে না ? এরপর অফিসে দেরি হয়ে গেলে আবার আমাকে—'

পুরন্দর এবার ফেটে পড়লেন : 'বলছি তো জলদি বরফ নিয়ে এসো, আমার মাথায় দেব। ওকে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে আমার মাথাটাই কেমন গোলমাল হয়ে গেছে।'

সোমার ভুরু কুঁচকে গেল। বিকুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী

রে, আবার কী ভুল করলি ?'

বিকুন ইনিয়ে-বিনিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় গর্জন করে উঠলেন পুরন্দর, 'ভুল আবার কী ! ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না। শেষপর্যন্ত আমাকে হয়তো কোথাও একটা থেকে ঝাঁপ-টাপ দিয়ে সুইসাইড করতে হবে। তোমার ছেলের মাথায় কিস্যু নেই। ও...ও একটা শম্বুক...নাড়ুগোপাল !'

বিকুন তো একেবারে থ'। শম্বুক মানে যে শামুক সেটা ও জানে। কিন্তু শামুক আর নাড়ুগোপালের মধ্যে কোথায় যে মিল, তা ওর মাথায় ঢুকছে না। তাছাড়া ওই দুটি বস্তুর সঙ্গে বিকুনেরই বা মিল কোথায় !

সোমা জানেন, ভীষণ রেগে গেলে পুরন্দর বিকুনকে 'তোমার ছেলে' বলে অভিযোগ করেন। তিনি কোনওরকমে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন উত্তেজিত পুরন্দরকে : 'আহা, কী হয়েছে বলবে তো—'

পুরন্দরের কথা থেকে ব্যাপারটা জানা গেল। তিনি সাধারণ একটা আয়-ব্যয়ের অঙ্ক বোঝাতে বসেছিলেন বিকুনকে। তাতে রয়েছে, রামবাবু মাসে ২০০০ টাকা আয় করেন, আর প্রতি মাসে তাঁর ১৬০০ টাকা করে খরচ হয়। তাহলে বছরের শেষে তাঁর সঞ্চয় কত ? তা অঙ্ক কষা তো দূরের কথা, বিকুনের বক্তব্য, প্রতি মাসে সমান টাকা খরচ হতে পারে না— বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই ! বাবাকে সে স্পষ্ট জানিয়েছে, 'তুমিই তো সবসময় এ-কথা বলো—'

ব্যস, অঙ্ক উঠেছে মাথায়। বাবা-ছেলেতে লেগেছে তর্ক। পুরন্দর যতই বোঝান, এটা অঙ্ক— বিকুন ততই বলে, 'না, অঙ্কে ভুল আছে।'

বিকুন যে মাথা নিচু করে এবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে, সেটা খেয়াল করেছেন সোমা। তাই পুরন্দরকে বলেছেন, 'তুমি যাও তো, তাড়াতাড়ি চান করে তৈরি হও। ও-অঙ্ক আমি বুঝিয়ে দেব—'

ফোঁস করে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরন্দর উঠে পড়লেন। তিনি যে পড়াশোনায় বরাবরই তুখড় ছিলেন এটা আর কাউকে বলা যাবে না। সবই নিয়তি !

বিকুনকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা কম নয়। কী করে ছেলেটা এমন বোকাসোকা হল ! কেন ওর মাথায় একফোঁটা বুদ্ধি নেই ? অথচ ওর দিদি ঝুনু লেখাপড়ায় কী দারুণ ! মাধ্যমিক পরীক্ষাতে পাঁচটা বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছিল, তাছাড়া স্টার তো বটেই। সামনের বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সারাদিন শুধু মন দিয়ে পড়ে। মা-বাবা তো ভাল করেই জানেন, ঝুনু সবাইকে খুশি করার মতো রেজাল্ট করবে। আর তারই ছোট-ভাইয়ের কিনা এই দুরবস্থা !

পড়াশোনা করতে বিকুনের যে খুব একটা খারাপ লাগে তা নয়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে গাছপালা, পাখি আর প্রজাপতি দেখতে।

সেগুলো দেখে ও যেসব রঙিন ছবি আঁকে তা দেখে বড়দের তাক লেগে যায়। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তি করতেও বেশ লাগে ওর ! পাড়ার দু-একটা ফাংশানে ও কয়েকবার আবৃত্তি করে বেশ প্রশংসাও পেয়েছে। তখন তো বাবা-মা দুজনেই ওকে আদর-টাদর করেছিলেন ! অথচ অঙ্ক আর বিজ্ঞানে মাথা না খুললে সেই দুজন মানুষই কেমন যেন হয়ে যান। আচ্ছা, সবাই কি সব পারে ! কেন যে সবসময় দিদির কথা বলে বিকুনকে সবাই খোঁচা দেয়, কে জানে ! দিদি মোটেই ছবি আঁকতে পারে না। আর আবৃত্তির ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।

কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, বিকুনকে নিয়ে মাঝে-মধ্যেই বাবা-মা বেশ মুশকিলে পড়ে যান। এমনকি অপ্রস্তুতের একশেষও হয়েছেন এক-একবার।

এই তো গত সপ্তাহে সোনামাসিরা বেড়াতে এসেছিলেন বিকুনদের বাড়িতে। সোনামাসি ভীষণ ভালবাসেন বিকুনকে। সবসময় ওর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। সেদিন সন্ধেবেলা মাসি-মেসো, ওঁদের দু-ছেলেমেয়ে—নিশানদাদা আর রীতাদিদি, মা-বাবা, ঝুনু-বিকুন— সবাই মিলে খুব হইহুল্লোড়, গল্পগুজব হচ্ছিল। তারই মধ্যে বিকুন ফস করে হঠাৎ বলে বসেছে, 'সোনামাসি, জানো তো, ইস্কুলে বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধুমাস্টার বলে ডাকে।'

সোনামাসি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'সে আবার কী নাম !'

বিকুন বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছে, 'বুঝলে না, যাদের মাথায় খুব বুদ্ধি—মানে, অনেক বুদ্ধিমানের মোট বুদ্ধির চেয়েও বেশি বুদ্ধি—তাদেরকেই বুদ্ধুমাস্টার বলে...বন্ধুরা বলেছে।'

হাসি-ঠাট্টার তাল কেটে গেল। সবাই চুপ। তারপর হাসিতে ফেটে পড়েছে নিশান, রীতা আর ঝুনু। বাবা আর সোনামেসো ওদের ধমক দিয়েছেন। বিকুন লক্ষ করেছে, মা-বাবার মুখ কেমন লালচে হয়ে গেছে। একটু পরেই মা ওকে নিয়ে চলে এসেছেন পাশের ঘরে ! প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলেছেন, 'তোর কি কোনওদিনও এতটুকু বুদ্ধি হবে না মাথায় !'

হয়তো সেই কারণেই পরদিন সকালে ঝুনু রবীন্দ্রনাথের 'মাকাল' কবিতাটি বিকুনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুই এবার থেকে শুধু এই কবিতাটাই আবৃত্তি করবি, বুঝলি ?' বলে ঝুনু বেরিয়ে গেছে কোচিং ক্লাসে।

বিকুন যখন সত্যি-সত্যিই সেটা মুখস্থ করে আবৃত্তির চেষ্টা করছিল তখন মা কোথা থেকে যেন এসে ওকে থামিয়েছে।

প্রায়ই এইরকম সব ব্যাপার হয় বলে বিকুন সবসময় ভাবে, ইস, আমার যদি সত্যি-সত্যি অনেক অনে—ক বুদ্ধি হত ! মাঝে-মাঝে ও স্বপ্নে দেখে, ও চোখের পলকে কঠিন-কঠিন সব অঙ্ক কষে ফেলছে, আর বাবা-মা চোখ ছানাবড়া করে ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছেন।

★



'হউরেকা! উঁয়োপোকা!...সাকসেসফুল, মিস্টার মিত্র, সাকসেসফুল! ওই উঁয়োপোকার ব্যাপারটাই হল আসল—মানে, ওটাই হল মগজের ভেতরে বুদ্ধির কামড়।'

ক'দিন পর ঠিক এইরকম অবস্থাই হল পুরন্দরের। সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আয়েশ করে খবরের কাগজ পড়াটা তাঁর রোজকার অভ্যেস। সেদিন কাগজের তিন নম্বর পৃষ্ঠার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর চোখ ছানাবড়া, মুখ হাঁ। তিনি ভুল দেখছেন না তো! সাতবার পড়ার পরেও যখন বিজ্ঞাপনটা এতটুকু পালটে গেল না, তখন তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব। পাশের টেবিলে চা জুড়িয়ে জল হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু পুরন্দরের চোখ বিজ্ঞাপনের দিকে একেবারে গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা।

বিজ্ঞাপনটা এইরকম :

> ## বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র
>
> **পরিচালক : ডাঃ বিকাশ বর্ধন (বিদেশ প্রত্যাগত)**
>
> *এই চিকিৎসা কেন্দ্রে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের আই. কিউ./বুদ্ধি বাড়ানো হয়। মাত্র আধঘণ্টায় নিশ্চিত ফল। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।*

তার নীচে সেই বিদেশ প্রত্যাগত ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে।

ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সোমার নাম ধরে হাঁক পাড়লেন পুরন্দর। বিকুনের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার এরকম অপূর্ব সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে!

সোমা এসে হাজির হতেই পুরন্দর বিজ্ঞাপনটা ওঁকে দেখালেন। তারপর বললেন, 'আজ আর অফিস যাব না। ঝুনু কলেজে বেরিয়ে গেলে বিকুনকে নিয়ে চলো আমরা এই সেন্টার থেকে একবার ঘুরে আসি। দেখি না কী হয়!'

সোমা ইতস্তত করে বললেন, 'কত টাকা নেবে কে জানে! তাছাড়া...ইয়ে...মানে, ঠকাবে না তো?'

'টাকার চিন্তা তুমি কোরো না—' হাত নেড়ে জবাব দিলেন পুরন্দর : 'আর ঠকালেই হল! বিজ্ঞাপনে তো লিখেছে আধঘণ্টায় নিশ্চিত ফল। ফল না পেলে টাকা দেব কেন!'

সুতরাং বিকুনকে সঙ্গে নিয়ে সোমা এবং পুরন্দর কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক দশটার সময় বেরিয়ে পড়লেন বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধি অভিযানে। ট্যাক্সি ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র'-র ঠিকানায়।

কেন্দ্রের চেহারাটা বেশ আহামরি। কাচের দরজা। তার ওপরে ডক্টর বিকাশ বর্ধনের নাম লেখা। নামের শেষে ডিগ্রি জানাতে ইংরেজি বর্ণমালার প্রায় ছাব্বিশটা হরফই ফুটকি দিয়ে বসানো। আর তার পাশে 'বিদেশ প্রত্যাগত' ব্যাপারটাও জানানো আছে।

চেম্বারে ঢুকে একজন রিসেপশনিস্টের কাছে নাম-ধাম ইত্যাদি বিবরণ লিখে

দিলেন পুরন্দর। তারপর সোমা আর বিকুনকে নিয়ে একটা লম্বা সোফায় বসলেন। ঘরে আরও কয়েকজন বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই কেমন একটা আশঙ্কার ভাব।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি একটা পার্সোনাল কম্পিউটার সামনে নিয়ে বসে ছিল, আর তার কি-বোর্ডের বোতাম টেপার ফাঁকে-ফাঁকে পাশে রাখা একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে কীসব কথা বলছিল। হঠাৎই ফোন নামিয়ে রেখে সে ডেকে উঠল : 'মিস্টার নকুল সামন্ত।'

ঘরের এককোণে বসে থাকা এক রোগামতন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি—'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ভেতরের দিকে যাওয়ার একটা কাচের দরজা দেখিয়ে বলল, 'যান, ছেলেকে নিয়ে ভেতরে যান।'

নকুল সামন্ত তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বিকুন এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। তিনটে কী সুন্দর-সুন্দর ক্যালেন্ডার! একটাতে পাহাড়ের ছবি, একটায় জঙ্গলের মাঝে হাতির পাল, আর একটাতে হাতে আঁকা নদী আর গাছপালা। এ ছাড়া আরও একটা বিশাল রঙিন ছবি টাঙানো রয়েছে ঘরে : মানুষের মগজের ছবি। ছবিতে অনেকগুলো লাল-নীল তীরচিহ্ন আঁকা। তাদের পাশে-পাশে ইংরেজিতে অনেক কথা লেখা।

হঠাৎই ভেতরের দরজা ঠেলে তিনজন বেরিয়ে এল বাইরে। একজন পুরুষ, একজন মহিলা, আর একটি বছর আটেকের মেয়ে। মেয়েটির চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। বাইরের দরজার দিকে ওরা হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই মেয়েটি হঠাৎ বিরক্তভাবে বলল, 'বাপি, আমার চশমার ডানদিকের লেন্সের ফোকাল লেংথটা ঠিক নেই— দু' মিলিমিটারের মতো গোলমাল রয়েছে।'

পুরন্দর লক্ষ করলেন, বাবা-মা বেশ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে-করতে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিকুনের ডাক পড়ল।

ভেতরের ঘরে ঢুকে তো সোমা আর পুরন্দরের একেবারে তাক লেগে যাওয়ার জোগাড়!

বিকুনও বেশ অবাক হয়ে গেল। ও হাঁ করে সবকিছু দেখতে লাগল।

বেশ বড় ঘর। ঘরটা সিনেমা হলের মতো ঠাণ্ডা। তার একপাশে বিশাল টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন বেঁটেখাটো একজন টাকমাথা মানুষ। পোশাকে বেশ চেকনাই রয়েছে। গলায় স্টেথো, ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। চুরুটটা নিভে গেলেও ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পাননি, কারণ মাঝে-মাঝেই ওটাকে নেড়েচেড়ে টান মারছেন। আর তাঁর মুখে সবসময়েই একটা হাসি লেগে রয়েছে।

ঘরের দেওয়ালে নানারকম রঙিন চার্ট আর ছবি টাঙানো। একপাশে নানা

যন্ত্রপাতি আর একটা অদ্ভুত ধরনের গদিওয়ালা চেয়ার।

পুরন্দরদের দেখে ভদ্রলোক চুরুটটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর একগাল হেঁসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আসুন—বসুন। আমারই নাম ডক্টর বিকাশ বর্ধন। তবে ওটা আমার ছদ্মনাম। আসল নাম হরিপদ তলাপাত্র। বুঝতেই পারছেন, নামটাই এমন যে, ও-নাম শুনে রুগী-টুগি বিশেষ আসত না। তাই নাম পালটে বিকাশ বর্ধন নাম নিয়েছি। নামটা এমনিতে বেশ ভাল— তার ওপর বুদ্ধি বাড়ানোর কাজ নিয়ে যখন আছি তখন "বিকাশ", "বর্ধন"—এইসব ক্যাচি ওয়ার্ডগুলো পেশেন্টদের মা-বাবাদের কাছে নিশ্চয়ই খুব এফেক্টিভ হবে।'

পুরন্দর আর সোমা হতবাক হয়ে ডাক্তারবাবুটিকে দেখছিলেন। ছদ্মনামধারী ডাক্তার! এঁর কাছে এসে ওঁরা ভুল করেননি তো! প্রায় ধপাস করেই ওঁরা দুজনে বিকাশ বর্ধনের মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়লেন। সোমা হাত ধরে টেনে বিকুনকে বসিয়ে দিলেন নিজের পাশের চেয়ারটিতে।

'ডাক্তারজেঠু, আপনি ফরেনে গিয়েছিলেন?' ফস করে প্রশ্ন করে বসল বিকুন।

'ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। বললেন, 'হ্যাঁ, জেঠু, ফরেন...ইয়ে...মানে নেপাল আর ভুটানে আমি অনেক বছর ছিলাম। ওখানেও এই বুদ্ধিতে শান দেওয়ার কাজ করতাম।'

'ডাক্তারবাবু, আমাদের এই ছেলেটার মাথায় ভীষণ বুদ্ধি কম। যদি আপনি ওর একটা ব্যবস্থা করেন...' সোমা রীতিমত কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন।

'নো প্রবলেম।' বলে হাসলেন ডক্টর বর্ধন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চলে এলেন বিকুনের কাছে। তারপর সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুদ্ধি বেশি হলে আমার কাছে কেউ আসে না।'

এইবার বিকুনকে লক্ষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো জেঠু, ইফ যদি ইজ হয় বাট কিন্তু হোয়াট মানে কী?'

বিকুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

ডক্টর বর্ধন হাতে হাত ঘষে আবার হাসলেন। বিকুনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'পারলে না তো! ওই সেন্টেন্সটার মধ্যে ইফ, ইজ, বাট আর হোয়াট শব্দগুলোর বাংলা মানে কায়দা করে বলা আছে।'

সোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ডাক্তারবাবুর ওপরে ওঁর ভরসা অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

এইবার টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কী যেন পড়লেন ডক্টর বর্ধন। তারপর বিকুনের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভাল নাম শুভঙ্কর মিত্র?'

বিকুন ঘাড় নাড়ল।

'বাঃ, চমৎকার নাম! এইবার এসো তো, শুভঙ্করবাবু, এদিকটায় এসে বোসো

তো এই চেয়ারটায়—' বিকুনকে ডেকে বিশেষ ধরনের গদিওয়ালা চেয়ারটায় বসতে বললেন বিকাশ বর্ধন। তারপর সোমা আর পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আই. কিউ. মিটার দিয়ে ওর আই. কিউ.-টা প্রথমে একবার টেস্ট করে নেব।'

বিকুন ভয়ে-ভয়ে গদিওয়ালা চেয়ারটায় গিয়ে বসল। ডক্টর বর্ধন কাপের মতো ছোট-ছোট চারটে টার্মিনাল লাগিয়ে দিলেন ওর মাথার চারপাশে। তারপর দূরে একটা বোর্ডের কাছে সুইচ অন করে একটা ডিজিটাল মিটারে কীসব দেখলেন। পরক্ষণেই সুইচ অফ করে আক্ষেপের 'চুক-চুক' শব্দ করলেন, মাথা নাড়লেন ধীরে-ধীরে। বললেন, 'খুবই স্যাড ব্যাপার। শুভঙ্করকে নিয়ে আপনাদের তো প্রবলেম হবেই। ওর আই. কিউ. মাত্র ৮৮। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক বলা হয়, তাদের আই. কিউ. হয় ১০০। আর যাঁরা খুব নামকরা বিজ্ঞানী, তাঁদের আই. কিউ. জেনারালি খুব বেশি হয়। যেমন অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আই. কিউ. ছিল ১৪৬।'

পুরন্দর আমতা-আমতা করে বললেন, 'বিকুনের— মানে, শুভঙ্করের আই. কিউ.-টা ওইরকম বাড়িয়ে দেওয়া যায় না?'

ঘাড় নাড়লেন ডক্টর বর্ধন। হেসে বললেন, 'যায়, যায়, নিশ্চয়ই যায়। তবে বুঝেশুনে ধাপে-ধাপে বাড়াতে হবে— যাতে ও বুদ্ধিবৃদ্ধির চাপটা সইতে পারে। ও-নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওটা আমার ব্যাপার। আজ আমি কয়েকটা স্পেশাল ডোজ দিয়ে ওর বুদ্ধি বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওর ব্রেনের, মানে, সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্যারিটাল লোব আর ফ্রন্টাল লোবে একটু এক্সাইটিং সিগনাল দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। নানারকম লেন্স আর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাকটিভিটি প্যারিটাল লোব থেকেই জন্ম নেয়। আর ফ্রন্টাল লোবের কাজ হল যুক্তি প্রয়োগ আর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সাহায্য করা। এই দুটো লোবকে একটু চাঙ্গা করে দিলেই শুভঙ্করের বুদ্ধি বেড়ে যাবে। তবে এই বাড়তি বুদ্ধির এফেক্ট মাত্র তিনদিন— মানে ৭২ ঘণ্টা থাকবে। যদি ব্যাপারটা ঠিকমতো শুভঙ্করের সুট করে যায় তাহলে আর কোনও প্রবলেম নেই— তিনদিন পর ওকে নিয়ে আসবেন, ওই বর্ধিত বুদ্ধিটা একেবারে পারমানেন্ট করে দেব। মানে, কংক্রিট ঢালাই যাকে বলে—'

কথা বলতে-বলতে শুভঙ্করের চেয়ারের মুখোমুখি রাখা কয়েকটা লোহার স্ট্যান্ডের কাছে চলে গেছেন ডক্টর বর্ধন। তারপর একটা বড় বাক্স থেকে চারটে বড়-বড় চাকতি বার করে পাশাপাশি দাঁড় করানো স্ট্যান্ডগুলোয় ফিট করে দিয়েছেন। চক্রগুলোয় দাবার ছকের মতো কালো-সাদা ছক কাটা রয়েছে। সেই ছকগুলো চক্রের কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে মাপে ক্রমশ বড় হতে-হতে এগিয়ে এসেছে চক্রের কিনারায়।

বিকাশ বর্ধন কোথায় কী একটা বোতাম টিপে দিতেই চক্রগুলো ধীরে-ধীরে ঘুরতে শুরু করল।

এইবার সুইচ টিপে ঘরের সবক'টা আলো নিভিয়ে দিলেন তিনি। তারপর হঠাৎই দেখা গেল চারটে জোরালো আলোর ছটা এসে পড়েছে চারটে চক্রের ওপরে। বিকুনের মাথায় লাগানো টার্মিনালগুলো পালটে দিয়ে আরও কীসব সুইচ খটাখট করে বিকাশ বর্ধন গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিকুনবাবু, তুমি পালা করে পর পর ওই চারটে চক্রের দিকে একমনে তাকিয়ে যাও। লক্ষ্মী ছেলে! দেখবে, একটু পরেই তোমার বুদ্ধি বেড়ে যাবে। আর তোমার লেখাপড়ার খিদে এমন বেড়ে যাবে যে, সবাই একেবারে চমকে যাবে।'

হালকা আলোর আভায় বিকাশ বর্ধনের মুখ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর চোখেমুখে উৎসাহ আর আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

বিকুন কেমন যেন ঝিমুনির ঘোরের মধ্যে বলে উঠল, 'ডাক্তারজেঠু, শুধু চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। চক্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেই তোমার বুদ্ধি একেবারে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে।'

'আমার মাথার ভেতরটা কেমন চুলকোচ্ছে—' বিকুন একটু ভয়ার্ত গলায় বলল, 'যেন অনেকগুলো শুঁয়োপোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে...'

'ইউরেকা! শুঁয়োপোকা! ব্রেনোটিকা!' উৎফুল্ল হয়ে হাতে হাত ঘষলেন বিকাশ বর্ধন: 'সাকসেসফুল, মিস্টার মিত্র, সাকসেসফুল! ওই শুঁয়োপোকার ব্যাপারটাই হল আসল— মানে, ওটাই হল মগজের ভেতরে বুদ্ধির কামড়। আর কোনও চিন্তা নেই আপনাদের। আজ বুধবার। আপনারা শনিবার এরকম সময়ে শুভঙ্করকে আমার এখানে নিয়ে আসুন— তখন একেবারে ফাইনাল ঢালাই করে দেব।'

মাত্র ৫০০ টাকা নিলেন বিকাশ বর্ধন। পুরন্দর যা ভেবেছিলেন তার তুলনায় বলতে গেলে একেবারে জলের দর।

'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র' থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে সোমা চাপা গলায় পুরন্দরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী গো, ডাক্তারবাবু তো বললেন, ওর বুদ্ধি বেড়ে গেছে, কিন্তু আমরা বুঝব কেমন করে!'

বিকুন মা-বাবার একটু আগে-আগে হাঁটছিল। হঠাৎই পিছনে তাকিয়ে সোমাকে লক্ষ করে বলে উঠল, 'মা, তুমি একটু সাবধানে হাঁটো। এ-জায়গাটার মেঝের সঙ্গে তোমার জুতোর হিলের কোইফিশেন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন ভীষণ কম। সাবধানে না হাঁটলে তুমি পা পিছলে পড়ে যাবে—'

সোমা বিকুনের কথা শুনতে-শুনতে সত্যিই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন, পুরন্দর ওঁকে সময়মতো ধরে ফেলে পদভঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তারপর অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ফ্রিকশন বললি?'

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বিকুন বিজ্ঞের মতো জবাব দিল, 'কোইফিশেন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন— গতীয় ঘর্ষণ গুণাঙ্ক। মেঝের সঙ্গে মায়ের জুতোর

হিলের যে ঘষা লাগছে তা থেকে এটা হিসেব কষে বের করা যায়। সে ভীষণ জটিল ব্যাপার...'

পুরন্দর ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু খুশিও হলেন ভেতরে-ভেতরে। ঘণ্টা দেড়েক আগে শোনা আট বছরের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। চশমার লেন্সের ফোকাল লেংথের গোলমাল নিয়ে কী যেন বলছিল মেয়েটা। এইটুকু-এইটুকু বাচ্চা ছেলেমেয়ে এরকম সব দুর্বোধ কথাবার্তা বলছে! বিকাশ বর্ধনের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে কি এইরকমই হয়?

বাড়ি ফেরার পথে বেশ কয়েকবার পুরন্দর আর সোমাকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে হল। কারণ ফ্রিকশনের কীসব দিয়ে শুরু করেছিল বিকুন, পথে গতিবেগ, ত্বরণ, বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের শতকরা হিসেবের গরমিল, বুলবুলি পাখি কেন সাধারণত জোড়ায়-জোড়ায় থাকে, পিঁপড়ে কেন লাইন ধরে চলে— এসব বিষয় নিয়ে পুরন্দর আর সোমাকে প্রায় কাহিল করে দিল।

দুপুরে বাড়ি ফিরে পুরন্দর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্র'-র গোটা ব্যাপারটা তাঁর কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

একটু দম নিয়ে পুরন্দর যখন স্নান করতে যাচ্ছেন, তখন দেখলেন, বিকুন স্নান-টান সেরে ডাইনিং টেবিলে বসে অঙ্ক বই নিয়ে একমনে পাতা ওলটাচ্ছে। পুরন্দর খুশি হলেন। যাক, ছেলেটার তাহলে অঙ্কে আগ্রহ বেড়েছে।

তিনজনে যখন খাওয়া শুরু করলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পুরন্দর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'অঙ্ক বই নিয়ে কী করছিলি?'

এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে দিয়ে বিকুন নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্কগুলো একবার করে কষে নিলাম।'

পুরন্দরের খাওয়া থেমে গেল।

সোমার হাতে ধরা ডালের হাতা থেকে ডাল চলকে পড়ে গেল।

মুখে-মুখে বইয়ের সমস্ত অঙ্ক কষে ফেলেছে বিকুন!

পুরন্দর তাকালেন সোমার দিকে। সোমার কপালে ভাঁজ পড়েছে। ওঁরা দুজনে হাঁ করে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

এরপর প্রায় দেড়দিন বিকুন শুধু বইপত্র নিয়ে কাটাল।

নিজের যত বইখাতা, তার সমস্ত লেখা গোগ্রাসে গিলল। তারপর শুরু করল তিনরকম ডিক্‌শনারি আর দিদির বই। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে পাড়ার লাইব্রেরিতে হানা দিল। এছাড়া আরও কোথায়-কোথায় যে ও ঘুরে বেড়াল, কে জানে!

যতক্ষণ ছেলেটা বাড়িতে থাকে ততক্ষণই নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ওর যত অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা।

একদিন সন্ধেবেলা ঝুনু মাকে বলছিল, পাশেই ওর বন্ধু অরুণাদের বাড়িতে

যাবে ভিডিওতে সিনেমা দেখতে। বিকুন ইংরেজি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। ফস করে জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, বল্ তো, ভিডিও কথাটার মানে কী ?'

ঝনু ভাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল মায়ের দিকে। ওর মুখ বেজার। এ আবার কী বিপদ !

বিকুন বলল, 'ভিডিও মানে হচ্ছে, আমি দেখি। তেমনই অডিও মানে হচ্ছে, আমি শুনি। এ দুটোই ল্যাটিন শব্দ।'

ঝনু বেশ ভয়ের চোখে ভাইকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিন রাতেও সেই একই ব্যাপার।

রেডিওতে গান শোনা পুরন্দরের বরাবরের অভ্যাস। নিজে এককালে সঙ্গীতচর্চা করতেন, হয়তো সেইজন্যই ট্রানজিস্টর রেডিও হাতে নিয়ে মেজাজে আধুনিক গান শুনতে-শুনতে এ-ঘর ও-ঘর আর বারান্দা করছিলেন তিনি। বিকুন হঠাৎই বলে উঠল, 'বাবা, বড্ড ডপ্লার এফেক্ট হচ্ছে।'

'ডপ্লার এফেক্ট !' পায়চারি থামিয়ে চোখ কপালে তুললেন পুরন্দর।

'জানো না, চলতে-চলতে শব্দ করলে সেই শব্দ যে একজায়গায় দাঁড়িয়ে শোনে, তার মনে হয় শব্দের কম্পাঙ্ক পালটে গেছে !'

পুরন্দরের বিষয় ছিল ইকনমিক্স। ডপ্লার কী-না-কী— এই ব্যাপারটা বোধহয় বিজ্ঞানের। কিন্তু তিনি ধৈর্য না হারিয়ে বিকুনের খুব কাছে এসে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা আর-একটু খোলসা করে বল তো— ঠিক বুঝলাম না !'

বিকুন নড়েচড়ে বসল। বলল, 'শোনো। তুমি ধরো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ। আর দূর থেকে হুইস্ল বাজিয়ে ট্রেন আসছে। তখন তোমার কানে হুইস্লের শব্দটা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ শোনাবে। মানে হুইস্লের শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেছে বলে মনে হবে। আবার এর উলটোটাও হতে পারে। ট্রেন যখন হুইস্ল বাজিয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে তখন সেই শব্দের তীক্ষ্ণতা অনেক কম মনে হবে। এই ব্যাপারটা প্রথম ব্যাখ্যা করেন অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী সি. জে. ডপ্লার।'

পুরন্দর ছেলের কথা শুনতে-শুনতে রেডিওর সুইচ অফ করে দিয়েছিলেন। এবার হাঁ করে নিজের ছেলেকে দেখতে লাগলেন।

বিকুন এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলল, 'এরকম করে তাকিয়ে থেকো না, বাবা, তোমার রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। রেটিনায় যেসব রড আর কোন রয়েছে...'

পুরন্দর ছেলেকে বাধা দিলেন : 'থাক, থাক, আর তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না—'

তখন বিকুন বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। পাখার আর. পি. এম.-টা একটু

বাড়িয়ে দেবে, বাবা ?'

'আর. পি. এম. !'

'রিভোলিউশন্‌স পার মিনিট— সংক্ষেপে আর. পি. এম.। তোমরা যাকে চলতি কথায় স্পিড বলো আর কী !'

পাখার স্পিড বাড়িয়ে ফুলস্পিড করে দিলেন পুরন্দর। তারপর মানে-মানে সরে পড়লেন ছেলের কাছ থেকে।

রাতে এই আতঙ্কঘন পরিস্থিতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে একটু আলোচনা করতে চাইলেন পুরন্দর।

সোমা প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় নিজের হেনস্থার কথা জানালেন স্বামীকে। বললেন, 'আর বোলো না ! আজ সকালে বিকুন রান্নাঘরে ঢুকে আমাকে খাবার-দাবারের ক্যালরি, মেটাবলিজ্‌ম, গ্যাসের দহন, পরিবেশদূষণ এসব নিয়ে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। তারপর বলে কী, নুনের মধ্যে আছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন। নুন নোনতা। আর চিনির মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। চিনি মিষ্টি। এরকম তফাত হল কেন ? তারপর টাইঅ্যালিন নামে কী একটা জিনিসের নাম করে বলল, ওটা নাকি একটা এনজাইম, আমাদের থুতুর মধ্যে আছে। আবার সেটার বানান নাকি "পি" অক্ষর দিয়ে শুরু। আমি তখন তরকারিতে হলুদগুঁড়ো দিচ্ছিলাম, বলে কী, হলুদের মধ্যে কী-কী রাসায়নিক উপাদান আছে বলো তো, মা ?' সোমা কাতর গলায় অনুযোগ করে বললেন, 'তুমি বলো, এসব আমি কখনও বলতে পারি ?'

পুরন্দর সিগারেট খাচ্ছিলেন, তাতে হিংস্রভাবে এক লম্বা টান মেরে বললেন, 'বিকাশ বর্ধন বলেছিলেন, ঠিক তিনদিন এর এফেক্ট থাকবে। তিনদিন শেষ হতে আর কত ঘণ্টা বাকি আছে বলো তো ?'

সোমা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'প্রায় সাঁইতিরিশ ঘণ্টা !'

সাঁইতিরিশ ঘণ্টা ! সাঁইতিরিশ ঘণ্টা বিকুনের বুদ্ধিবৃদ্ধির এফেক্ট ঠিকমতো সহ্য করতে পারলে হয় ! ভাবলেন পুরন্দর।

ব্যাপারটা যে ঝুনুর পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা পরদিন ওর অসহায় অবস্থা দেখেই বোঝা গেল। ও মাকে এসে অভিযোগ জানাল, বিকুনের সঙ্গে এক ঘরে বসে ও আর পড়বে না। বিকুন প্রায় মিনিটে-মিনিটে ওকে থামিয়ে দিয়ে কীসব উলটোপালটা বোঝাচ্ছে।

সোমা ঝুনুকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঝুনুর তখন শান্ত হওয়ার মতো মনের অবস্থা আর নেই। ও প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'সব তো মনে নেই...তবুও ওর যে-ক'টা প্রশ্ন মনে আছে শোনো। ওডোমিটার কাকে বলে ? ইংল্যান্ডের কোন রাজা ইংরেজি বলতে পারতেন না ? জেরান্টোলজিস্টরা কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন ?

মোটরগাড়ির চাকায় খাঁজকাটা থাকে কেন ? বাংলা ভাষায় কোন তিনটে অক্ষরের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ? ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে বিজ্ঞানী স্টিফেন কী যেন...'

সোমা সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'এ কী বিপদে পড়লাম বল তো ! এ কী সর্বনাশ হল আমাদের !'

ঝুনু হাত দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আর সর্বনাশ ! অপর্ণাদি বলেছেন বিকুন সামনে বসে থাকলে উনি আমাকে আর পড়াবেন না।'

অপর্ণাদি ঝুনুর প্রাইভেট টিউটর। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা। প্রায় তিন বছর ধরে ঝুনুকে পড়িয়ে আসছেন।

সোমা কান্না থামিয়ে চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কী ! অপর্ণাদিকে বিকুন আবার কী করেছে ?'

'কী আবার, ওই আই. কিউ.-র ওভারডোজ।' বিরক্তভাবে বলল ঝুনু।

সোমা দুশ্চিন্তায় চোখ বুজে ফেললেন। বোধহয় ভগবানের নাম-টাম নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সত্যি, শেষপর্যন্ত কী যে হবে কে জানে ! ছেলেটা এ দু-দিনে একটাও ছবি আঁকতে বসেনি, এক লাইনও কবিতা আওড়ায়নি। বারান্দায় একটিবারও যায়নি গাছপালা বা পাখি দেখতে। তাছাড়া বিকেলে আজ আর খেলতে বেরোয়নি। কাল সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর গলায় মাকে বলেছে, 'আমি আর টিটো, তাতন, চুনির সঙ্গে খেলব না। ওরা আমার সঙ্গে খেলতে চাইছে না।'

সোমা ব্যাপারটা খানিক যেন আঁচ করতে পারলেন। তবু জানতে চাইলেন, 'সে কী রে, কেন ?'

বিকুন গজগজ করতে-করতে উত্তর দিল, 'কে জানে কেন ! আমি কাল বল খেলার সময় ওদের বারনুলির থিওরেম আর ম্যাগনাস এফেক্টের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে ওরা কেমন ভয় পেয়ে গিয়ে আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল।'

সোমা অবাক হলেন না। কারণ আজ প্রায় একই কারণে বিকুনের স্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই ফোন করেছিলেন পুরন্দরের অফিসে। ফোন করে তিনি বলেছেন, 'আপনার ছেলের মাথায় বোধহয় সামান্য কিছু প্রব্‌লেম হয়েছে। সেটা সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওকে স্কুলে পাঠাবেন না। মাস্টারমশাইরা কেন জানি না খুব ভয় পেয়ে গেছেন।'

সোমা বেচারা ঝুনুকে একবার দেখলেন, তারপর আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ডক্টর বর্ধনের হিসেবমতো এখনও প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা বাকি।

চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা বিকুন ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সেটুকু সময়ই যা নিশ্চিন্ত ! বাকি সময়টা পুরন্দর-সোমা বেশ ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছেন। ছেলেকে

আশেপাশে দেখতে পেলেই পুরন্দর হয় বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছেন, নয়তো সটকে পড়েছেন রাস্তায়। আর সোমা কাজের ছুতো করে সারাক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। ঝুনু বিজ্ঞ ভাইয়ের কবল থেকে বাঁচতে বইপত্র নিয়ে চলে গেছে অরুণাদের বাড়ি।

বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিকুনকে ঘিরে জড়ো হল সবাই। ও তখন একমনে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে। তখনকার মতো ওরা সরে গেলেও ঘুরেফিরে নজর রাখতে লাগল বিকুনের ওপরে। একটু পরেই দেখা গেল বিকুন ইংরেজি কাগজের ক্রসওয়ার্ডটা চটপট সল্‌ভ করছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই বিকুন মুখ তুলে বাবা-মা-দিদিকে একবার সামান্য অবাক চোখে দেখল, তারপর আবার মন দিল শব্দছকের দিকে।

পুরন্দর আজ অফিস কামাই করেছেন। ঝুনুও কলেজে যায়নি। বিকাশ বর্ধনের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আজ বারোটা নাগাদ তাঁর অভিনব চিকিৎসার এফেক্ট শেষ হওয়ার কথা। সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে পুরন্দর বিকুনের কাছে হাজির থাকতে চেয়েছেন। কে জানে, নতুন করে আবার কোনও বিপত্তি হবে কি না! ঝুনুও একই আগ্রহে ক্লাস ডুব মেরেছে। আর সোমা বারবার তাকাচ্ছেন দেওয়াল-ঘড়ির দিকে। সময়টা ঠিক কখন?

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘটনাটা ঘটল।

শব্দছকের শেস শব্দটা খুঁজতে গিয়ে আটকে গেল বিকুন। ওর দু-চোখে কেমন এক শূন্য দৃষ্টি। একটা হাত এলোমেলো ভাবে মাথায় বোলাচ্ছে। ওর মুখ থেকে 'উঃ', 'আঃ', 'ইস' ইত্যাদি টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছে থেকে-থেকে।

পুরন্দর অতি-উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কী রে, লাস্ট শব্দটা পারছিস না?'

বিকুন কেমন বিমূঢ় গলায় জবাব দিল, 'না। দ্যাখো না, শব্দটা একেবারে মাথায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু ফস করে কী যে একটা ওলটপালট হয়ে গেল...'

পুরন্দর খুশির এক চিৎকার করে সোমাকে লক্ষ করে বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়াও, আমি এক ছুট্টে ওর অঙ্ক বইটা নিয়ে আসি। ওটা দিয়েই ফাইনাল টেস্ট করব...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই পুরন্দর ঘর থেকে উধাও। আর সোমা বিকুনের কাছটিতে এসে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ঝুনু তখনও অবাক চোখে ভাইকে দেখছে।

বলতে গেলে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই পুরন্দর অঙ্ক বই নিয়ে বিকুনের সামনে এসে হাজির। এবং চোখের পলকে আয়-ব্যয়ের সহজ অঙ্কটি মেলে ধরেছেন ছেলের সামনে।

'বল্‌ তো! এই সহজ অঙ্কটা মুখে-মুখে বুঝিয়ে দে তো, আমায়।'

বিকুন গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে অঙ্কটা রিডিং পড়ল। তারপর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মন্তব্য করল, 'অঙ্কটায় ভুল আছে, বাবা। প্রতি মাসে

কখনও সমান টাকা খরচ হতে পারে না। বিশেষ করে পুজোর মাসে তো খরচ বেশি হবেই!'

আর যায় কোথায়! পুরন্দর হাত-পা ছুঁড়ে শূন্যে দু-হাত লাফিয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, 'হিপ হিপ হুর্‌রে! সোমা, দ্যাখো, দ্যাখো, বিকুন আবার অঙ্কে কাঁচা হয়ে গেছে। ওঃ, বাঁচা গেল!'

সোমা ছেলেকে একেবারে জাপটে ধরলেন। ওঁর চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললেন, 'বুঝলে, আমার বোকাসোকা সুন্দর ছেলেটাই অনেক ভাল। ওর মুখটা কী মিষ্টি! কী সুন্দর ছবি আঁকতে পারে ও! আর আবৃত্তিতে তো একেবারে চ্যাম্পিয়ান! আমার আর বুদ্ধিমান ছেলের দরকার নেই গো!'

ঝুনু বিকুনের ছোট্ট মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নরম গলায় বলল, 'মা, যা স্বাভাবিক তাকে কখনও চাপ দিয়ে বোধহয় পালটাতে নেই। পালটালে তার ফল ভাল হয় না—'

পুরন্দর হেসে বললেন, 'এইজন্যেই কথায় বলে, খোদার ওপরে খোদকারি করতে নেই। আমি যাই, এক কেজি মুরগির মাংস নিয়ে আসি। বিকুনের অনারে আজকের স্পেশাল মেনু কষা মাংস আর পরোটা উইথ জলপাইয়ের চাটনি। ঝুনু, আজ তুই মায়ের সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাবি।'

বাজারের থলে হাতে বেরোনোর সময় সোমার কানের কাছে মুখ এনে পুরন্দর চাপা গলায় বললেন, 'ভাগ্যিস হরিপদ তলাপাত্রের কথায় বিকুনের বুদ্ধিটা ফাইনাল ঢালাই করিনি! তাহলে এক্ষুণি হয়তো ছেলেটা আমাকে মুরগির মাংসের কেমিক্যাল কম্পোজিশন জিজ্ঞেস করে বসত!'

স্বামীর কথায় সোমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

দুপুরের রোদ তখন জানলায় খেলা করছে।

ছবি : দেবাশীষ দেব



বিজ্ঞান সুবাসিত আধুনিক আরব্যরজনী

অল্পবিজ্ঞান আর গল্পবিজ্ঞানের মিশেল দিয়ে তৈরি কল্পবিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে কল্পনার রঙিন জাল বুনে গড়ে উঠেছে এই সঙ্কলনের বত্রিশটি কৌতূহল-জাগিয়ে-তোলা কাহিনী, বাংলা কল্পবিজ্ঞানের সেরা মানের বত্রিশটি গল্প। কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী এই কল্পবিজ্ঞান সঙ্কলন যেন এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান-নগরী।

এই সঙ্কলনে হাজির হয়েছেন অবিস্মরণীয় ঘনাদা আর কল্পবিজ্ঞানী প্রোফেসর শঙ্কু। এ ছাড়া আছেন মেঘ-চোর এক বিপজ্জনক বিজ্ঞানী আর প্রখর শ্রুতিক্ষমতার অধিকারী রন্ধনবিলাসী কাদের মিয়া। এই সঙ্কলনে আরও আছে...

টাইম মেশিনের গল্প
বিচিত্র রোবটের কাহিনী
মায়া সভ্যতার গোপন রহস্যের কথা
ভয়ঙ্কর মারণ-পোকার গল্প
হঠাৎই বুদ্ধি-বেড়ে-যাওয়া এক বালকের কথা
আরও কত কী !

লিখেছেন :

প্রেমেন্দ্র মিত্র □ লীলা মজুমদার □ বিমল কর □ অদ্রীশ বর্ধন □ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় □ সিদ্ধার্থ ঘোষ □ অমিত চক্রবর্তী □ সুকুমার ভট্টাচার্য □ শুভমানস ঘোষ □ অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় □ কিন্নর রায় □ চঞ্চল পাল প্রমুখ

9 788172 156077

